মাসুদ রানা

উদ্ধার

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

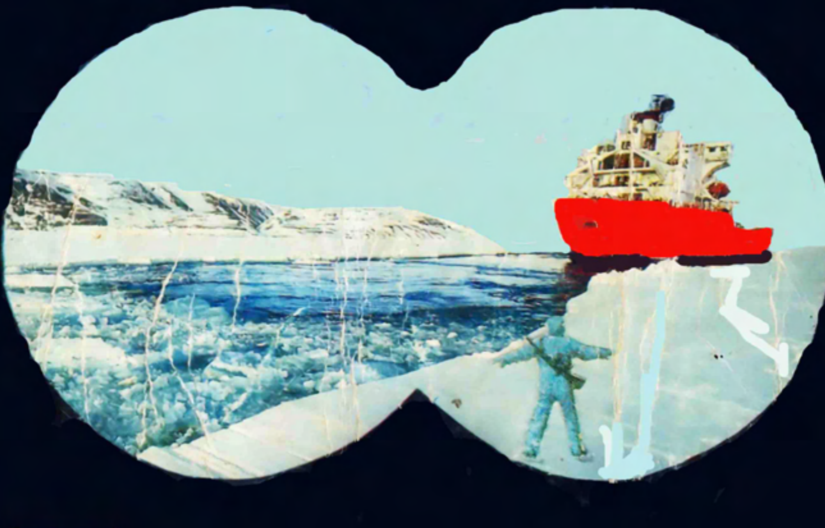

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

উদ্ধার

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ইংরেজ এক ডাক্তার জন এডওয়ার্ডস
যুগোস্লাভ মোটর গাড়ি বিশারদ পেরী কঙ্কর
নরওয়েজিয়ান স্কি চ্যাম্পিয়ান বন্দুকবাজ মিলটন স্টেনার
ক্যানাডিয়ান ক্যামোফ্লেজ আর্টিস্ট কারজো বুতেরো
আর জাপানী দৈত্য হিরোমিচি নিতাই
চলেছে দীর্ঘ এক হিমতুষার যাত্রায়—
নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশের এক যুবক
মাসুদ রানা।
অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন অনেক বিপদ অনেক বিপত্তি
ডিঙিয়ে এগিয়ে চলল অভিযাত্রী দল।
কি দেখবে ওরা গন্তব্যে পৌঁছে?
সত্যিই কি ওখানে বন্দী হয়ে আছেন
অসামান্য বিজ্ঞানী আইজ্যাক সেসলভ?
কি ঘটল তারপর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

উদ্ধার

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 - 7103 - 4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
UDDHAR
[Part I&II)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

[redacted] টাকা

উদ্ধার-১ : ৫—১১৫
উদ্ধার-২ : ১১৬—২২৪

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি *সোহানা *অগ্নিশপথ জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল *দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

উদ্ধার-১

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮২

এক

হিমমুকুটের রাত। যেদিকে তাকাও শত শত মাইল জুড়ে শুধু মসৃণ শুভ্রতা, শুধু বরফ, আর বরফ। জায়গাটা গ্রীনল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল, সাগর-সমতল থেকে ছ'হাজার ফিট ওপরে। গোটা আইসক্যাপে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই, কারণ বেঁচে থাকার অন্যতম উপকরণ খাবার নেই কোথাও। আছে শুধু আর্কটিক বাতাসের একটানা একঘেয়ে শোঁ শোঁ আওয়াজ, তার গায়ে ভর করে ছুটে চলেছে লক্ষ-কোটি খুদে বর্শার মত সুতীক্ষ্ণ তুষার কণা। আছে অন্ধকার। তার সাথে হাড় কাঁপানো কনকনে শীত।

বরফের নিচ থেকে কি যেন একটা মাথাচাড়া দিল। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠল জমাট বরফ। চিড় ধরল সেটার চারধারে। মসৃণ বরফের মাঝখানে ওটাকে এখন আর আলাদা একটা স্তূপ বলে চিনতে অসুবিধে হয় না। দুলে উঠল স্তূপটা, ফাটল ধরল তার গায়ে, ভাঙতে শুরু করল মড় মড়। ফাটলের ফাঁকে এবার দেখা গেল কালো রঙের চারকোনা একটা আকৃতি, বরফের টুকরোগুলো ধাক্কা খেয়ে সরে গেল একপাশে। গড়িয়ে, পিছলে চলে গেল সেগুলো, বাতাসের ধাক্কায় সফেদ বিস্তৃতির সাথে মিশে গিয়ে দ্রুত মিলিয়ে যেতে শুরু করল। কুচিগুলোকে আগেই উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাতাস।

বরফ সরে যাওয়ায় নিচে একটা টানেলের মুখ আর আলো দেখা গেল। লম্বা, সোজা একটা সুড়ঙ্গ। বালির মত চিকচিক করছে মেঝে। দেয়ালের গায়ে সারি সারি তার, ওগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে বিদ্যুৎ, বরফের রাজ্যে যার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে কয়েকজন মানুষ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোলার রিসার্চ সেন্টারের একটা শাখা এটা, সাঙ্কেতিক নাম ক্যাম্প জিরো। চার বছর আগে, ক্ষণস্থায়ী এক গ্রীষ্মে, দৈত্যাকার একটা ট্র্যাক্টরে চড়ে এখানে এসেছিল অসকার রডহেম। ট্র্যাক্টরটা টেনে নিয়ে এসেছিল অনেকগুলো ওয়াগন, এখানে যেগুলোকে বলা হয় ওয়ানাগান। স্কি রানারের ওপর দাঁড় করানো থাকে ওগুলো। সুইজারল্যান্ডের আলপাইন রাস্তা পরিষ্কার করার জন্যে এক ধরনের স্নোপ্লাউ ব্যবহার করা হয়, তারই একটা ছিল প্রথম ওয়ানাগানে। অনেক বাছবিচার করে এই জায়গাটা পছন্দ করেছিল রডহেম, তারপরই সেই স্নোপ্লাউ দিয়ে শুরু হলো আইসক্যাপে ট্রেঞ্চ কাটা। স্নোপ্লাউয়ের চিমনি থেকে বেরিয়ে এসে ট্রেঞ্চের দুই কিনারায় জমে উঠল টুকরো আর গুঁড়ো বরফের পাহাড়। ট্রেঞ্চের গভীরতা হলো পনেরো ফিট। এরপর দুই কিনারার উঁচু বরফের মাঝখানে ফেলা হলো ঢেউ খেলানো লোহার চওড়া পাত। ট্রেঞ্চের ওপর তৈরি হলো ছাদ, তার ওপর স্তূপ করা

হলো টুকরো বরফ। এইভাবে মিস্ত্রী আর টেকনিশিয়ানদের জন্যে তৈরি হয়ে গেল একটা আশ্রয়। এরপর শুরু হলো আসল কাজ। কনস্ট্রাকশন।

গ্রীষ্ম শেষ হয়নি, কিন্তু শীত আসি আসি করছে, রডহেমের হাতে সময় ছিল খুবই কম। শীত আসার আগে ক্যাম্পের কাজ শেষ করতে না পারলে কি ঘটতে পারে ভাবতে গিয়ে বুকের রক্ত ছলকে উঠত তার। কন্ট্রোলার, প্ল্যানার এবং অর্গানাইজারারের ভূমিকায় তাকে একাই নামতে হলো। নিজে যেমন অমানুষিক খাটল, তেমনি সাথের লোকজনকেও হাঁপ ছাড়ার ফুরসত দিল না। এবং শীত আসার আগেই দেখা গেল তৈরি হয়ে গেছে ক্যাম্প জিরো। সেই থেকে আজও এখানে রয়ে গেছে রডহেম। এই বরফের রাজ্যে থাকতে হয় বলে ক্ষোভ আর অভিযোগের অন্ত নেই তার, অথচ দুর্লভ ছুটিগুলোয় ক্যাম্প ছেড়ে যেতেও তার মন চায় না। সাধারণত একটানা ছ'মাস ডিউটি করতে হয়, তারপর লম্বা ছুটি। সেই লম্বা ছুটির পর কেউই আর এখানে ফিরে আসতে চায় না, কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রতিবার ফিরে এসেছে রডহেম। কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে বার বার টেনে নিয়ে আসে এখানে।

এই মুহূর্তে বার-এ রয়েছে অসকার রডহেম। আট বছরের পুরানো হুইস্কির সাথে গভীর নলকূপ থেকে তোলা দু'হাজার বছরের পুরানো পানি মিশিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিল গ্লাসে। বারে হেলান দিয়ে শরীরটাকে ঢিল করে দিল সে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর এখন অবসর, ঘড়ির কাঁটা ধরে সন্ধে হলেই ব্রিজের টেবিলে বিনোদন।

'কর্নেল, স্যার, আপনার মেসেজ।'

ঘাড় ফেরাল রডহেম, হাতটা আগেই বাড়িয়ে দিয়েছে। মেসেজটা দ্বিতীয়বার পড়ার সময় হাতের গ্লাসটা কাউন্টারে নামিয়ে রাখল সে। মেসেজটা হুবহু এই রকম: 'কমান্ডার জিরো—আনআইডেনটিফায়েড এয়ারক্রাফট অ্যাপ্রোচিং জিরো ফ্রম ডাইরেকশন পোলার সী—ফেইলস্ রিপ্লাই টু সিগন্যালস্—ফাইটার ইন্সপেকশন সাজেস্টস রাশিয়ান রিকনিসান্স প্লেন অভ রেয়ার টাইপ—ক্রিপল্ড অ্যান্ড লুজিং হাইট—রাডার ট্র্যাকিং—স্ট্যান্ড বাই—জেমস কেলী ইউ-এস-এ-বি থিউল।'

'রেডিও, করপোরাল?' জানতে চাইল রডহেম।

'ঠিক আছে, স্যার।'

'দেখো জেনারেল কেলীকে পাও কিনা। আমি আসছি।'

'ইয়েস, স্যার।'

করপোরাল ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে, হাত তুলে তাকে বাধা দিল রডহেম।

'স্যার?'

'রাশানদের এ কি ধরনের স্বভাব বলো তো? নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা!'

চিন্তার গভীর রেখা ফুটে উঠল করপোরালের কপালে। তিন সেকেন্ড পর রিস্টওয়াচ দেখল সে। উত্তর খুঁজে না পেয়ে সবিনয়ে জানতে চাইল, 'যাবার সময় তাহলে আপনার পার্টনারদের বলে যাই আজ আর ব্রিজ খেলা হবে না?'

তিক্ত একটু হাসি দেখা গেল রডহেমের ঠোঁটে। 'আমারও ধারণা, রাশানরা

ব্রিজ খেলার ভক্ত নয়। ঠিক আছে, ব্র্যাডি।'

বার থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে ধীরেসুস্থে চুমুক দিল রডহেম। করপোরালকে খানিক সময় দেবার জন্যে কোনরকম তাড়াহুড়ো না করে অফিসার্স ক্লাব থেকে বেরিয়ে মেইন টানেল হয়ে চলে এল রেডিওরুমে।

মুখ তুলে তাকাল করপোরাল। 'জেনারেলকে ডাকতে গেছে, স্যার।' হেডফোনে কিছু শুনল সে। 'জেনারেল কথা বলবেন, স্যার। হেডফোন, নাকি স্পীকার?'

'স্পীকার।' খানিক অপেক্ষা করল রডহেম, তারপর ভারী একটা গলা শুনতে পেল।

'কর্নেল রডহেম, জেনারেল কেলী।'

'নতুন কোন তথ্য, স্যার?'

'তোমাদের দিকে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নামতে নামতে আট হাজার ফিটে চলে এসেছে চল্লিশ মাইল রেঞ্জ। প্রতি মুহূর্তে আরও নামছে। সম্ভবত ক্যাম্প জিরোর বিশ মাইল পুবে।'

'কোন ভুল নেই ওটা রাশিয়ান?'

'নেই বললেই চলে। যেখানেই পড়ুক, বা যদি পড়ে, আমার মনে হয়…'

'আপনি চান তল্লাশী চালিয়ে দেখব কিছু পাওয়া যায় কিনা, স্যার?'

'হ্যাঁ। দুঃখিত, রডহেম। কিন্তু ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।'

'এয়ারফোর্সকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে ইঞ্জিনিয়র কোর খুশি হয়, স্যার।'

'সেভেন থাউজ্যান্ড, সেম কোর্স। গুড অভ ইউ, আই মাস্ট সে। এয়ারফোর্স ব্যাপারটা অ্যাপ্রিশিয়েট করে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'এখনও নেমে আসছে। স্ট্যান্ড বাই।'

চিন্তিতভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া গিলল রডহেম। তারপর ধীরে ধীরে ছাড়ল নাক দিয়ে। মাথার ওপর খুনী আবহাওয়া ওত্ পেতে আছে। তীব্র বাতাস, ঝাঁক ঝাঁক মিসাইলের মত তুষার, না থাকার মত চাঁদ। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। অত্যন্ত বিপদসংকুল হবে অভিযানটা। বিশেষ করে উত্তর ঘেঁষা পুবে জানা কোন পথ নেই, এর আগে ওদিকে যাওয়া পড়েনি। ক্যাম্প জিরোর জন্যে ওটা একটা সম্পূর্ণ অচেনা জগৎ। আপনমনে, অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রডহেম। বিড়বিড় করে বলল, 'লক্ষ্মী, কমরেড ভাই আমার, প্লেনের নাকটা তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও।'

'ছ'হাজার ফিটে নেমে এসেছে,' অপরপ্রান্ত থেকে জেনারেল জেমস কেলীর গলা ভেসে এল। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। অবশেষে ধীরে ধীরে বললেন, 'স্ক্রীনে প্লেনটা এখন নেই, রডহেম। তোমাদের বোধ হয়…'

'ঠিক আছে, স্যার। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু অ্যাকিউরেট ফিক্স না পেলে, স্যার…'

'পাবার চেষ্টা হচ্ছে। বি-এম-ই-ডব্লিউ-এস কাজ শুরু করে দিয়েছে। স্ট্যান্ড

বাই।'

দু'মিনিট পর প্লেনের মোটামুটি একটা পজিশন জানা গেল। রেডিও রুমের দেয়ালে লটকানো বড় ম্যাপটার সামনে দাঁড়িয়ে চেক করে নিল রডহেম। তারপর হাত বাড়িয়ে অন করল লাউডস্পীকারের সুইচ।

'রডহেম বলছি। এখান থেকে বাইশ মাইল পুব-উত্তর-পুবে একটা প্লেন পড়ে গেছে। ওটা রাশিয়ান হতে পারে। আমরা যাচ্ছি। বড় একটা ট্র্যাক্টর আর স্লিপিং ওয়ানাগান চাই আমার, সেই সাথে দুটো বুলডোজার আর দুটো...' একটু থেমে রডহেম ভাবল, কে জানে ক'জন আরোহীর জায়গা হয় প্লেনটায়। '...না, তিনটে পোলক্যাট। ক্রুরা ট্র্যাক্টর টানেলে রওনা হয়ে যাও। আর ডাক্তার সাহেব যদি তাঁর হাই-ফাই বন্ধ করে আমাদের সাথে যোগ দেন, খুশি হই।'

ক্যাম্পের ডাক্তার ভদ্রলোক মাত্র দুটো জিনিস বোঝেন। রোগী আর গান। তাঁর সামনে যদি রোগী না থাকে তাহলে চোখ বুজে বলে দেয়া যায় তিনি রেডিও নাড়াচাড়া করছেন।

ত্রস্ত পায়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসে লং জনস, গ্রীনফেল ক্লথ ট্রাউজার, জ্যাকেট, ফার হ্যাট ও পারকা, আর বড় সাদা ফেল্ট বুট পরে নিল রডহেম। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল ট্র্যাক্টর শেডে। মাথার ওপর এক্সট্রাকটর ফ্যান ঘুরছে, ডিজেলের ধোঁয়া তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার বাইরে। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে স্লিপিং ওয়ানাগানটাকে পথ ছেড়ে দিল সে। সেটাকে ঠেলে নিয়ে এসে কমলা-সাদা রঙের প্রকাণ্ড ট্র্যাক্টরের সাথে জোড়া লাগানো হলো। ঘাড় ফিরিয়ে ছোট পোলক্যাটগুলোর দিকে তাকাল সে। এরই মধ্যে ওগুলোর ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়া হয়েছে। শেষবার রিস্টওয়াচ দেখে দরজার সামনে দাঁড়ানো বুলডোজারের ক্যাবে উঠে বসল সে। দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে একটা হাত আর মাথা বের করে চেঁচিয়ে বলল, 'চালাও!'

ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দে চাপা পড়ে গেল রডহেমের গলা, কিন্তু সেই ঘোড়সওয়ার যোদ্ধাদের কাল থেকে মানুষ এই হাত-নাড়ার অর্থ করে এসেছে—সামনে বাড়ো! সবগুলো ভেহিকেলের ড্রাইভার জোড়া দস্তানা পরে আছে, সবার হাত পড়ল ট্র্যাক লিভারে। প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করল কনভয়। মেইন রোডের শেষ মাথা আর র‍্যাম্পবেসে পৌঁছবার এটাই একমাত্র পথ। ওখানে পৌঁছে বুলডোজার তার ব্লেড নামিয়ে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিতে শুরু করল বরফ। ক্যাম্প জিরোয় এই অপারেশনের নাম দেয়া হয়েছে দোরগোড়া ঝাড়ু দেয়া। ধীরে ধীরে বরফের ওপরে উঠে আসতে শুরু করল কনভয়। হিটার থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাবগুলোকে গরম করে ফেলেছে তপ্ত বাতাস।

পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে তাই নিয়ে মাথাব্যথা শুরু হলো রডহেমের। আরেক চিন্তা, প্লেনের আরোহীরা না জানি কি অবস্থায় আছে। প্লেন বিধ্বস্ত হবার পর কেউ যদি বেঁচেও যায়, আর্কটিকের উপযোগী পোশাক এবং অন্যান্য উপকরণ না থাকলে কয়েক মিনিটের বেশি টিকে থাকা সম্ভব নয়। তবে কোন ধরনের একটা আশ্রয় যদি পেয়ে যায়, তাহলে আশা আছে। কিন্তু এখানে এই বরফের রাজ্যে কোথায় পাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই? সেখানকার পরিস্থিতিটা কল্পনা করতে গিয়ে শিউরে উঠল সে।

সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে কত তাড়াতাড়ি ওখানে পৌছানো যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করল। দূরত্ব বিশ মাইল। শুনে মনে হয় এই তো কাছে। স্বাভাবিক পরিবেশে তাই-ই। কিছু লোক মাত্র দু'ঘণ্টা দৌড়ে বিশ মাইল পেরোতে পারে। কিন্তু এখানকার পরিবেশ স্বাভাবিক নয়, এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে সে, বিশ মাইল পেরোতে পুরো একটা হপ্তাও লেগে যেতে পারে। পথের মাঝখানে ফাটল থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। কোন কোন ফাটল পঞ্চাশ, এমন কি দুশো ফিট গভীর হতে পারে, চওড়ায় হতে পারে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ ফিট। অন্ধকারে একগজ দূরের জিনিসও অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় না। কখনও কখনও চোখের দু'ইঞ্চি সামনের জিনিসও ঠাহর করা অসম্ভব। তারপর যদি বেশ আয়োজন করে শুরু হয় তুষার ঝড়, তাহলে তো কথাই নেই, সামনে এগোনো বন্ধ। তুষার ঝড় যদি তিন দিন না থামে, সেটাকে এখানে স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হয়। পোলক্যাটগুলোকে ঝড়ের গতিতে ছুটিয়ে দিতে পারলে হত, ভাবল রডহেম। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যেত ক্রুরা। আবার নাও পৌছতে পারত—মাঝপথে হারিয়ে যেতে পারত চিরকালের জন্যে। বরফের রাজ্যে সব সময় চেনার যো নেই ফাটলগুলোকে। বরফের ওপরের স্তর প্রায়ই সরে গিয়ে ফাটলের ওপর নকল ঢাকনি হয়ে পড়ে থাকে। পা ফেলেছ কি মরেছ—ধপাস! একেবারে ফাটলের নিচে!

বিশেষ করে নকল ঢাকনির কথা ভেবেই দুটো বুলডোজার আর ট্র্যাক্টরটাকে চেন দিয়ে একসাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। কনভয়ের সামনের গাড়িটা যদি ফাটলের কিনারা থেকে নিচের দিকে পড়ে যেতে শুরু করে, বাকি দুটো সেটার ওজন সইতে পারবে। টেনে যদি তুলে নাও আনতে পারে, ক্রুরা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত সেটাকে অন্তত ধরে রাখতে কোন অসুবিধে হবে না।

প্রথমে ধীরে ধীরে এগোল কনভয়টা। অচেনা পথ, ড্রাইভারদের মনে নানা অশুভ সংশয়। সবাই যে যার সামনের গাড়ির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে শুধু গাড়ির অস্পষ্ট একটা আকৃতি। পাঁচ মাস ধরে চলেছে রাত, আকাশে চাঁদের হদিস নেই, হেডলাইটের আলোয় বরফের নানান আকৃতির ঝলক ছাড়া পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না।

দু'মাইল এগিয়ে এসে কনভয়ের গতি একটু বাড়ল। পাঁচ মাইল পেরিয়ে রেডিওর সুইচ অন করল রডহেম। 'রডহেম টু জিরো। রডহেম টু জিরো। ওভার।'

'জিরো টু কর্নেল রডহেম। সিগন্যাল গুড, স্যার। কিন্তু আমাদের ডাইরেকশনাল ফিক্সে দেখা যাচ্ছে দু'ডিগ্রী দক্ষিণে সরে গেছেন আপনারা।'

'দু'ডিগ্রী?'

'জী, স্যার।'

মাইক্রোফোন নিচু করে ড্রাইভারের দিকে ফিরল রডহেম। 'দক্ষিণে সরে এসেছি আমরা, লীন। বাঁ দিকে চলো।' আড়চোখে একবার কম্পাসের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ভাবল, ওটা আরও একটু বেশি বিশ্বস্ত হলে ভাল হত। এই ল্যাটিচ্যুডে, ম্যাগনেটিক নর্থ পোলের এত কাছে কখন যে কি ভুল করে বসবে কম্পাস বলা মুশকিল। কয়েক মিনিট পর হাত ইশারায় কনভয়টাকে আবার সোজা করে নেবার নির্দেশ দিল রডহেম। তারপর কথা বলল মাইকে।

'ঠিক আছে, জিরো?'

'ইয়েস, স্যার।'

'নজর রাখো, করপোরাল ব্র্যাডি। ষাট সেকেন্ড পর পর জানতে চাইব আমি।'

পরবর্তী সাত মাইল রেখার ওপরই থাকল কনভয়। মিনিটে একবার করে ডাইরেকশন ফাইন্ডারের রায়ের জন্যে অপেক্ষা করল রডহেম। ভালই এগোচ্ছে ওরা। বারো মাইল পেরোতে ঘন্টাখানেকের একটু বেশি লেগেছে।

বুলডোজার দ্রুত এগোচ্ছে, আচমকা প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল। দুম করে স্ক্রীনে ঠুকে গেল রডহেমের মাথা। ফার হ্যাট আর পারকা হুড ছিল বলে ফাটল না খুলি, কিন্তু মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল তার। পিছিয়ে নিজের সীটে ফিরে এল ও, কিন্তু সামনে এবং নিচের দিকে নেমে যেতে চাইছে শরীরটা। দু'পাশের হাতল ধরে কোনরকমে সীটের ওপর আটকে রাখল নিজেকে। ড্রাইভার লীনের বুকে স্ট্র্যাপ বাঁধা আছে, কাজেই হুইলের সাথে বাড়ি খায়নি। দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে বুঝতে পেরেই চোখের পলকে ব্রেক কষে দিয়েছে সে। কিন্তু বুলডোজার এখন ঝুঁকে আছে চল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে।

অসহায় ভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া করার কিছু নেই। মনে মনে প্রার্থনা করল রডহেম, ক্যাবল যেন কোন গোলমাল না করে। নিশ্চয়ই এখন সেটা টান টান হয়ে আছে। পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। বরফের কোথাও কোন ভাঙচুর নেই। উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল। হেডলাইটের আলো পড়েছে ফাটলের সাদা দেয়ালে। কতটা গভীর ওটা তা এখুনি বলা মুশকিল, তবে আলোর কিনারা দেয়ালের বিশ ফিট নিচ পর্যন্ত আলোকিত করে রেখেছে। ছোট একটা ঝাঁকি খেল 'ডোজার, তারপর আরেকটা। নড়েচড়ে সামান্য একটু ওপর দিকে উঠল হেডলাইটের আলো। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রডহেম। ট্র্যাক্টর আর দ্বিতীয় 'ডোজারটা এখন তাদের ক্যাবল ঢিল হতে না দিলেই বাঁচি, ভাবল সে। একযোগে, ধীরে ধীরে, সোজাভাবে টান দিতে পারলে এটা তেমন কোন সমস্যা নয়। কিন্তু বলা যতটা সহজ কাজটা তারচেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

'পিছু হটার চেষ্টা করব, স্যার?'

'আবার যখন টান অনুভব করবে, তখন। আস্তে আস্তে, লীন,' সতর্ক করে দিল রডহেম। 'আর যাই করো, কিনারাটা ধসিয়ে দিয়ো না।'

কিন্তু ড্রাইভারের সমস্যাটা কি, ভালই জানা আছে রডহেমের। নিজেরই তৈরি চুয়ান্ন ইঞ্চি পথের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে বুলডোজার। জমাট বরফ ভাঙবে কি ভাঙবে না তা নির্ভর করে সেনজিটিভ কন্ট্রোলের ওপর। কিন্তু ড্রাইভারের পায়ে জগদ্দল পাথরের মত ভারী ফেল্ট বুট থাকায় স্পর্শ অনুভব করে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। তোলার জন্যে যথেষ্ট পাওয়ার লাগবে, আবার পাওয়ার বেশি হয়ে গেলে বরফে ঘষা খাবে চাকা। হঠাৎ অনুভব করল রডহেম, কেবিনের লেভেল একটু যেন বদলাল। দেখল, ড্রাইভারের হাত আর পা লিভার আর পেডালের ওপর ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। চোখের কোণ দিয়ে আলোর নড়াচড়া লক্ষ করে সামনে তাকাল ও। আলোর কিনারা ধীরে ধীরে দেয়াল ধরে ওপর দিকে উঠছে। পিছাতে শুরু

করেছে 'ডোজার।

'তাড়াহুড়ো কোরো না,' বলল রডহেম। পথটা ধসছে না, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে কিনারা থেকে পিছিয়ে আসছে ওরা। অপেক্ষা করছে সে, নিজের অজান্তেই আটকে গেছে দম। পিঠে, জুলফির নিচে সড় সড় করে ঘাম নামছে। 'ডোজারটা অসম্ভব ভারী, সেটার নিচে বরফও একটু বেশি নরম, সর্বনাশ ঘটতে বেশি কিছু লাগবে না। নরম বরফ যদি ধসে গিয়ে ফাটলের তলায় পড়ে যায়, তার সাথে 'ডোজারটাও নেমে যেতে পারে। তখন যে ঝাঁকিটা লাগবে, তাতে ক্যাবল ছিঁড়ে যাওয়া খুবই সম্ভব।

কিন্তু এ-যাত্রা সে-সব কিছুই ঘটল না। একমুহূর্ত পর হাতল ছেড়ে সীটের পিঠে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল রডহেম। সমতল বরফের ওপর উঠে এসেছে 'ডোজার। পিছু হটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে সেটাকে নিরাপদ জায়গায় টেনে নিয়ে এল লীন।

'ও. কে. হল্ট।' দরজা খুলে এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রডহেম, প্রকাণ্ড চাকা থামিতেই সেটার ওপর পা দিয়ে দাঁড়াল। তারপর লাফ দিয়ে নামল বরফের ওপর। কয়েক পা এগিয়ে হেডলাইটের চোখ-ধাঁধানো আলোয় থামল ও। হাত নেড়ে বাকি গাড়িগুলোকে এক লাইনে দাঁড় করাল। তারপর ক্যাবে ফিরে এসে টুলস কমপার্টমেন্ট থেকে একপ্রস্থ ক্যাবলসহ একটা হ্যান্ডল্যাম্প বের করল। দু'কাঁধে লাইফ লাইন জড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে এগোল ফাটলের কিনারা লক্ষ্য করে। সবটাই এখন নির্ভর করছে দৈর্ঘ্য আর গভীরতার ওপর। একটা ফাটল কয়েক মাইল লম্বা হতে পারে। লম্বা, গভীর ফাটল রাজ্যের বিপদ ঘটাতে পারে। ওপারে যাবার একমাত্র উপায় সেটাকে পাশ কাটানো। হয়তো কয়েক মাইল ঘুরপথ পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। কিন্তু বিপদ আর আশঙ্কার এখানেই শেষ নয়। ফাটলটা কোথায় আছে, কোন্ পথ ধরে এগিয়েছে তা বোঝারও সহজ কোন উপায় নেই। বরফের পাতলা ঢাকনি হয়তো ফাটলের একটা অংশকে ঢেকে রেখেছে। ভাগ্যদোষে একবার সেখানে পা পড়লেই ভবলীলা সাঙ্গ। তাই লম্বা রড দিয়ে বরফ খুঁচিয়ে দেখে নিতে হয় ওখানে নকল ঢাকনির অস্তিত্ব আছে কিনা। সেটাও একটা ঝুঁকির কাজ। নকল ঢাকনির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কিনা তাই বা জানছি কিভাবে? অসহায় ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রডহেম। কিনারার দিকে এগোবার সময় বারবার থামল ও, পা ঠুকে পরীক্ষা করল বরফ। একটা ওভারহ্যাঙের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ট্র্যাক্টরের ভারেও ঠোঁটটা ধসে পড়েনি। তবু, সাবধানের মার নেই। লাইফ লাইনে ঢিল পড়েছে অনুভব করে ছোট্ট একটা হ্যাঁচকা টান দিল ও, ওটাকে টান টান করে রাখার জন্যে অপরপ্রান্তে যারা আছে তারা যাতে আরও সতর্ক হয়। কিনারায় এসে দাঁড়াল ও। তারপর আলো ফেলল ফাটলের ভেতর।

ত্রিশ, কিংবা পঁয়ত্রিশ ফিট গভীর। দু'দিকের দেয়াল ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে মেঝের সাথে মিলেছে। যতটা আশঙ্কা করেছিল তারচেয়ে খারাপ, কিন্তু যতটা হতে পারত ততটা খারাপ নয়। চওড়ায় টেনে টুনে পনেরো ফিট হবে।

ফিরে এসে লীন আর দ্বিতীয় বুলডোজারের ড্রাইভার জার্নিকে প্রয়োজনীয়

নির্দেশ দিল রডহেম। তারপর ট্র্যাক্টরের গরম কেবিনে উঠে বসে ওদের কাজকর্ম দেখতে লাগল। বুলডোজারের পনেরো-ফুট ব্লেড একবারে আট অথবা নয় কিউবিক মিটার তুষার ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। প্রতিবার প্রায় এক টনের মত তুষার আর বরফ কিনারা দিয়ে ফাটলের ভেতর পড়তে শুরু করল। একটু একটু করে ভরছে গর্ত। রিস্টওয়াচ দেখল রডহেম। এরই মধ্যে বিশ মিনিট বাজে খরচ হয়ে গেছে। ফাটলটা শুধু ভরলেই চলবে না, মেঝেটাকে শক্তও করতে হবে। সব মিলিয়ে আরও এক ঘণ্টার ঠ্যালা। এখন কেউ যদি বলে ওরা পৌঁছে দেখবে প্লেনের আরোহীরা নড়াচড়া করছে, জীবনের সর্বস্ব বাজি ধরে প্রতিবাদ জানাবে ও।

খানিক পর কেবিন থেকে নেমে কিনারায় এসে দাঁড়াল আবার। ফুলস্পীডে কাজ করে যাচ্ছে জোড়া বুলডোজার, ফাটলের ভেতর উঁচু হয়ে উঠছে বরফের স্তর। কিন্তু দেয়াল দুটো ঢালু হয়ে নেমে যাওয়ায় তলার দিকে ফাটলটা সরু আর অপ্রশস্ত, তাই নিচের দিকটা তাড়াতাড়ি ভরে উঠছে। বুলডোজারের ফেলা বরফের স্তর যত ওপরে উঠবে তত বেশি সময় লাগবে ভরতে। পিছনে ইঞ্জিনের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল রডহেম। হিম বাতাস হুল ফুটিয়ে দিল ওর মুখে। কিনারা থেকে সরে এসে লীনকে পথ ছেড়ে দিল ও, তারপর বাতাসের দিকে আবার পিছন ফিরে পারকা হুডের ফিতে টেনে দু'ইঞ্চি চওড়া একটা রিঙ তৈরি করল মুখের সামনে। ওর গরম নিঃশ্বাস বন্দী হয়ে থাকবে রিঙের ভেতর, তাতে ঠাণ্ডা থেকে খানিকটা অন্তত বাঁচবে মুখটা।

হিম রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে একটানা গর্জন করছে প্রকাণ্ড ডিজেল ইঞ্জিনগুলো। ফাটলে বরফ ফেলে সাথে সাথে পিছিয়ে আসছে 'ডোজারগুলো, বরফ তুলে আবার এগোচ্ছে কিনারা লক্ষ্য করে। একটানা, বিরতিহীন। এই অভিজ্ঞতা রডহেমের জন্যে নতুন নয়। জানে, অধৈর্য হয়ে কোন লাভ নেই।

অক্লান্ত ভাবে খাটছে ড্রাইভাররা, কিন্তু কতটুকু কাজ হলো তার হিস্বেব নিতে গেলে মনে হয় চা-চামচ দিয়ে একটা ড্রাম ভরার চেষ্টা করছে তারা। অস্থিরতা দূর করার সবচেয়ে ভাল উপায়, বার বার উঁকি না দেয়া। নজরবন্দী ফাটল ভরতে চায় না। মাথাটাকে যদি অন্য কোন প্রসঙ্গে খাটাতে পারো, তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে পারো নিচটা—মনে হবে, আরে, অনেকটাই তো ভরে গেছে!

রেডিওর সুইচ অন করে ক্যাম্প জিরোর সাথে যোগাযোগ করল ও। 'থিউলকে জিজ্ঞেস করো, প্লেন থেকে তারা কোন সিগন্যাল পেয়েছে কিনা। বলো, তারা যেন সমস্ত ডিসট্রেস ফ্রিকোয়েন্সিতে কান খাড়া রাখে।'

খানিক পর আবার রেডিওতে ফিরে এল ক্যাম্প জিরো। 'করপোরাল ব্যাডি, স্যার। ইন্টারসেপ্ট স্টেশন ঠিক তাই করছে বলে জানাল ওরা। রাডার ট্র্যাক অদৃশ্য হবার পর থেকেই। নো সিগন্যাল।'

'হুঁ। আউট।'

ইচ্ছে হলো বাইরে বেরিয়ে আরেকবার দেখে কতটুকু ভরল। সীটের ওপর নিজেকে জোর করে বসিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল একটা। অস্থির হয়ে লাভই বা

কি? ঠিক এটার মতই, বা এটার চেয়েও অনেক গভীর, অনেক লম্বা চওড়া আরেকটা ফাটল হয়তো ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে মাত্র একশো গজ সামনে। এখন যা যা করা হচ্ছে, সেটাকে ভরার জন্যেও আবার ঠিক তাই করতে হবে।

মিনিট কয়েক পর অন্যমনস্ক ভাবে ক্যাব থেকে নেমে এল রডহেম। পারকা হুডটা আবার এঁটে নিল ও। ধীর পায়ে এগোল, কিন্তু ফাটলের একেবারে কাছে যাবার দরকার হলো না। কিনারার অনেকটা কাছে চলে এসেছে বরফের স্তর। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ভরে যাবে ফাটল। এবার আর ফিরল না ও, একধারে দাঁড়িয়ে থেকে লেভেলের উঠে আসাটা দেখতে লাগল। একটু পরই ঠাণ্ডা পেয়ে বসল ওকে। জমাট বরফে পা ঠুকে, বার বার হাত ভাঁজ করে রক্ত চলাচল বাড়াতে চেষ্টা করল ও।

ড্রাইভারদের নির্দেশ দেবার কোন দরকার নেই। এই কাজ এর আগে অনেক বার করতে হয়েছে তাদের। ফাটলটা কানায় কানায় ভরার কাজ শেষ করেও থামল না তারা, আরও বরফ ফেলে জায়গাটাকে উঁচু করতে লেগে গেল। এই ফাঁকে নিজের শরীরটা একবার চেক করে নিল রডহেম। বুট আর দস্তানার ভেতর নাড়ল আঙুলগুলো, মুখের পেশীতে চিমটি কাটল। সবচেয়ে বড় শত্রু ফ্রস্টবাইট। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চোখের পাতা, নাক, চোয়ালের হাড় আর থুতনি পরীক্ষা করল ও। প্রথম এগুলোই অসাড় হয়।

পাঁচ ফিট উঁচু হয়ে উঠেছে বরফের স্তূপ। ক্রুরা পা দিয়ে মাড়িয়ে যতটা সম্ভব শক্ত আর মসৃণ করে নিল স্তূপটাকে। হাত নেড়ে একটা পোলক্যাটকে সামনে বাড়ার নির্দেশ দিল রডহেম। দ্রুত এগিয়ে এল সেটা, থামল স্তূপের কিনারায়। এগিয়ে গিয়ে সেটার দরজা খুলল রডহেম।

'আস্তে আস্তে, একবারে এক ফুটের বেশি নয়। স্কি রানারের নিচে ডেবে যাবে বরফ, সামনের দিকে তুমি ঝুঁকে পড়তে পারো। তাহলেই থামবে, টেনে সিধে না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। পরিষ্কার?'

'ইয়েস, স্যার।'

ট্র্যাক্টরের সাথে পোলক্যাটের ক্যাবল জোড়া লাগানো হলো। এরপর স্তূপের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল পোলক্যাট। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠল নাক, কিন্তু তারপরই প্রথম বিরতির সময়, বরফ ডেবে যাওয়ায় নিচু হতে শুরু করল সেটা। তারপর আবার এগোতে শুরু করল পোলক্যাট। উঁচু হলো নাক, নিচু হলো। স্তূপের মাথায় গিয়ে চড়ল পোলক্যাট। নামার সময় কিন্তু একবারও উঁচু হলো না তার নাক, ড্রাইভারও কোন বিরতি না নিয়ে দ্রুত পেরিয়ে গেল ঢালটা।

কিন্তু পোলক্যাট তেমন ভারী নয়, মাত্র দু'টন ওজন। আর 'ডোজার বা ট্র্যাক্টরের ওজন প্রায় বিশ টন। হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল রডহেম, পোলক্যাট তার সেই আগের রাস্তার পাশ ঘেঁষে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে ফিরে এল এপারে। রডহেমের নির্দেশ পেয়ে 'ডোজারগুলো আবার বরফ ফেলতে শুরু করল স্তূপের ওপর। অপারেশনটা পাঁচবার পুনরাবৃত্তি করল ওরা। এরপর বড় একটা গাড়িকে সামনে এগোতে দেবার ঝুঁকি নিল রডহেম।

নির্দেশ পেয়ে লিভার ঘোরাল লীন, ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল 'ডোজার। স্তূপের

কিনারায় পৌঁছেও থামল না সেটা, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিন্তু তারপরই দ্রুত বেশ খানিকটা নেমে গেল তার নাক। মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল 'ডোজার। ঝট্ করে ফিরল লীন।

'আর এক ফুট এগোও,' বলল রডহেম।

এদিক ওদিক দুলল 'ডোজারের নাক। ধীরে ধীরে ডেবে যাচ্ছে বরফ। মাথা নাড়ল রডহেম। 'আরও কিছু বরফ ফেলে, শক্ত করে নিতে হবে।' রিভার্স গিয়্যার দিয়ে 'ডোজারকে পিছিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করল লীন।

কয়েক মিনিট পর দেখা গেল পনেরো ফিট লম্বা ফ্ল্যাগস্টিক বরফে গেঁথে সেতুটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং কনভয়টা ধীরে ধীরে এপার থেকে ওপারে চলে যাচ্ছে।

আবার নতুন করে শুরু হলো যাত্রা। রিস্টওয়াচের ডায়ালে চোখ বুলাল রডহেম। দু'ঘণ্টার কিছু বেশি হয়েছে ক্যাম্প জিরো থেকে বেরিয়েছে ওরা। এই পরিবেশে দু'ঘণ্টা বেঁচে থাকবে কেউ, সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কিন্তু তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অকুস্থলে পৌঁছতে হবে। এবং কনভয়টাও অচল হয়ে পড়েনি। কাজেই চলো সামনে।

অবাধে এগিয়ে চলল কনভয়। ক্যাম্প জিরোর ডাইরেকশনফাইন্ডার ওদেরকে কোর্সে থাকতে সাহায্য করল। পথে আরেকটা ফাটল বাধা দিল বটে, কিন্তু গভীরতায় সেটা দশ ফিটের বেশি নয়, বুলডোজার দুটো মিনিট কয়েকের মধ্যেই ভরে ফেলল সেটা।

চল্লিশ মিনিট পর মাইলেজ মিটারের দিকে তাকাল রডহেম। নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত প্লেনের কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। ব্যাডির রিপোর্ট, সোজা কোর্স ধরে এগোচ্ছে কনভয়। ক্যাবের মাথার ওপর সার্চলাইট ফিট করা আছে, সেটা জ্বালল রডহেম। ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল সার্চলাইট। উজ্জ্বল আলোয় দুশো গজ পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, তারপর অস্পষ্ট। প্লেনটা বরফ স্পর্শ করার পর কোনদিকে কতদূর হড়কে, পিছলে বা ছুটে গেছে অনুমান করার কোন উপায় নেই। লীনকে থামার নির্দেশ দিল রডহেম। পারকা হুডের ফিতে টেনে মুখের সামনে আবার একটা রিঙ তৈরি করল, তারপর নেমে পড়ল ক্যাব থেকে।

নির্দেশ পেয়ে একটা মাত্র সারিতে দাঁড়াল গাড়িগুলো। একটার পিছনে একটা থাকলে বিপদের ঝুঁকি শুধু সামনের গাড়িটাকেই নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে ঝুঁকি নিতে হবে সবগুলোকে। কিন্তু প্লেনটাকে খুঁজে বের করতে হলে এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

একশো গজ দূরে একটা করে গাড়ি, মোট ছয়টা। হেডলাইট জ্বেলে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল সবগুলো একসাথে। বাতাসে ভর করে ছুটে যাওয়া তুষার মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকে রডহেম ভাবল, এই অবস্থায় তুষারের নিচে চাপা পড়তে কতক্ষণ সময় নেবে প্লেনটা? ফিউজিলাজ যদি চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে থাকে, লেজটা যদি ভেঙে ছোট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কোন আশা সেই, এরই মধ্যে চিরকালের জন্যে তুষারের নিচে হারিয়ে গেছে সমস্ত চিহ্ন। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার হচ্ছে, কোন প্লেন বিধ্বস্ত হলে তার কিছু না কিছু একটা…হয় ডানা, না হয়

লেজ খাড়া হয়ে থাকে আকাশের দিকে।

মিনিট কয়েক পর ডান দিকে একটা পোলক্যাটের আলো ঘন ঘন জ্বলতে নিভতে দেখল রডহেম। লীনকে কিছু বলতে হলো না, ডোজারের নাক ঘুরিয়ে সেদিকে এগোল ওরা। কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই গভীর দাগটা দেখতে পেল রডহেম। লম্বা একটা দাগ, গর্তই বলা যায়, এরই মধ্যে অর্ধেকের বেশি ভরে গেছে তুষারে। জমাট বরফে খুব ভারী কিছু একটা ঘষা খেলেই শুধু এই রকম একটা গভীর দাগ তৈরি হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বরফে ঘষা খেয়ে কোন্ দিকে গেছে প্লেনটা? উল্টোদিকে ঘোরার চেয়ে সামনে এগোনো সহজ, কাজেই গোটা কনভয়টাকে ডানদিক ধরে এগোবার নির্দেশ দিল সে। দুশো গজ এগোবার পর হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল রাতের আকাশের গায়ে কি যেন একটা খাড়া হয়ে রয়েছে। বেড়ে গেল সবগুলো গাড়ির স্পীড।

বড়সড় জেটটা কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া অংশগুলোর কোথাও কোন চিহ্ন নেই, অনেক আগেই চাপা পড়ে গেছে তুষারের নিচে। কিন্তু লম্বা ফিউজিলাজটা মোটা একটা পাইপের মত পড়ে আছে বরফের ওপর। পিছন দিকটা ভেঙে বাঁকা হয়ে গেছে।

এখন আর আগুনের ভয় নেই, ভাবল রডহেম। হয় এরই মধ্যে পুড়ে গেছে, তা নাহলে আগুন ধরবেই না ওটায়। প্লেনের পোর্ট সাইডে বুলডোজার নিয়ে এল লীন, লাফ দিয়ে নিচে নামল রডহেম। সাথে হ্যান্ডল্যাম্প।

সাবধানে ভাঙা ফিউজিলাজে চড়ল সে। প্লেটিঙের এবড়োখেবড়ো কিনারা এড়িয়ে কয়েক পা এগোল, আলো ফেলল চারপাশে। উল্টে পড়া কয়েকটা ড্রাম ছাড়া কিছু নেই। আন্দাজ করল, ওগুলো বোধহয় তেলের ড্রাম। ধীরে ধীরে এগোল ককপিটের দিকে। ভাঙা দরজাটা ঝুলে আছে এখনও, সেটা ধরে সরিয়ে দিল একপাশে। তারপর ঢুকে পড়ল ককপিটে।

এক, দুই করে গুণল রডহেম। মোট পাঁচজন। সবাই যে যার সীটের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। প্রত্যেকের মাথা নুয়ে আছে, বুকে ঠেকে আছে চিবুক। এই নির্জন বরফের রাজ্যে নিজেদের মৃত্যুতে ওরা নিজেরাই যেন শোক পালন করছে। রেডিও অপারেটর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে তার সেটের ওপর। পাইলট আর কোপাইলট ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। একপাশে হেলে পড়েছে নেভিগেটর, শরীরটা ছুঁই ছুঁই করছে কেবিনের মেঝে। ভাঙা উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস ঢুকছে, নেভিগেটরের চার্টগুলো উড়ছে সেই বাতাসে। আরেকজন লোককে দেখা গেল পাইলটের পিছনের সীটে। সামনের সীটের পিঠে ধাক্কা লেগে গুঁড়িয়ে গেছে তার মাথা।

সংঘর্ষটা কেউই সামলাতে পারেনি, বুঝতে পারল রডহেম। এক অর্থে এদেরকে ভাগ্যবানই বলতে হবে। সে নিজে যদি থাকত এই প্লেনে, যাতে তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয় সেই প্রার্থনাই করত সে। সংঘর্ষের পর ঠাণ্ডায় জমে মরার জন্যে বেঁচে গিয়ে লাভ কি? তখন শুধু সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, অথচ মনে মনে জানা আছে সাহায্য যদি শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়ও, সময় মত পৌঁছবে না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে এল রডহেম। লাশগুলো তুলে ক্যাম্প জিরোতে নিয়ে যাবে ওরা। ওখান থেকে প্লেনে করে পাঠিয়ে দেয়া হবে থিউলে, সেখান থেকে ফেরত পাঠানো হবে···সম্ভবত রাশিয়ায়।

ক্রুদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আবার বিধ্বস্ত প্লেনের ভেতর চড়ল রডহেম। কোন রাশিয়ান প্লেনে এই প্রথম তার পা পড়ল। বাইরে থেকে শব্দ ভেসে এল, বুঝল, ট্র্যাক্টরটা প্লেনের পাশে টেনে নিয়ে আসছে ওয়ানাগানকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে মুক্ত করা হবে লাশগুলো, তারপর বের করে নিয়ে যাওয়া হবে বাইরে। কৌতূহলের সাথে প্লেনের ভেতরটা দেখতে শুরু করল সে। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। যতদূর বুঝতে পারল, এটা একটা মিলিটারি এয়ারক্রাফট।

একটু নিরাশ হয়েই বাইরে বেরিয়ে এল রডহেম। ভাঙা আর বিচ্ছিন্ন ডানা দুটো পড়ে আছে কয়েক গজ দূরে, এরই মধ্যে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে তুষারের নিচে। ধীর পায়ে এগোল সে। ইঞ্জিনের খানিকটা অংশ দেখতে পেল, বরফের নিচে ডেবে আছে বেশির ভাগ। গ্রীনল্যান্ড আইসক্যাপে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে আর কিছুক্ষণ পর। কেমন যেন বিষণ্ন বোধ করল সে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলেই সামনেটা দেখতে পায়নি। হঠাৎ কি যেন বাধল পায়ে। আছাড় খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল, কোনমতে সামলে নিল। কিসে পা বাধল দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়ল সে। লম্বা, চকচকে একটা পাইপ, পিছনটা মাছের লেজের মত দেখতে। ফেল্ট বুটের ঘা দিয়ে চারপাশের বরফ সরিয়ে পাইপটাকে মুক্ত করল সে। আধুনিক মেশিনারি এমনই যে কোন্‌টা কি কাজ করে দেখে তা বোঝার কোন উপায় নেই। কিন্তু এই পাইপটা ক্যানসাসে দেখা শস্য থেকে ধুলো পরিষ্কার করার একটা মেশিনের কথা মনে করিয়ে দিল রডহেমকে। নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। আর যাই করুক, রাশিয়ানরা এখানে কোন কিছুর ধুলো সাফ করতে আসেনি।

ক্যাম্প জিরোতে ফিরতে দু'ঘণ্টা লাগল ওদের। শেডে ফিরে এসে চুপচাপ হয়ে গেছে ভারী ভেহিকেলগুলো। লাশগুলো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে স্টোরেজ টানেলে। অলস, ক্লান্ত পায়ে অফিসার্স ক্লাবের দিকে এগোল কর্নেল রডহেম। বারে পৌঁছে ওল্ড গ্র্যান্ডড্যাডের অর্ডার দিল সে। তারপর চিন্তিত ভাবে নিচে তাকাল। স্নো-বুটের সাদা ফেল্ট তেল লেগে কালো হয়ে গেছে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। না। জিনিসটা তেল বলে তো মনে হচ্ছে না! হাত দিয়ে ফেল্টটা ছুঁলো সে। সাথে সাথে কালো হয়ে গেল আঙুলগুলো। কি হতে পারে জিনিসটা? একমুহূর্ত পর বুঝল সে। স্রেফ কার্বন। তার মানে, প্লেনে তাহলে নিশ্চয়ই আগুন লেগেছিল। বোধহয় একটা ইঞ্জিনে···কিন্তু···

ড্রিঙ্ক শেষ করেই নিজের কেবিনে ফিরে যাবে রডহেম, তারপর রিপোর্ট লিখতে বসবে।

দুই

ফাঁকা হাইওয়ে, হাতে ঝকঝকে মার্সিডিজ, স্পীড লিমিটের মধ্যে থেকেই গাড়ি চালাচ্ছে মাসুদ রানা। গতি—একশো মাইল। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে জরুরী একটা কাজে ওয়াশিংটনে এসেছে ও, কাজ সেরে একবার ঢুঁ মারতে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কে। ঢাকা থেকে রওনা হবার আগেই নিউ ইয়র্কে দু'দিন কাটাবার প্ল্যান করেছে সে। আরও থাকতে পারলে ভাল হত, কিন্তু ঢাকায় জরুরী কাজ আছে। কাজেই নিউ ইয়র্ক থেকে কাল অথবা পরশু বাংলাদেশ বিমানে চড়তে হবে ওকে। রেন্ট-এ-কার কোম্পানী হার্জের কাছ থেকে ভাড়া করা গাড়িটা ওদের নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চে পৌঁছে দিলেই হবে।

লম্বা পথ। আবোল তাবোল অনেক কথাই ভাবছিল রানা, হর্নের কর্কশ আওয়াজ শুনে ধ্যান ভাঙল। ভিউ মিররে দেখল, একটা প্রকাণ্ড ট্রাক। স্পীড না কমিয়ে রাস্তার একপাশে সরে এল ও। মার্সিডিজকে ওভারটেক করে সামনে এগিয়ে গেল ট্রাক, বোধহয় রাস্তা ছাড়তে দেরি করেছে বলেই রানার দিকে কটমট করে একবার তাকাল গরিলা আকৃতির ড্রাইভার। মাথাটা একটু নিচু করে সানগ্লাসের রিমের ওপর দিয়ে তাকিয়ে মুখ ভেংচাল রানা। ততক্ষণে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে ড্রাইভার। দুটো গাড়ির মাঝখানের ফাঁক দ্রুত বাড়তে শুরু করল। ঘণ্টায় একশো বিশ কি পঁচিশ মাইল গতিতে ছুটছে ট্রাক। পিছনের ক্যারিয়ারে কিছু আছে বলে মনে হলো না, বোধহয় ফিরে যাচ্ছে গ্যারেজে।

রাস্তার দু'পাশে তাকাল রানা। একপাশে ফাঁকা ময়দান, আরেক পাশে জঙ্গল। জঙ্গলের দিকে কাঁটাতারের উঁচু বেড়া, হাইওয়ের সাথে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছে। কাঁটাতারের বেড়া অনুসরণ করে অ-নে-ক দূর পর্যন্ত, প্রায় আধ মাইল দূরের ট্রাকটাকেও ছাড়িয়ে গেল রানার দৃষ্টি। হঠাৎ কাঁটাতারের বেড়ার ওপর আটকে গেল চোখ। অনেকটা দূর, খুঁটিনাটি স্পষ্ট নয়, কিন্তু বেড়ার গায়ে ওটা যে একজন মানুষ তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। জঙ্গলের দিক থেকে বেড়ার মাথায় ওঠার চেষ্টা করছে লোকটা। উঠলও। কিন্তু কিভাবে যেন হাত ফসকে পড়ে গেল নিচে। একমুহূর্ত পর আবার বেড়ার মাথায় দেখা গেল লোকটাকে। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার। কি দেখল কে জানে, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়ল বেড়ার এপারে। মাটির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক হাত এগোল লোকটা, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে চলে এল রাস্তার ওপর। মাথার ওপর তুলে উন্মত্তের মত নাড়তে শুরু করল হাত দুটো।

এতদূর থেকেও ট্রাকের তীব্র হর্নের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ড্রাইভার যে থামবে না তা বেশ বোঝা গেল। একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে মনে করে শরীরের পেশী টান টান হয়ে উঠল রানার। রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছে ট্রাক।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখে তারপর লাফ দিল লোকটা। সাঁ করে চলে গেল ট্রাক। হতভম্ব লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বোকার মত তাকিয়ে থাকল ট্রাকের পিছন দিকে। তীব্র বেগে দূরে সরে যাচ্ছে সেটা। একমুহূর্ত পর লোকটা আবার ঘুরে দাঁড়াল। এবার মার্সিডিজকে লক্ষ্য করে হাত নাড়তে শুরু করল সে।

থামেনি বলে ট্রাকের ড্রাইভারকে দোষ দিতে পারল না রানা। লোকটার কাপড়চোপড় নোংরা, কাদা-পানি লেগে রয়েছে। হাতমুখও পরিষ্কার নয়। মাথার চুল এলোমেলো। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল লোকটার আচরণ। পাগল ছাড়া কেই বা এভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছুটন্ত গাড়ি থামাবার চেষ্টা করে? ট্রাক ড্রাইভারের মত ওরও বোধহয় উচিত হবে এড়িয়ে যাওয়া। যে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেয় সে খুনীর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

এই সময় কেমন যেন চমকে উঠে জঙ্গলের দিকে ফিরল লোকটা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানা দেখল, কাঁটাতারের বেড়ার গা বেয়ে ওপরে উঠছে ওভারকোট পরা দু'জন লোক। দু'জনেই ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, চেহারায় মরিয়া, উত্তেজিত ভাব। বুঝতে অসুবিধে হয় না, লোকটাকে ধাওয়া করে আসছে ওরা। লোকটা হয়তো কোন পাগলাগারদ বা মেন্টাল ক্লিনিক থেকে পালিয়ে এসেছে। ইতোমধ্যে রাস্তার মাঝখান থেকে না সরে মার্সিডিজের দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে লোকটা। তার হাবভাব দেখে মনে মনে ভয়ই পেয়ে গেল রানা। বদ্ধ উন্মাদের চেহারা। আতঙ্কে, নাকি হিংস্র আক্রোশে বলা মুশকিল, চোখ দুটো বিস্ফারিত। মার্সিডিজ পাশ কাটাতে চেষ্টা করলে সে লাফ দিয়ে সামনে পড়ে হলেও সেটাকে থামাবার চেষ্টা করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আচ্ছা বিপদে পড়া গেল তো!

ট্রাক ড্রাইভারের মতই পাশ কাটাতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু হঠাৎ অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে লোকটার দশ ফুট সামনে দাঁড় করাল গাড়ি। প্রাণ নিয়ে দৌড়াচ্ছিল সেদিন রানা নিজেই, পেছনে ধাওয়া করছিল বিশাল এক দৈত্য—গুংগা, করাচীতে। তখন ছিল রাত। ভাগ্যিস সেদিন গুংগাকে চিনতে পেরেছিল অনীতা, তাই প্রথমে ওকে মাতাল মনে করে গাড়ি নিয়ে পাশ কাটিয়ে পালালেও, ফিরে এসেছিল আবার।* মস্ত বিপদে পড়েছিল সেদিন রানা, এই লোকটাও কি···

গাড়ি থামার আগেই চিৎকার জুড়ে দিয়েছে লোকটা। 'ডাক্তার! ডাক্তার!'

জানালার কাঁচ নামিয়ে মাথাটা বাইরে বের করল রানা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। অসম্ভব হাঁপাচ্ছে। 'আ-মি···আমি এ-কজন ডা-ক্তার!' ঘাড় ফিরিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে দ্রুত একবার তাকাল সে। চেহারায় আতঙ্ক। 'আর্জেন্ট! ভেরি আর্জেন্ট!'

ঘুরে গাড়ির ওদিকে যেতে ইঙ্গিত করল রানা। তারপর পাশের সীটের ওপর ঝুঁকে খুলে দিল দরজা। গাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে খোলা দরজার কাছে চলে এল লোকটা। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সীটে। কাঁটাতারের বেড়ার দিকে তাকাল রানা।

* স্বর্ণমৃগ দ্রষ্টব্য।

নিচে নেমে রাস্তার দিকে ছুটে আসছে লোক দু'জন। তাদের একজনের একটা হাত ওভারকোটের ভেতরে লুকানো। দৌড়াবার সময় বাতাসে উড়ছে ওভারকোটের নিচের প্রান্ত, পলকের জন্যে হাতে ধরা চকচকে কি যেন একটা দেখতে পেল ও। সেদিকে চোখ রেখেই জানতে চাইল, 'ওরা না পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করি, কেমন?'

রানার কজির ওপরটা লোহার মত শক্ত আঙুল দিয়ে খামচে ধরল লোকটা। 'না! দোহাই আপনার! ওরা আমাকে...'

হাসিটা চেপে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। দ্রুত এগোচ্ছে আর চেঁচিয়ে হাত নেড়ে ওকে থামতে বলছে লোক দু'জন। ওরা রাস্তায় উঠে আসার আগেই স্যাৎ করে ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মার্সিডিজ।

'ধন্যবাদ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোকটা।

'আপনি ডাক্তার?' খোলাখুলি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'এই অবস্থা হলো কি করে?'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের উইন্ডস্ক্রীনের দিকে তাকাল লোকটা, তারপরই মাথা নিচু করে নিল।

'কি হলো?'

'ওরা যদি গুলি করে?' অনেক কষ্টে একটা ঢোক গিলল লোকটা।

'গুলি করবে? কেন?'

সীটের কিনারা দিয়ে আবার পিছন দিকে তাকাল লোকটা,ওভারকোট দুটো অনেক পিছনে পড়ে আছে দেখে সিধে হয়ে বসল সে। 'কেন? তা তো জানি না!' চোখে নিখাদ সারল্য ফুটে উঠল।

'জানেন না?' একটু কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা।

নিজের নোংরা কাপড়চোপড়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিল লোকটা। হাতের আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল মুখে লেগে থাকা আধভেজা কাদা। তারপর বলল, 'বিশ্বাস করুন...' হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে, যেন বিশ্বাস করাবার চেষ্টা বৃথা বুঝতে পেরে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল। 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি, মি....?'

'মাসুদ রানা। নিউ ইয়র্ক। আপনি?'

'প্রিন্সটন। আপনার পথেই পড়বে।'

আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাল রানা। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি শহর। 'এই পোশাকে আপনাকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেবে বলে তো মনে হয় না।'

একটু যেন বিচলিত দেখাল লোকটাকে। বিড়বিড় করে বলল, 'তাই তো!'

আন্দাজ করল রানা, ত্রিশ কি বত্রিশ বছর বয়স হবে লোকটার। শুধু কাদা-পানি আর ঘাম নয়, এসবের সাথে আতঙ্ক আর ক্লান্তির ছাপ পড়ে হারিয়ে গেছে আসল চেহারা, দেখে বোঝার কোন উপায় নেই ভদ্রলোক সুস্থ কিনা বোকার মত নিজেকে ঝামেলায় জড়ালাম না তো?—নিজেকেই জিজ্ঞেস করল রানা। এর পেছনে কিছুটা অন্তত সময় এখন আর খরচ না করলেই নয়। যদি মেন্টাল কেস হয়, সাধারণ মানুষের জন্যে লোকটা মস্ত এক বিপদ। ক্লিনিক থেকে পালিয়ে গিয়ে এ-ধরনের লোকেরাই তো ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি করে বেড়ায়। প্রায়ই এদের কীর্তির

বিবরণ ছাপা হয় খবরের কাগজে। এ যদি তাদেরই একজন হয়ে থাকে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা ওরই করতে হবে। আবার, লোকটা যদি সত্যিই কোন বিপদে পড়ে থাকে, তাহলে একে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দেয়া দরকার।

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনি যে ডাক্তার তার কোন...'

রানার কথা শেষ হবার আগেই পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে খুলল লোকটা। ভেতরে একটা আইডেনটিটি কার্ড দেখা গেল।

এতে অবশ্য কিছুই প্রমা'' হয় না, ভাবল রানা। ছবি নেই। কার্ডটা অন্য কারও কিনা এই মুহূর্তে তা জানার কোন উপায় নেই।

'আপনার নাম জন এডওয়ার্ডস?'

'হ্যাঁ, ড. জন এডওয়ার্ডস।' অন্যমনস্ক ভাবে বলল লোকটা।

'ওরা আপনাকে তাড়া করছিল কেন?' হালকা সুরে জানতে চাইল রানা। 'ভুল ওষুধ খাইয়ে ওদের কোন রোগী মেরে ফেলেছেন বুঝি?'

হাসল না লোকটা। অনেকটা সময় কেটে গেল, উত্তর দেবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। গুণ্ডা-পাণ্ডা এমন কি মেন্টাল কেস হলেও বানোয়াট একটা কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকার কথা। এই লোকের বেলায় উল্টোটা ঘটছে।

'আচ্ছা, ধরুন, আমি যদি আপনাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসতাম, কি ঘটত?'

চমকে উঠে রা‥র দিকে ফিরল লোকটা। 'কিছু বললেন?'

আবার প্রশ্নটা করল রানা।

গম্ভীর হয়ে উঠল লোকটার চেহারা। 'আমার দম ফুরিয়ে এসেছিল, ধরা পড়ে যেতাম।'

'তারপর কি ঘটত?'

খানিক চুপ করে থেকে ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠল লোকটা। ধীর কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'মেরে ফেলত।'

'কেন? কি করেছেন আপনি ওদের?'

কাঁধ ঝাঁক‥ল লোকটা, কিন্তু উত্তর দিল না।

'আমার মনে হয়, প্রিসটনে নয়, আগে আপনার পুলিস স্টেশনে যাওয়া উচিত।'

'না,' আশ্চর্য দৃঢ়তার সাথে বলল লোকটা। 'ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

'কেন, বিশ্বাস করবে না কেন?'

রানার দিকে তাকাল লোকটা। 'কারণ, আমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে আমার নিজেরই তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। কেউ আমাকে পাগল ভাবুক, আমি তা চাই না।'

'ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার বিশ্বাস করার জন্যেই তো আছে পুলিস!' বলল রানা। 'আপনাকে নিয়ে এমন কি ঘটেছে যে...'

'যা ঘটেছে তার কোন হাতামাথা নেই। কাজেই বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। পুলিসের কাছে গেলে উল্টো আমার বিপদ আরও বাড়বে।' রাস্তার দু'পাশে তাকাল

লোকটা। তারপর আবার বলল, 'সামনেই প্রিন্সটন। দয়া করে নামিয়ে দিন আমাকে…দেখি নিজের চেষ্টায় বিপদ কাটাতে পারি কিনা।'

আর যাই হোক কথা শুনে লোকটাকে পাগল-ছাগল বলে মনে হচ্ছে না। কৌতূহলের মাত্রা বেড়েই চলল রানার। বলল, 'আপনার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। কারও সাহায্য না নিয়ে…'

'আপনি বুঝতে পারছেন না!' অধৈর্যের সুরে বলল লোকটা। 'সাহায্য আমার দরকার নেই, একবারও কি সে-কথা বলেছি আমি? কিন্তু আমার কথা কেউ বিশ্বাস না করলে সাহায্য করবে কেন?'

'আপনি ধরেই নিচ্ছেন কেউ আপনার কথা বিশ্বাস করবে না,' বলল রানা। 'আর কারও কথা জানি না, আমি হয়তো আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারি। বিশ্বাস করবই, তা কিন্তু বলছি না। তবে করতেও পারি। আর যদি বিশ্বাস করি, আপনাকে হয়তো আমি সাহায্যও করতে পারব।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল লোকটা। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল ওকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আমেরিকান, নাকি আমার মত বিদেশী?'

'আপনি বিদেশী?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা। 'পেশা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বিদেশী। তবে আমাকে আপনি আইনের লোক বলতে পারেন।' লোকটার চেহারায় সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি একটু হেসে বলল, 'আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। যাকে বলে পুলিস, আমি ঠিক তা নই, কাজেই ওদের সাথে আমার কোন আত্মীয়তাও নেই। তবে, আপনার সাহায্যের দরকার হলে সে-ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

আরও কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লোকটা। 'না। শুধু সময়ের অপচয় হবে। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।'

'নাহয় করবই না,' বলল রানা। 'তবু বলতে দোষ কি? যথেষ্ট সময় হাতে আছে আমার। কথা দিচ্ছি, সব শোনার পরও কোন মন্তব্য করব না আমি। কিংবা, পুলিসও ডাকব না।'

আবার তীব্র আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু রানা নাছোড়বান্দা বুঝতে পেরে, এবং সব কথা কাউকে বলে নিজেকে হালকা করার একটা তাগিদ অনুভব করে, কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'বেশ!'

প্রিন্সটনের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁ। নির্জন এক কোণের একটা টেবিলে বসে আছে রানা আর লোকটা। বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে সদ্য এইমাত্র হালকা নাস্তা শেষ করেছে লোকটা। কফির কাপে চুমুক দিয়ে খোশ মেজাজে একটা সিগারেট ধরাল সে।

'আপনার এবং আমার, দু'জনেরই বেশ অনেকটা সময় নষ্ট হবে,' বলল সে, 'কিন্তু তবু আপনি যখন ছাড়বেনই না, আর কথাগুলো কাউকে বলে আমারও যখন

হালকা হওয়া দরকার—শুনুন। কিন্তু তার আগে কি কি কথা দিয়েছেন আপনি, স্মরণ করিয়ে দেব কি?'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন,' বলল রানা।

'শোনার পর কোন মন্তব্য করবেন না,' স্মরণ করিয়ে দিল লোকটা, 'এবং, পুলিস ডাকবেন না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মনে আছে আমার। শুরু করুন।'

সিগারেটে টান দিল লোকটা। মুচকি হাসল। বলল, 'ভাবছি, কোত্থেকে শুরু করব।'

'একেবারে প্রথম থেকে। সবটা শুনতে চাই আমি। সবিস্তারে কিছুই বাদ দেবেন না।'

'কিছুই না? ঠিক আছে, শুনুন তাহলে।'

শুরু হলো গল্প।

তিন

বিচ্ছিরি একটা দিন। সেই সকাল থেকে পালা করে হয় বৃষ্টি নাহয় শিলা। তারপর যেই সন্ধে হলো, অমনি শুরু হয়ে গেল তীব্র বাতাস। সেই সাথে বৃষ্টি আর শিলা যেন নিজেদের মধ্যে জোট পাকিয়ে একযোগে হড়হড় করে নেমে আসতে শুরু করল। একটা ট্যাক্সির জন্যে রাস্তার মোড়ে আধ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজলাম। তারপর আমার মনে পড়ল, এটা খোদার গজব পড়া শহর নিউ ইয়র্ক, যেখানে হঠাৎ বাতি চলে গেলে ধর্ষিতা হয় মেয়েরা। ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে লুটেরারা। শহর থেকে লাপাত্তা হয়ে যায় খালি ট্যাক্সিগুলো। ট্যাক্সি যে কম দেখলাম তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটাই কেউ না কেউ আমার আগে দখল করে বসে আছে। খালি কিনা জানি না; তাই ট্যাক্সি দেখলেই হাত নেড়ে থামাবার চেষ্টা করলাম। নিউ ইয়র্কের ড্রাইভার, সবাই চমৎকার প্রতিদান দিল। একবারও পিছিয়ে গিয়ে গা বাঁচাবার সুযোগ পেলাম না, প্রতিটা ট্যাক্সি কাদা-পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিয়ে গেল আমাকে।

অগত্যা হেঁটে ফিরতে হলো। ভারী ওভারকোট গায়ে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটা যে কি কষ্টকর, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারও পক্ষে তা টের পাওয়া সম্ভব নয়। কম করেও চারগুণ ওজন বেড়ে গেছে ওটার। লাইট ওয়েট ট্রাউজারের কিনারা থেকে জলপ্রপাতের মত পানি পড়ছে আমার জুতোর ভেতর।

গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল থেকে পঁচাত্তর নম্বর স্ট্রীট অনেক দূর, জীবনে এই প্রথম হেঁটে ফিরতে গিয়ে আমার মনে হলো, ওটা যেন দুনিয়ার আরেক প্রান্তে। নিজের পছন্দ আর রুচি দিয়ে মনের মত করে সাজিয়েছি অ্যাপার্টমেন্টটা, আগামী বছর কয়েকের জন্যে ওটাই আমার ঠিকানা। অ্যাপার্টমেন্টটা আমি ভালবাসি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হতে লাগল, নোংরা পরিবেশে, বিশ্রী ভাবে সাজানো একটা

অ্যাপার্টমেন্টেও আপত্তি নেই আমার, সেটা যদি পঁচাত্তরের বদলে ঊনপঞ্চাশ নম্বর স্ট্রীটে হয়।

কিন্তু পঁচাত্তর পঁচাত্তরই থাকল, হাঁটতে হাঁটতে জান বেরিয়ে যাবার যোগাড়। শেষ পর্যন্ত অ্যাপার্টমেন্টের কাছে পৌঁছে গরম পানিতে গোসল আর কয়েক ঢোক স্কচ হুইস্কির স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম আমি। ডিপার্টমেন্টাল হেডের বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত আছে আজ রাতে, কাজেই আবার আমাকে বেরোতে হবে। তবে এবার আমি তৈরি হয়ে, সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই বেরুব, দু'একজন পথিকের গায়ে যাতে কাদা-পানি ছিটাতে পারি।

ভিজে কুকুর যেমন ছাদের নিচে এসেই গা ঝাড়া দেয়, অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সুইংডোর ঠেলে, ভেতরে ঢুকে আমিও তেমনি দিলাম। তারপর এগোলাম এলিভেটরের দিকে।

হঠাৎ কানে এল বুড়ো রয়ের গলা। 'প্রফেসর এডওয়ার্ডস, এসে গেছেন আপনি?'

দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরলাম। বাইশ পাটি দাঁত বের করে সেন্ট্রিবক্স থেকে বেরিয়ে এল রয়। হাতে একগাদা চিঠিপত্র।

'ডক্টর বললেই চলবে,' মৃদু গলায় বললাম আমি।

'কিন্তু এখানে আপনাকে প্রফেসর বলা হয়েছে,' অপর হাত দিয়ে বিশেষ একটা চিঠি বের করে দেখাল সে। 'কংগ্রাচুলেশনস। আপনার পদোন্নতিতে আমি খুব খুশি হয়েছি, স্যার!'

পদোন্নতি হয়নি, কিন্তু ভিজে শরীরে তা নিয়ে তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না আমার। 'হুম,' গাম্ভীর্যের সাথে বললাম ওকে। 'ধন্যবাদ।' এদিকে ইংরেজ এই আমরা দু'জনই। আমাকে ছাড়া আর সবার সাথেই বেপরোয়া একটা ভাব দেখায় রয়, আসলে যদিও ভীতুর ডিম সে, একটা আরশোলা মারতেও হাত কাঁপে। আর আমি, সেই ছোটবেলা থেকে,...চুপিচুপি বলি, বেজায় ডানপিটে, ঘরকুনো ডাক্তার না হয়ে হতে পারতাম দুর্ধর্ষ একজন সৈনিক বা অ্যাডভেঞ্চারার, অথচ এমন একটা ভাব নিয়ে থাকি যেন আমার মত গোবেচারা ভালমানুষ আর হয় না, ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানি না। ছোটবেলায়ও এই ভাবটা নিতে হত, কারণ আমার চেয়ে বেশি ডানপিটেদের হাতে ধোলাই খাবার ভয় ছিল। আর এখন ডাক্তারী পেশার সাথে ওই ভাবটা একান্তভাবে দরকার।

এক রকম ছোঁ দিয়েই রয়ের হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে স্যাৎ করে ঢুকে পড়লাম এলিভেটরে। মাথার হ্যাট খুলে এক মিনিট চার সেকেন্ড অপেক্ষা করলাম। তারপর এলিভেটর থেকে বেরিয়ে নিজের ফ্লোরে পা রাখলাম। দরজা খুলে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকে প্রথম কাজটাই হলো বাথরুমে গিয়ে গরম পানির কলটা খুলে দেয়া। বাথরুম থেকে বেরিয়ে চিঠিপত্রগুলো ডেস্কের ওপর রেখে আলমিরার ভেতর থেকে বের করলাম জনি ওয়াকারের বোতল। পানি মিশিয়ে আধ গ্লাসটাক গলায় ঢেলে একে একে শরীর থেকে নামাতে শুরু করলাম জগদ্দল পাথরগুলো।

হাড় থেকে ঠাণ্ডার শেষ রেশটুকু দূর করতে দশ মিনিটের বেশি লাগল না, তবু

আমি আরও দশ মিনিট আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে থাকলাম বাথটাবে। এখানে বলে রাখি, গরম পানিতে গোসল করার যে কি আরাম তা নিয়ে অবসর জীবনে একটা বই লেখার ইচ্ছে আছে আমার যত ডানপিটেই হই, তখন তো আর অ্যাডভেঞ্চার করার বয়স থাকবে না

আবার তোমার কোলে ফিরে আসব, বাথটাবকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠে পড়লাম। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ঢুকলাম বেডরুমে। প্রথমেই ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে রিস্টওয়াচ দেখলাম একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার। ডিনার পার্টিতে সময় মত পৌঁছানো চাই কাপড়চোপড় পরছি, এই সময় মনে পড়ল কথাটা। কার এমন দয়া হলো যে হুট্ করে প্রফেসর বানিয়ে দিল আমাকে?

কাপড় পরে গাদা থেকে তুলে নিলাম প্রথম চিঠিটা এনভেলাপ ছিঁড়ে ভেতরের কাগজটা পড়লাম রিডারস ডাইজেস্টের একটা প্রস্তাব আমি যদি সেরা কনসার্টের এক সেট রেকর্ড কিনি, যতদিন বাঁচব ততদিন আমার ওপর খুশি থাকবে ওরা। দ্বিতীয় চিঠিটাও একটা অনুরোধ, ইলেকট্রিসিটি কোম্পানী থেকে। এরাও ডলার চায়। পরের দুটো বীমা কোম্পানীর সার্কুলার। তারপরেরটা একটা ওষুধ কোম্পানীর বহুরঙা লিটারেচার—সবিনয় প্রার্থনা নয়, বলিষ্ঠ দাবির সুরে আমার মূল্যবান সময়ের কিছুটা চেয়েছে তারা। সেই সাথে কসম খেয়ে বলতে চেয়েছে, আমার রোগীদের অব্যাহত ভাল স্বাস্থ্যের জন্যে এটা নাকি একান্তভাবে দরকার। এবং লাভজনক; কার লাভ তা কিন্তু উল্লেখ করেনি। হঠাৎ কথাটা আমার মনে পড়ে যাওয়ায় হাসি পেল আমার। ওষুধ কোম্পানী বেচারা জানে না, আমার হাতে এখন আর কোন রোগী নেই কারণ, এখন আর আমি 'ডাক্তার' নই। সম্ভবত তাদের মতই কেউ একজন, বোধহয় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ হবে, ডাক্তার থেকে কয়েক ধাপ ওপরে তুলে প্রফেসর করে দিয়েছে আমাকে। আরও কয়েকটা চিঠি দেখলাম কোনটাতেই আমাকে প্রফেসর বলে সম্বোধন করা হয়নি। নির্দিষ্ট চিঠিটা আরও অনেক নিচে পড়ে আছে, এদিকে আমার হাতে সময় কম, দুত্তোরি ছাই বলে সরে এলাম ডেস্কের সামনে থেকে। পরে এক সময় দেখা যাবে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমার বন্ধু ডাক্তার আর প্রফেসরদের স্ত্রীরা গাঢ় রঙের স্যুট খুব বেশি পছন্দ করে, একবার দেখলে হয়, অমনি মৌমাছির মত ঘিরে ধরে তাকে কুমার জীবনে মেয়েদের সান্নিধ্য আমার ভালই লাগে, বিশেষ করে বন্ধুদের মধ্যে আমার বয়স সবচেয়ে কম বলে ওরা আমাকে এখনও 'ইয়ং ম্যান' বলে সম্বোধন করায় সান্নিধ্যটুকু আরও বেশি লোভনীয়, কিন্তু বন্ধুত্ব হারাতে চাই না বলে ভুলেও কখনও আমি এই সব পার্টিতে গাঢ় রঙের স্যুট পরে যাই না। অনেক বেছে শেষে হালকা রঙের স্যুটের ওপর একটা ট্রেঞ্চ কোট চাপালাম, তারপর তৈরি হলাম বেরিয়ে পড়ার জন্যে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত নিজেকে দেখে নিচ্ছি, এই সময় খুঁত খুঁত করে উঠল মনটা। হতে পারে গর্দভ, কিন্তু লোকটা আমার পদমর্যাদা বাড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রফেসর, নো জোক; মহৎ ব্যক্তিটি কে তা অন্তত জানা দরকার।

ডেস্কের সামনে ফিরে এসে খুঁজে বের করলাম চিঠিটা। ঠিকানার জায়গায় লেখা হয়েছে—প্রফেসর এডওয়ার্ড, ফ্যাগস (এফ.এ.জি.এস.)। কল্পনা করুন

ব্যাপারটা! তিনটে শব্দ তিনটে ভুল। এক, আমি শুধু একজন ডক্টর। দুই, আমার নাম এডওয়ার্ড নয়, এডওয়ার্ডস। তিন, আমি একজন সার্জেন, জিওগ্রাফার নই। সন্দেহ নেই, মাতাল কোন টাইপিস্টের কারবার। কিন্তু তারপরই পোস্টমার্কটা নজরে পড়ল। ভুরু কুঁচকে উঠল আবার। পরিষ্কার পড়া গেল পোস্টমার্কটা—ক্যাপিটাল লেটারের এম, তারপর বাকি সব স্মল লেটারগুলো এই রকম—ও, সি, কে, বি এবং এ। তারিখ দেয়া আছে দু'হপ্তা আগের সে যাই হোক, এই রকম একটা পোস্টমার্ক দেখার পর চিঠিটা না খুলে পারে কেউ?

এনভেলাপ ছিঁড়ে ভেতর থেকে বের করলাম একটা বুকলেট। মুঠোর ভেতর দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলাম এনভেলাপটা। তারপর খুললাম বুকলেট। ছাপা অক্ষর, গোটা গোটা, পরিষ্কার, কিন্তু রাশিয়ান বর্ণমালা। জিনিসটা কি, কে পাঠিয়েছে কিছুই বোধগম্য হলো না। এক এক করে সবগুলো পাতা ওল্টালাম, ভেতরে কোন কমপ্লিমেন্ট স্লিপও নেই। এটাকে একটা প্রসঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে আজ রাতে, এই ভেবে বুকলেটটা পকেটে ভরে রাখলাম। তারপর দরজায় তালা দিয়ে নেমে এলাম নিচে, বেসমেন্ট গ্যারেজে।

হপ্তার পুরো একটা দিন আমার এম-জির পেছনে ব্যয় করি আমি। গাড়িটা তাই আজ তিন বছর পরও ঝকঝকে, একেবারে আনকোরা নতুনের মত দেখতে লাগে। কেনার সময় এর মাথার ওপর শক্ত কিছু ছিল না, ছিল ক্যানভাস। কিন্তু বুদ্ধি করে একটা হার্ডটপ লাগিয়ে নিয়েছি আমি। স্টার্ট দিতেই গর্জে উঠল এম-জি। ওর এই আওয়াজটা কানের জন্যে তেমন স্বাস্থ্যকর না হলেও, আমার ভাল লাগে। একজন নিরীহ ডাক্তারের ছদ্মবেশ নিয়ে আছি, হুঙ্কার ছেড়ে প্রতিবাদ জানানো আমার শোভা পায় না। কিন্তু এই সমাজ আর নিজের অক্ষমতার ওপর আমার যে অভিযোগ নেই তা বলি কিভাবে! আমি পারি না, কিন্তু আমার গাড়ি অন্তত কর্কশ রব তুলে প্রতিবাদ জানাতে পারে, এবং জানায়—এখানেই আমার সন্তুষ্টি।

আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়লাম। শহরটাকে আড়াআড়ি ভাবে পেরিয়ে পার্কের দিকে ছুটে চলল আমার মুখপাত্র এম-জি।

বৃষ্টির সাথে শিলার জোট ভেঙে গেছে। চম্পট দিয়েছে দু'জনেই। তাদের জায়গায় নতুন অতিথি এসেছে—তুষার কণা। বাতাসের সাথে উড়ে এসে আঠার মত আটকে থাকছে উইন্ডস্ক্রীনে, ওয়াইপারের ব্লেড ঠেলে সরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকছে তারা। আশার কথা হলো, রাস্তার ওপর স্তূপ হয়ে ওঠার ক্ষমতা এখনও অর্জন করেনি। তবে ভিজে রাস্তাটা পিচ্ছিল হয়ে আছে। সেই সাথে কমে গেছে দৃষ্টিসীমা। আমার মত একজন ডানপিটেরও ঘণ্টায় বিশ মাইলের বেশি স্পীড তুলতে সাহস হলো না।

ডানপিটে শব্দটার সূত্র ধরেই বলি, আমার মত একজন সাহসী লোকও নিউ ইয়র্ককে ভয় পায়। অবসর জীবনে যদি সময় মেলে, আরও একটা বই লিখব আমি, বিষয় হবে নিউ ইয়র্ক। এই যে ম্যানহাটন দিয়ে যাচ্ছি, এখানে এই মুহূর্তে কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে জানেন? মাফিয়া! আর যেদিকে যাচ্ছি সেই পার্কের ভেতর, কারা ওত পেতে অপেক্ষা করছে জানেন? রেপিস্ট, গুণ্ডা, খুনী, হাইজ্যাকার। নিউ ইয়র্কের ইস্ট সাইডে দেখতে পাবেন দুনিয়ার স্কাইস্ক্র্যাপার। ওখানে কিছু গাছ আর কাঁচও

আছে, কিন্তু দেখে মনে হবে ওগুলো যেন ইস্পাত আর ইঁট-পাথরের রাজ্যে সৌন্দর্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! যে শহর আপনার রুচিকে বিকৃত করে তুলতে পারে, তার কথা আর কি বলব বলুন!

নিঃশ্বাসের সাথে প্রার্থনা না আউড়ে রাতের বেলা কখনও আমি পার্কের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালাই না। হে পরিত্রাতা, ডিস্ট্রিবিউটর হেডে যেন পানি বা বাস্পের কণা না পড়ে! অথবা হে যীশু, ধুলোর একটা কণা ফুয়েল সিস্টেমের কোথাও যেন আটকে না যায়, তাহলে কারবুরেটরের পথ বুজে যাবে! রাতে যদি সেন্ট্রাল পার্কে থেমেছেন, নির্ঘাত আপনি বিপদে পড়বেন। সভ্যতার বাই-প্রোডাক্ট দলে দলে বিচরণ করছে ওখানে, আপনার যা কিছু আছে সব চুরি করবে তারা, এবং মজা করার জন্যে আপনাকে চিত করে ফেলে পেটে পা রেখে কিছুক্ষণ নাচানাচি করতেও ছাড়বে না। মাঝে মধ্যে জানতে ইচ্ছে করে আমার, চোর-ছ্যাচোড়, গুণ্ডাপাণ্ডারা নিজেরাও ওখানে যেতে ভয় পায় কিনা। শিকার না পেলে, ওরা কি নিজেরাই নিজেদের জিনিস চুরি করে?

বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়লাম পার্কের ভেতর। অন্যমনস্ক থাকার ভান করলাম, ভাবতে শুরু করলাম, আজ রাতের ডিনারটা কেমন জমবে! ট্রাফিক খুব কম, নেই বললেই চলে। এই দুর্যোগে কে-ই-বা বাইরে থাকতে চায়! সবাই তো আর আমার মত অবিবাহিত নয়, এবং সবাইকে তো আর তার বন্ধুর স্ত্রীরা ইয়ং ম্যান বলে সম্বোধন করে না!

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, অন্যমনস্কতার ভান করলেও, বিপদের আশঙ্কা ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারছি না। কাজেই মনটাকে ডাইভার্ট করার জন্যে রেডিও খুলে ওয়েদার রিপোর্ট সেবন করতে শুরু করলাম। কোথাও কোন অশুভ কিছু চোখে পড়ল না। সাবলীল ভাবে এগিয়ে চলেছে আমার এম-জি। তারপর, হঠাৎ করেই, উজ্জ্বল হেডলাইট জ্বেলে মস্ত একটা গাড়ি কোত্থেকে কে জানে, আমার একেবারে পিছনে চলে এল। রিয়ার ভিউ মিরর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল আলোটা। হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে চেষ্টা করলাম আমি। সেই সাথে কোত্থেকে কোথায় গিয়ে পড়ব ভেবে ব্রেক কষে দিলাম। তার আগেই অবশ্য টের পেয়েছিলাম, পিছনের গাড়িটা বাঁ দিকে সরে গেছে। এম-জি হঠাৎ থামলে ধাক্কা লাগার কোন সম্ভাবনা ছিল না, ধাক্কা লাগলও না। যদিও ঠিক তখুনি আমার মনে পড়ল, পার্কের ভেতর কোন গাড়িকে ওভারটেক করা কঠোর ভাবে নিষেধ করা আছে।

কিন্তু নিষেধটা মানল না ড্রাইভার। চোখের পলকে এম-জির পাশে চলে এল মস্ত সিডান। আচমকা পাছা দিয়ে এম-জির পাশে দুম করে গুঁতো মেরে বসল। একেবারেই তৈরি ছিলাম না, চোখের সামনে দুলে উঠল দুনিয়াটা। ছিটকে কোথায় যে পড়লাম, প্রথম কয়েক সেকেন্ড টেরই পেলাম না। তারপর আবিষ্কার করলাম, গাড়ির ভেতরই আছি আমি। হাত লম্বা করে দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম স্টিয়ারিং হুইল, ঘোরাতে শুরু করলাম দ্রুত। যখন মনে হলো, চাকাগুলো সিধে করতে পেরেছি, রিলিজ করে দিলাম ব্রেক।

এই সময় শতধাবিভক্ত হয়ে ফেটে গেল সামনের উইন্ডস্ক্রীন। এই ছিল বরফের

মত পরিষ্কার, পরমুহূর্তে ঝাপসা হয়ে গেল। দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে আঠারো ইঞ্চি চওড়া একটা গর্ত করলাম স্ক্রীনের গায়ে। গর্তের ভেতর দিয়ে দেখলাম, রাস্তার শেষ মাথার কাছে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সিডান। হাতের তালুর ধাক্কায় উইন্ডস্ক্রীনের বাকি কাঁচ ফেলে দিলাম বনেটের ওপর। চারদিকে তাকালাম এবার। রাস্তা থেকে নেমে এসেছে এম-জি। কিন্তু এখনও চার চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বেরাদার। মোটরটাও চালু। রাস্তার ওপর উঠে এসে স্পীড বাড়িয়ে দিলাম। আশা, সিডানকে হয়তো ধরতে পারব। ড্রাইভার লোকটা যে তুখোড় আর ডানপিটে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার চেয়েও বেশি কিনা সুযোগ পেলে সেটা আমি জানার চেষ্টা করব।

কিন্তু একটু পরই বুঝলাম, জানার সুযোগ আমি পাব না। পার্ক থেকে বেরিয়ে যাবার একাধিক রাস্তা আছে, এবং আমাকে ধাক্কা দিয়েছে বুঝতে পেরেই ফুল স্পীডে কেটে পড়েছে ড্রাইভার।

ঠাণ্ডা হাত, ঠাণ্ডা মুখ নিয়ে বেরিয়ে এলাম পার্ক থেকে। কাপড়-চোপড়ের সামনের দিকে কিছু তুষারও জমেছে। কি রকম মেজাজ নিয়ে বেরিয়ে এলাম তা আর নাই-বা বললাম। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম যে লোকটা তো আর জেনেশুনে ধাক্কা দেয়নি! এটা একটা দুর্ঘটনা। পুলিসী হাঙ্গামায় পড়তে হতে পারে, এই ভয়ে যত তাড়াতাড়ি অকুস্থল ছেড়ে পালিয়েছে। আমারও তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, কারণ বীমা কোম্পানী মেরামতের খরচ যোগাবে।

কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, ড্রাইভার সম্পর্কে আমার ধারণাটা সঠিক ছিল না।

চার

বুড়ো, মাঝবয়েসী, এবং একমাত্র ইয়ং ম্যান আমাকে নিয়ে পার্টি। মেয়েদের বয়সের বিবরণ দেয়া একটু কঠিন। ষাট বছরের হোস্ট, আমাদের ডিপার্টমেন্ট প্রধানের স্ত্রীর কথাই ধরুন। ভদ্রমহিলার বয়স নাকি ত্রিশ, অথচ দেখে মনে হয় বিশ-বাইশের বেশি নয়। আবার আমার একজন বন্ধুর স্ত্রীর কথা ধরুন, ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয় কম করেও চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স, কিন্তু তিনি দাবি করে থাকেন তাঁর নাকি এখনও ত্রিশ পুরো হয়নি। নিউ ইয়র্কের এই ওষুধ বিশেষজ্ঞরা, যাঁরা মনে করেন জাতির সেবা করার জন্যে তাঁদের মত পেশা নাকি আর একটাও নেই, কমবেশি সবাই একটু ঘরকুনো, কাজেই পরচর্চা করা খারাপ এই কথাটা বলে নিয়ে এরা সবাই গুছিয়ে, আয়োজন করে ওই কাজটিই করে থাকেন। মজার ব্যাপার হলো, এদের স্ত্রীরা ঠিক উল্টো কিসিমের। একটা কথা তো স্বীকার করতেই হবে যে তাদের স্বামীরা সবাই কর্তব্যপরায়ণ, ব্যারাম আর ব্যারামীদের পিছনে যতটা সময় দিয়ে থাকেন তার একশো ভাগের এক ভাগও জীবনসঙ্গিনীর পেছনে দিতে পারেন না। কাজেই, তাঁদের স্ত্রী যদি স্বামীর চেয়ে পরপুরুষের দিকে একটু বেশি ঝুঁকে পড়ে, এবং সেটা যদি একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে বেচারীদের দোষ দেয়া

যায় কি? কদাচ স্বামীর সান্নিধ্য পেলেও, সেটা স্ত্রী গ্রহণ করে না। এটা ওই অভ্যেসের দোষ। এবং লাভের সবটুকুই আমার। অনেকদিনের মেলামেশা, আমার সাথে খাতির জমাবার গরজ আছে যাদের তারা এরই মধ্যে জেনে নিয়েছে যে পরচর্চা জিনিসটা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। এ-ব্যাপারেও, তারা একটা অভ্যেস গড়ে নিয়েছে। স্বামীরা যা খুশি করুন, আমার সামনে তারা কেউ পরচর্চা করে না। কিন্তু জানে, ইয়ং ম্যান বা ওই জাতীয় প্রশংসা করলে আমার দুঃসাহসী, ডানপিটে সত্তাটা নিদারুণ খুশি হয়। প্রায় সব ডিনার পার্টিতে ওই কাজটাই করে তারা। আজও তার কোন ব্যতিক্রম হলো না।

কিন্তু আজ তারা অনুভব করল, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে। এই প্রথম কেউ জিজ্ঞেস না করা সত্ত্বেও পাঁচ বছর বাড়িয়ে নিজের বয়সটা জানিয়ে দিলাম ওদের। সেই থেকে সবাই খুব সতর্ক হয়ে গেল, এবং ভুল করেও এরপর কেউ আর আমাকে ইয়ং ম্যান বলে সম্বোধন করল না। তারপর, সত্য-মিথ্যে মিলিয়ে এন্তার পরচর্চা শুরু করলাম। মাঝরাতের অনেক আগেই দেখা গেল, মেয়েরা কেউ নেই আমার পাশে, কিন্তু তাদের স্বামীরা আমাকে ঘিরে আছেন।

রাত সাড়ে এগারোটার সময় হোস্টের স্ত্রীর কাছে বিদায় চাইলাম আমি। 'এত তাড়াতাড়ি?' অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে আরেকজনের দিকে সমস্ত মনোযোগ আরোপ করে জানতে চাইল সে।

আর হোস্ট ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কি বললেন, সবটা শুনতে পেলাম না। '...আবার, মাই বয়।' শুধু এইটুকু কানে ঢুকল। 'দেখা হবে' এই শব্দ দুটো বোধহয় মুখের বাইরে বের হয়নি। অথবা আমার কান দুটো একবার পরীক্ষা করা দরকার।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে মনে হলো, তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে আজ আমি মুক্ত হলাম। দেখি, তুষারপাত থেমে গেছে। কে জানে, গোটা জগৎ সংসারকেই বুঝি একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছে। উইন্ডস্ক্রীনের জায়গায় ওয়াইপার দিয়ে আটকে রেখে গিয়েছিলাম একটা খবরের কাগজ। কে জানে সেটা আছে কিনা। বন্ধু ভাবাপন্ন কোন পথিক গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় দয়া করে সেটা খুলে ফেলে দিয়ে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এর নাম নিউ ইয়র্ক!

গাড়ি বারান্দায় নেমে এসে প্রথমে গুণলাম চাকাগুলো। ভাগ্যই বলতে হবে, একটাও চুরি যায়নি। খবরের কাগজটা নেই বটে, কিন্তু যতক্ষণ তুষার পড়েছে ততক্ষণ জায়গা মতই ছিল ওটা, তাই ভেতরে ঢোকার সময় সাথে কোদাল নিতে হলো না। কিন্তু সীটে বসার প্রায় সাথে সাথে ভিজে গেল আমার ট্রাউজার।

পথে কোন সিডান ধাক্কা মারল না আমাকে। দিব্যি পৌঁছে গেলাম ঠিকানায়। গ্যারেজে ঢুকে দেখি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এলিভেটরের পাশের পার্কিং স্পেসটা খালি। শুধু তাই নয়, এলিভেটরটাও রয়েছে নিচে, হা হা করছে দরজা। গাড়ি থেকে নেমেই ঢুকে পড়লাম ভেতরে, তারপর টিপে দিলাম বোতাম। কিন্তু সবার ভাগ্য যে আমার মত ভাল নয়, সেই মুহূর্তে টের পেলাম আমি। দরজাটা বন্ধ হতে আর মাত্র ইঞ্চি কয়েক বাকি, এই সময় ওটার গায়ে ঠকাস করে কি যেন ঠুকে গেল। ক্ষীণ কাতরধ্বনি ঢুকল আমার কানে। বুঝলাম, শেষ মুহূর্তে এলিভেটরে চড়তে গিয়ে

খুলিতে আঘাত পেয়েছে কেউ।

আবার খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। হল পেরিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম। খুশি খুশি ভাবটা নিমেষে উবে গেল মন থেকে, হাত-পা-অন্তর সব ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল। ভাল করে পরখ করা ধৈর্যে কুলাল না। আবার বেরিয়ে এসেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। পরমুহূর্তে কল-বেলটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরলাম। আমি যখন বাইরে ছিলাম, তখন কেউ ঢুকেছিল আমার ঘরে। হয়তো এখনও ঘরের ভেতরই আছে সে। একজন নাকি একদল, জানি না। ছুরি থেকে রাইফেল, যে-কোন অস্ত্র থাকতে পারে তাদের কাছে। ঠিক নার্ভাস হয়ে পড়েছি তা নয়, কিন্তু এই রকম মুহূর্তে কারও সাহায্য কামনা করা বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে হলো। আপদে বিপদে রয়কে সাহায্য করেছি আমি, এখন তার পালা। এলিভেটরের দরজা খুলে ছুটে এল সে। যদিও প্রথমে আমি বুঝতে পারলাম না ও রয় নাকি অন্য কেউ। কারণ তার মাথার ওপরের অর্ধেক আর একটা চোখ সাদা ব্যান্ডেজের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। অপর চোখে রাজ্যের রাগ আর ঘৃণা, এক টুকরো কয়লার আগুনের মত ব্যান্ডেজের নিচে জ্বলছে সেটা। বছর কয়েক আগে রিটায়ার করেছে রয় রবার্ট, যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে মেয়ের কাছাকাছি থাকবে বলে। লোকটা খিস্তি করতে জানে না।

'রয়! এ কি দশা হয়েছে তোমার···?'

'আমাকে মেরেছে! জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে চাবি। কোন্ অ্যাপার্টমেন্টের, এখনও বুঝতে পারছি না আমি। ওরা কি আপনার···?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে বলো তোমার জখমের কি অবস্থা?'

'আমি ঠিক আছি, স্যার। কয়েক জায়গায় শুধু খুলির ওপরের চামড়া ছড়ে গেছে। কিছু চুরি হয়েছে নাকি, স্যার?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'জানি না। খুলেই বন্ধ করে দিয়েছি দরজা···'

দাঁত বের করে হাসল বুড়ো রয়। কোমরে হাত দিয়ে টেনে বের করল এক হাত লম্বা একটা পুলিসের হাতের ছড়ি। 'আমরাও নিরস্ত্র নই, স্যার। খুলুন দরজা, দেখা যাক।'

স্টিকটাকে আদৌ অস্ত্র আখ্যা দেয়া যায় কিনা সন্দেহ ছিল আমার, কিন্তু রয়ের কাছে নিজে ভীতু বলে প্রমাণিত হওয়া আমার সাজে না। কেউ যদি ঘরের ভেতর থেকে থাকে, তার কাছে ফায়ার আর্মস থাকা বিচিত্র নয়। এই রকম পরিস্থিতিতে যা করা উচিত তাই করলাম, আমার ডানপিটে সত্তাটাকে ঘুম থেকে তুললাম। দরজা খুলতে একটু হাত কাঁপল না আমার। কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকলাম আমরা দু'জন একসাথে। আলোটা রয়ই জ্বালল।

আবছা অন্ধকারে মেঝেতে দুটো কুশন পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই ঘরের সবকিছু ওলটপালট হয়ে আছে। এখন দেখলাম, তা নয়। অ্যাপার্টমেন্টটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে তা বেশ বোঝা গেল। পাকা হাতের কাজ। কিন্তু জিনিসপত্র কিছু নষ্ট করেনি। দুটো ঘরই খুঁটিয়ে দেখলাম আমি। প্রতিটা আলমিরার দরজা খুললাম। কেউ নেই।

'কিছু খোয়া গেছে, স্যার?'

চারদিকে তাকালাম। কিছু খোয়া গেছে বলে মনে হলো না। দামী একটা সিলভারের সিগারেট কেস ছিল ডেস্কে, আমার বাবার প্রেজেন্ট করা, জায়গামতই রয়েছে সেটা—তবে খোলা অবস্থায়। অথচ পরিষ্কার মনে আছে গত একমাস ওটার গায়ে হাত পড়েনি আমার, রোজ যখনই তাকিয়েছি দেখেছি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ডেস্কের একধারে। বেডরুমে ফিরে এসে শার্টের সোনার বোতামগুলো চেক করলাম, সব ঠিক আছে। একজন স্পোর্টসম্যান হিসেবে অল্প বিস্তর পরিচিতি আছে আমার, তবে কখনও কোন খেলায় আমি প্রাইজ পাইনি, কাজেই সেগুলো চুরি যাবার প্রশ্ন ওঠে না।

'মনে হয় না।'

'ওষুধ, স্যার? ছিল কিছু?'

মাথা নাড়লাম।

কাধ ঝাঁকাল রয়। ধারণা করি, এই নিয়ে এ-ধরনের ঘটনা ওর জীবনে দশ হাজার বার ঘটল। সেই প্রথমবারের উত্তেজনা এখন আর অনুভব করার কথা নয়। 'আপনাকে হয়তো ব্যাটারা আর কেউ ভেবেছিল। ভুল করে…'

'হতে পারে,' বললাম। 'ধন্যবাদ, রয়।'

'তবু, স্যার, পুলিসে একটা খবর দেয়া দরকার। আমার ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি।' একটু গর্বের সাথেই মাথার ব্যান্ডেজটা স্পর্শ করল বুড়ো।

মনে পড়ল, পুলিসে চাকরি করত রয়। বললাম, 'ঠিক আছে, খবর দেব।'

'কিছু চুরি যায়নি শোনার পর ওরা হয়তো আজ রাতে আর আসবে না…'

'আসবে না।'

'কিন্তু সকালে অবশ্যই একবার টুঁ মেরে যাবে।'

'তা যাবে,' হঠাৎ অসম্ভব ক্লান্ত লাগল। 'ঠিক আছে, রয়।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিয়ে চলে গেল রয়। দরজা বন্ধ করে দিয়ে জনি ওয়াকারের বোতল থেকে খানিকটা ঢাললাম। পানি মিশিয়ে চুমুক দিলাম গ্লাসে। মেজাজটা যে খুব একটা তিরিক্ষি হয়ে আছে তা নয়, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছি মনে মনে। সব ধরনের নাড়, বাসা, বাড়ি অত্যন্ত পবিত্র জায়গা, এখানে কারও অনধিকার প্রবেশ মেনে নেয়া যায় না অদ্ভুত এক অপমান বোধ করলাম আমি। এবং অপমানের জ্বালাটা আরও বেড়ে গেল যখন সন্দেহ হলো, ঘরের প্রতিটি ফার্নিচার আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আধভেজা স্যুটটা খুলে ফেললাম। ভাবলাম ঝর্ণার নিচে দাঁড়ালে জ্বালা বোধহয় কিছুটা কমবে। কিন্তু কমল না। পাজামা ড্রেসিং গাউন আর স্লীপার পরে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে অমন পাঁচ সাত বার করে গেলাম। প্রতিটা দরজা পরীক্ষা করলাম পঞ্চাশ বার করে। সামনের দরজায় বড় আকারের দুটো বোল্ট আর একটা চেইন আছে, সবগুলো আটকে দিলাম।

বিছানায় উঠে চোখ বুজলাম। এক ঘণ্টা কাটল, দু'ঘণ্টা কাটল। কিন্তু কোথায় ঘুম! আসলে চেষ্টা করলেই টের পেয়ে যায় শরীর, তখন সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায় সে শরীরের এই খেয়ালীপনা আগেও আমি লক্ষ করেছি। যখন বই পড়তে বসি, ঘুমে ঢেকে আসতে চায় চোখ। শেষ পর্যন্ত শরীরের সাথে

আলোচনা করে ব্যাপারটার ফয়সালা করব বলে ঠিক করলাম। বললাম, আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছ না কেন? উত্তরে বলল, বাঁ হাতটাকে মাথার নিচে চেপে রাখলে ব্যথা পাই না আমি? কাজেই মাথার নিচ থেকে হাতটাকে বের করে বললাম,এবার ঘুমাতে দাও। বলল, দেখলে তো, বালিশটা কত নিচু! এই ভাবে চলল। শরীরের নির্দেশ মত যতবারই বিছানার পরিবেশ এবং নিজের ভঙ্গি বদল করি না কেন, পরক্ষণেই নতুন একটা অভিযোগ তোলে সে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে কথা বন্ধ করে দিলাম তার সাথে।

এমন জঘন্য, কষ্টকর আর লম্বা রাত আমার জীবনে আর আসেনি। এয়ারলাইন পাইলটরা বলে থাকে, একটানা কয়েক ঘণ্টা প্লেন চালানো ভয়ঙ্কর একঘেয়েমির কাজ, কিন্তু এই একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে আতঙ্ককর মুহূর্তগুলো। আমার বেলায়ও আজ রাতে ঠিক তাই ঘটল। ঘরের চারদিকে তাকালাম। একটু পর অন্ধকারের মধ্যে ফার্নিচারের কাঠামো দেখতে পেলাম। কিন্তু বাকি সব গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে। কোথাও কোন নড়াচড়া টের পেলাম না। খসখস একটু শব্দের জন্যে অনেকক্ষণ কান পেতে থাকলাম। শুনলাম না। অথচ খুব বেশিক্ষণ হয়নি এই ঘরের ভেতর কে বা কারা যেন ঘুরে বেড়িয়েছে, কাবার্ড-আলমিরা-দেরাজ খুলে, কার্পেট-তোষক তুলে কি যেন খুঁজেছে।

কিন্তু কেন? কারা?

শোনা যায়, মূল্যবান কিছু আছে কিনা খবর নিয়ে তবেই চুরি করতে আসে চোর। কিন্তু বাজারে ভাল দামে বিক্রি হবে এমন কিছু আমার ঘরে নেই। ভুল করে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছিল, রয়ের এই ধারণাটাও ধোপে টেকে না। প্রচুর গহনাগাটি বা নগদ টাকা পয়সা আছে এমন কেউ আমাদের এই বিল্ডিঙে থাকে না। যদি চোর হয়ে থাকে, তাহলে খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে বলে নিশ্চয়ই রেগে কাঁই হয়ে গিয়েছিল, অথচ তার কোন লক্ষণ নেই কোথাও। ফেরার সময় পা ছুঁড়ে একটা চেয়ারও উল্টে দেয়নি। কে না জানে, খালি হাতে ফিরে যাবার সময় চোর-ডাকাতেরা ঘরদোরের কিছু ভাঙতে বাকি রাখে না। মালিক যদি সেই মুহূর্তে বাড়িতে না থাকে, তাহলে কার্পেটেই হয়তো নোংরা কাজটা সেরে ফেলে, তারপর তাই দিয়ে দেয়ালে হলুদ অক্ষরে আজেবাজে কথা লেখে। কই, এরা তো তা করেনি!

তাহলে কি চোর নয়?

আমার জন্যে এটা একটা কালো রাত, সন্দেহ নেই। প্রথমে পার্কের ভেতর একটা দুর্ঘটনা, তারপর রয়ের মাথায় বাড়ি দিয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টের চাবি ছিনতাই।

এক ঝটকায় বিছানার ওপর উঠে বসলাম। দুটো ঘটনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন যোগসূত্র নেই? হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল, দরজা বন্ধ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে কে যেন ঢুকতে চেষ্টা করেছিল এলিভেটরে। নতুন একটা প্রশ্ন জাগল মনে। সিডানটা ধাক্কা দেবার বেশ কয়েক মুহূর্ত পর আমার এম-জির উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচ ফেটে যায়। কেন? ভয়ের একটা শিরশিরে ভাব নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে।

আশ্বস্ত হবার জন্যে বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বাললাম। আমার শান্ত

জীবনে হঠাৎ এ কি ধরনের উপদ্রব? টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো মেলাতে চেষ্টা করলাম। বৃষ্টি মাথায় করে ঘরে ফিরেছি আমি, গোসল করেছি, গলা ভিজিয়েছি। আমার পেছনে কি মার্কিন মদ ব্যবসায়ীরা লেগেছে? আমি ব্রিটিশ জনি ওয়াকার খাই তা হয়তো তারা সহ্য করতে পারছে না! এরপর গাড়ি নিয়ে বেরুই আমি, ট্রাফিক আইনের সমস্ত নিয়ম মেনে পার্কের ভেতর ঢুকি। পার্কের মাঝামাঝি পৌঁচেছি, এই সময় প্রকাণ্ড এক সিডান, উজ্জ্বল হেডলাইট জ্বেলে হঠাৎ আমার পাশে চলে আসে, এবং আমার এম-জিকে ধাক্কা দেয়। তার একটু পরেই অসংখ্য চিড় ধরে উইন্ডস্ক্রীনে। একটা নুড়ি পাথর হতে পারে, ছুটে যাবার সময় বাড়ি খেয়েছে কাঁচে। এরপরের ঘটনাগুলো তাৎপর্যহীন। তবু পথে আর কিছু ঘটেছে কিনা স্মরণ করার চেষ্টা করলাম আমি। পার্টিতে? কার কার সাথে কথা বলেছি, তারা কে কি বলেছে আমাকে, খুঁটিয়ে রোমন্থন করলাম সব। কিন্তু সবই স্বাভাবিক আর তাৎপর্যহীন বলে মনে হলো। এরপরের ঘটনা, পার্টি থেকে ফিরে এলাম আমি। পথে কিছু ঘটেনি। গ্যারেজে এম-জি রেখে দ্রুত এলিভেটরে চড়লাম। দরজাটা বন্ধ হয়ে এসেছে, এই সময় কেউ এলিভেটরে চড়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। কেউ কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওখানে? গাড়ি থেকে এক রকম লাফ দিয়ে নেমে স্যাঁৎ করে এলিভেটরে চড়ে বসব, এটা সে আশা করেনি? লোকটার কি প্ল্যান ছিল আমার সাথেই এলিভেটরে চড়বে? তারপর কি ঘটল? ঘরে ঢুকলাম, দেখলাম···

না! ঘরে যে-ই ঢুকে থাকুক, ঘরে ঢোকার ঘটনাটা গাড়ি নিয়ে আমার ফিরে আসার আগেই ঘটে গেছে।

ভাবতে চেষ্টা করলাম, কি পাবার আশা করে এসেছিল ওরা? রয়ের মত আমিও শুনেছি, শুধু ওষুধ চুরির জন্যেও ডাক্তারদের বাড়িতে চোর ঢোকে। তাছাড়া, স্টেশনারি বা প্রেসক্রিপশন ফর্মও ডাক্তারদের বাড়ি থেকে চুরি যায়। কিন্তু এটা তো একটা অ্যাপার্টমেন্ট, ডাক্তারের বাড়ি বা চেম্বার নয়, যদিও লবিতে বোর্ডের ওপর পরিষ্কার লেখা আছে ড. জে. এডওয়ার্ডস।

ব্যাপারটাকে সাজিয়ে চিন্তা করা যাক। রয় মাথায় বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারাবার আগেই সিডানের সাথে ধাক্কা খেয়েছে এম-জি, এবং ওটার উইন্ডস্ক্রীন ফেটে গেছে। আমার অ্যাপার্টমেন্টে লোক ঢুকেছে তারপর। এরপরের ঘটনা, এলিভেটর। এসব থেকে কি বেরিয়ে আসে? পার্কে আমাকে কাবু করতে না পেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে কেউ আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকে, কিছু না পেয়ে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে নিচের গ্যারেজে, কিন্তু আমি কোন সময় না দিয়ে এলিভেটরে উঠে পড়ি বলে আমাকে ধরতে পারেনি?

দূর! দূর! ঘাবড়ে গিয়ে মাথাটা অতি কল্পনায় মেতে উঠেছে। মনে সন্দেহ নিয়ে একটার সাথে আরেকটা ঘটনার যোগসূত্র খুঁজতে গেলে একটা মানুষের জীবনের সমস্ত ঘটনা ভয়ঙ্কর কোন পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে হবে। এটা নিউ ইয়র্ক, কে আর আমার চেয়ে ভাল জানে যে বেপরোয়া গাড়ি চালকরা দুনিয়ার আর সব জায়গার চেয়ে সংখ্যায় এখানেই বেশি? আর ঘরে চোর ঢোকার কথা যদি ওঠে, কার জীবনে অন্তত একবার এই ঘটনা ঘটেনি?

আসলে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি, মনকে এই কথাটা বোঝাতেই শরীরটা বশ

মানল, ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ। চোর, সিডানের ড্রাইভার এবং অচেনা আমার সমস্ত শত্রুকে নিজগুণে ক্ষমা করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি

মাত্র তিন ঘণ্টা পর কোন কারণ ছাড়াই চট করে ভেঙে গেল ঘুমটা সাথে সাথে বিছানার ওপর সটান উঠে বসলাম। ঘুমের মধ্যে নিশ্চয়ই অঙ্ক কষছিল অবচেতন মনটা, কিন্তু দুই আর দুইয়ে চার মেলাতে পারছিল না। লাফ দিয়ে নিচে নামলাম আমি, ছুটে চলে এলাম যেখানে আমার হালকা রঙের স্যুটটা ঝুলছে। বুকলেটটা এখনও রয়েছে পকেটে, সেই দুর্বোধ্য রাশিয়ান বর্ণমালাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসল। এটা আমার হাতে যেদিন পৌছুল সেদিনই শুরু হয়ে গেল বিদঘুটে সব উপদ্রব, ব্যাপারটা কি কাকতালীয়? হতে পারে···হ্যাঁ, কিন্তু···

একটা একটা করে বুকলেটের পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম। যদি কোন ধরনের মেসেজ পেয়ে যাই এই আশায়। মার্জিনাল নোটও থাকতে পারে। কিছু একটা, যা দেখে বুঝতে পারব জিনিসটা কেন পাঠানো হয়েছে আমার কাছে। কিন্তু কিছুই পেলাম না। ডেস্কে নিয়ে এলাম ওটা। আবার পরীক্ষা করতে শুরু করলাম।

রাশিয়ার কাউকে আমি চিনি না। চিনবই বা কেন? এখনও এমন পর্যায়ে উঠিনি যে কাটাছেঁড়ায় আমি কতটা সিদ্ধহস্ত তা মস্কোয় গিয়ে দেখাবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স। এমন কি আফ্রিকা থেকে একজন কাঠ-মিস্ত্রী এলেও তার সাথে দেখা করার জন্যে আমাকে ডাকা হয় না, সে-যোগ্যতা এখনও আমি অর্জন করিনি। তাছাড়া, আমার আত্মীয় বা বন্ধুরা যে যেখানে আছে সবাই সেখানে থাকতে পেরেই খুশি, ট্যাক্স ইন্সপেক্টরদের ভয়ে এখনও তারা লৌহ-যবনিকার আড়ালে গা ঢাকা দেবার কথা ভাবছে না।

তাহলে কে আমাকে পাঠাতে পারে এটা? ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটটা উল্টে দিয়ে ড্রাগ সার্কুলারের গাদার ভেতর খুঁজতে শুরু করলাম এনভেলাপটা। কিচেনে ঢুকে সেখানেও খুঁজলাম। পরিষ্কার মনে আছে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটেই ফেলেছিলাম, তবু আরও অনেক জায়গায় খুঁজে দেখলাম। বেডরুম, আমার সব পকেট, সবগুলো দেরাজ, কিছুই বাদ দিলাম না।

এনভেলাপটা নেই।

পাঁচ

ব্যাপারটা উপলব্ধি করার পর যে অনুভূতিটা হলো সেটা মোটেও সুখপ্রদ নয় ব্যাপারটাকে কেউ যেভাবেই সেদ্ধ করুক, যেদিক থেকে খুশি তাকাক বা না তাকাবার চেষ্টা করুক, ফলাফল সেই একটাই—কোন সন্দেহ নেই, এনভেলাপটা চুরি করার জন্যেই চোর ঢুকেছিল অ্যাপার্টমেন্টে। ওটা পাবার জন্যে একজন বুড়ো মানুষকে আহত করতেও বাধেনি ওদের। বাকি ঘটনাগুলো মনে রাখলে এও বুঝতে ব্যকি থাকে না যে এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর কিছু করতেও মানসিকভাবে তৈরি হয়ে

আছে ওরা। শুধু এনভেলাপটা চুরি করার জন্যে তারা যদি সশস্ত্র ডাকাতি করতে পারে, তাহলে এনভেলাপের ভেতরের জিনিসটা হাতে পাবার জন্যে কি না করতে পারে! বুকলেটে এসব কি লেখা রয়েছে বুঝতে পারলে হত, ভাবতে ভাবতে আবার আমি ওটার পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম। প্রতিটি পাতা আলোর সামনে ধরলাম, যদি কোন চিহ্ন বা একটা দাগ আমার চোখকে এড়িয়ে গিয়ে থাকে! চিহ্ন বা দাগ নয়, একটা অসঙ্গতি চোখে পড়ল। বুকলেটের একটা পাতা নেই। শিরদাঁড়ার কাছ থেকে টেনে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে, এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে কিনারা।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন কি কেউ ঢুকেছিল অ্যাপার্টমেন্টে? তারপরই মনে পড়ল, এরই মধ্যে দরজা আর জানালা দেখে নিয়েছি আমি, সবগুলো ভেতর থেকে বন্ধ। তাছাড়া, গতরাতে রয় আমাকে দেবার পর থেকে কাগজগুলো আমার সাথেই আছে। শুধু একবার, গোসল করতে যাবার সময় ডেস্কে রেখে গিয়েছিলাম ওটা, কিন্তু তখন ওটা এনভেলাপের ভেতর ছিল। তার মানে, আমার হাতে আসার পর থেকে ওটা আর কারও হাতে পড়েনি। তাহলে ছেঁড়া পাতাটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? বুকলেটটা যারা বাইন্ডিং করেছে তাদের দোষ? অন্য সময় হলে তাই ধরে নিতাম আমি। কিন্তু এখন তা ধরে নেয়া নিরাপদ বলে মনে হলো না।

ঘুরেফিরে আবার সেই প্রশ্নগুলো ফিরে এল। পাতাটা গেল কোথায়? এনভেলাপটা গেল কোথায়? এবং দুনিয়ায় এত লোক থাকতে এই মুসিবত আমার কাছেই বা কেন পাঠানো হলো?

এ বিল্ডিঙে আর কোন এডওয়ার্ডস আছে কিনা খোঁজ নিলাম না, জানি নেই। অন্যমনস্ক ভাবে কোলের ওপর টেনে নিলাম ফোন গাইডটা। এডওয়ার্ডসদের জন্যে আলাদা করা হয়েছে অনেকগুলো পাতা, সবগুলো চেক করা কোন কালেও সম্ভব নয়। নিউ ইয়র্কে এত এডওয়ার্ডস আছে, ভাবা যায় না। জানতে ইচ্ছে করল, তারাও কি আমার মত দ্বৈত সত্তার অধিকারী, মনেপ্রাণে ডানপিটে এবং প্রকাশ্যে ভিজে বিড়াল? প্রথম এডওয়ার্ডসকে দিয়েই কাজ শুরু করে দেবার একটা ঝোঁক পেয়ে বসল আমাকে। কিন্তু সেটা আমি কাটিয়ে উঠলাম। অনেক খোঁজ করেও একটা জে. বা জন এডওয়ার্ডস পেলাম না। তবে, খানিক পরই পেয়ে গেলাম একজন প্রফেসর এডওয়ার্ডসকে। ভদ্রলোক ব্রংক্স-এ থাকেন।

সাড়ে সাতটায় ফোন করলাম ভদ্রলোকের নাম্বারে। রিসিভার তুলল একজন ও'হারা, জানাল, 'প্রফেসর এডওয়ার্ডস আজ আট মাস হলো মারা গেছেন।'

গাইডের সবগুলো পাতা উল্টেও নিউ ইয়র্কে আর একজন প্রফেসর এডওয়ার্ডস পেলাম না। এনভেলাপে আর যেন কি লেখা ছিল, নামের পরে? মনে পড়ল—ফ্যাগস. এফ. এ. জি. এস.। ধরে নেয়া যেতে পারে, বুকলেটটা পাঠানো হয়েছে ভূগোলের একজন অধ্যাপককে। তাঁর ঠিকানা হয়তো পঁচাত্তর পুব ষাট নম্বর স্ট্রীট বা আর কিছু। এ-ধরনের ঠিকানা টাইপ করার সময় ভুলভাল হতেই পারে। এই সময় আরও একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়। বেচারা প্রফেসরের ফোন নাম্বার হয়তো গাইডে নেই, আনলিস্টেড। ডায়াল ঘুরিয়ে ইনফরমেশনের সাথে যোগাযোগ চাইলাম গাইডে না থাকলে নাম্বারটা আমাকে ওরা দেবে না, কিন্তু

প্রফেসর এডওয়ার্ডসের অস্তিত্ব আছে কিনা সেটা জানা যাবে।

ইনফরমেশনে যে মেয়েগুলো ডিউটি দেয় ওদেরকে আমার বরাবরই খুব ভাল লাগে। বিনয়ী, চটপটে। বেশিরভাগ সময়ই সমাধান দিতে পারে। কিন্তু আমি যা জানতে চাইছি সাধারণত তা ওদের কাছে জানতে চাওয়া হয় না।

'মে আই হেলপ্, প্লীজ?'

বলতে গিয়ে বুঝলাম, প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবু আমাকে দমানো গেল না। 'নিউ ইয়র্ক টেলিফোন এলাকায় কোন প্রফেসর এডওয়ার্ডস থাকেন কিনা জানতে চাইছি আমি।'

'ইয়েস, স্যার। প্রথম নাম বা ইনিশিয়ালটা বলুন, প্লীজ।'

'এ···মানে··· ঠিক জানা নেই।'

'ভদ্রলোকের ঠিকানাটা বলতে পারেন, স্যার?'

'দুঃখিত।'

কয়েক মুহূর্ত ফিসফাস আওয়াজ পেলাম লাইনে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেও হতে পারে, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। 'এডওয়ার্ডস?' বোঝা গেল, মেয়েটা ভাবছে শুনতে ভুল হয়ে থাকতে পারে তার

'প্রফেসর এডওয়ার্ডস।'

'খানিক পর আপনাকে আমি ফোন করব, স্যার।'

'ভদ্রলোক নিউ ইয়র্ক স্টেট বা নিউ জার্সিতে থাকতে পারেন।' মেয়েটাকে আমার নাম্বার দিয়ে ক্রাডলে রেখে দিলাম রিসিভার। হঠাৎ করে কফির তৃষ্ণায় কণ্ঠনালী মরুভূমির মত শুকিয়ে উঠল। কিচেনে ঢুকে তাড়াহুড়ো করে বানিয়ে ফেললাম এক কাপ। প্রথম চুমুক দিয়ে জিভ পুড়িয়েছি, এই সময় ফোন বাজল। প্রথম-বেল থামার আগেই আমার হাতে উঠে এল রিসিভার।

মেয়েটা বলল, 'ভদ্রলোক সম্পর্কে আর কিছু জানেন না আপনি, স্যার? তিনি কোথায় প্রফেসর, কিসের প্রফেসর এই রকম কিছু?'

'তিনি একজন ফ্যাগস।'

'মানে?' দ্রুত জানতে চাইল। শব্দটা যে অশ্লীল কিছু নয়, সেটা বোধহয় পরিষ্কার করে বুঝতে চাইল সে।

'ভদ্রলোকের নামের পর চারটে অক্ষর আছে, প্রতিটা ক্যাপিট্যাল লেটার। এফ.এ. জি.এস.।'

'নামের পরে? আগে নয়?'

'দুঃখিত। আগে নয়।'

'প্রফেসর এডওয়ার্ডস মাত্র একজনই আছেন, স্যার। নিউ ইয়র্কের ব্রংক্স-এ থাকেন···'

'জানি। বেঁচে নেই। ওই নাম্বারে এখন এক ও'হারা থাকে

রিসিভার ধরে রেখে ঘামছে মেয়েটা, চোখ বুজে দেখতে পেলাম দৃশ্যটা আমাকে সাহায্য করার জন্যে উদগ্রীব আহা বেচারী! মেয়েটার জন্যে আমার সহানুভূতি হলো।

বললাম, 'ভাবছি···

'ইয়েস, স্যার?' কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে।

কি ভাবছিলাম তা আর বলতে ইচ্ছে করল না। নিশ্চয়ই এরই মধ্যে মেয়েটা আমাকে ছাগল ভাবতে শুরু করেছে। আমি চাই না এরপর সে আমাকে পাগল ছাগল ভেবে···

অপরপ্রান্ত থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ পেলাম। 'আসলে, স্যার, ইনিশিয়াল বা ডিস্ট্রিক্ট ছাড়া কাজটা অত্যন্ত কঠিন।'

'জানি। দুঃখিত।'

'আবার আমি যোগাযোগ করব।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিজের চিন্তা আর কফির কাপে ফিরে এলাম। অন্যমনস্ক ভাবে অন করলাম রেডিওটা। খবর আর আবহাওয়া জানা দরকার। গতরাতে নিউ ইয়র্কে দুটো খুন হয়েছে। গড়পড়তা তাই হয়। একটা আফ্রিকান দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। গালফ অভ মেক্সিকোয় ভেঙে গেছে একটা ট্যাংকার। অকস্মাৎ আমার বোধোদয় হলো—আমার সমস্যাটা কত ছোট! কত নগণ্য! কিন্তু ছোট হলে কি হবে, আমার জন্যে এটা জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে!

কফি শেষ করে পুলিস স্টেশনে ফোন করলাম।

'ঠিকানা?'

দিলাম।

'দামী কিছু খোয়া গেছে?'

কি উত্তর দেব? আমার নিজের কিছু খোয়া যায়নি। কিন্তু এনভেলাপটা আমার না হলেও, আমার ঘর থেকে চুরি গেছে। পুলিস জানতে চাইছে দামী কিনা? কারও কাছে নিশ্চয়ই দামী, কিন্তু কেন দামী তা বোঝার ক্ষমতা আমারই হচ্ছে না, একজন পুলিস অফিসারকে বোঝাব কিভাবে? কিন্তু পুলিসের কাছে মিথ্যে বলি কিভাবে? 'যতদূর বুঝতে পারছি, একটা এনভেলাপ চুরি গেছে।'

'ভেতরে কিছু ছিল?'

'না,' খানিক ইতস্তত করে বললাম, 'ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ছিল ওটা।'

'শুধু একটা ছেঁড়া এনভেলাপ? হাঃ, হাঃ···আর কিছু না?'

আর সব কথা কিভাবে বলি তাকে? গাড়ির কথাটা বলব? কিন্তু আমাকে যদি বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালাবার দায়ে, বা কার অ্যাক্সিডেন্ট গোপন করার অভিযোগে অ্যারেস্ট করতে চায়? ভাঙা উইন্ডস্ক্রীন দেখলে কোর্টের জজও ধরে নেবেন দুর্ঘটনাটার জন্যে আমিই দায়ী।

'বিল্ডিঙের গার্ডের মাথায় বাড়ি মারা হয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ, শুনেছি। ঘাবড়াবার কিছু নেই। হামেশা ঘটছে।'

'কিন্তু···'

'আবার কিন্তু কি? রিপোর্ট লিখে রাখা হলো। আবার যদি কিছু ঘটে, সাথে সাথে জানাবেন।'

কেমন যেন অসহায় বোধ করতে শুরু করলাম। ইনফরমেশনের মেয়েটা বোধহয় আরও দেরি করবে, কাজেই বাথরূমে ঢুকে শাওয়ার সারলাম, দাড়ি

কামালাম, কাপড় পরলাম। এটা-সেটা ভাবছি, কিন্তু কোথাও পৌঁছুতে পারছি না চুপচাপ অপেক্ষা করতে কারই বা ভাল লাগে, অগত্যা পায়চারি করতে শুরু করলাম। এর প্রায় আরও আধ ঘণ্টা পর ফোন করল মেয়েটা।

'একজন প্রফেসর এডওয়ার্ডসকে পেয়েছি, স্যার,' জয়ের আনন্দ প্রকাশ পেল মেয়েটার গলায়।

'ওয়ান্ডারফুল! কোথায়?'

'রচেস্টর, নিউ ইয়র্ক, স্যার। প্রফেসর ফ্রান্সিস জেভিয়েরে এডওয়ার্ডস, ডি. ডি. সেন্ট স্যাভিয়র'স সেমেনারি।'

নিরাশায় ছেয়ে গেল মনটা। 'এই একজনই?'

'নিউ ইয়র্ক আর নিউ জার্সিতে এই একজনই, স্যার। নাম্বারটা নোট করবেন, স্যার?'

মেয়েটাকে নিরাশ করতে চাই না বলে তাকে আর না বলতে পারলাম না। নাম্বারটা টুকলাম অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে প্রথমে রিসিভার নামালাম, তারপর নোট প্যাডের ওপরের কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে।

আমি যেন খুব চিন্তিত, এই রকম ভান করে পায়চারি শুরু করলাম। আসলে দরজা পেরিয়ে আমার বাইরে বেরুনোটাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। যদিও এই ঘর, নাকি ঘরের বাইরেটা, কোন্‌টা আমার জন্যে নিরাপদ তা ঠিক বুঝতে পারছি না। বেশ অনেকক্ষণ দরজাটাকে এড়িয়ে যেতে পারলাম। এর মধ্যে কিচেনে ঢুকে নাস্তা তৈরি করেছি, কিন্তু অনেক সাধ্য-সাধনা করেও খিদেটাকে জাগাতে পারলাম না। আবার এক কাপ কফি খেলাম। ভাবছি, এরপর কি করা উচিত। দরজা পেরোবার ভয় কাটিয়ে উঠে ঠিক করলাম, বাইরে বেরুতে হবে আমাকে।

ঘরের চারদিকে তাকালাম। একটু সাহস দেবে এমন একটা কিছু থাকা দরকার হাতে। আধুনিক একটা অ্যাপার্টমেন্টে সে-ধরনের কিছু থাকে না বললেই চলে। কিন্তু ছায়াছবিতে দেখা যায়, প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে কিছু না কিছু একটা ঠিকই পেয়ে যায় ওরা। পাঁচিল থেকে শটগান নামায় চাষী। গ্যারেজের লোকেরা লম্বা স্প্যানার তুলে রুখে দাঁড়ায়। পরিবার প্রধান বন বন করে হকিস্টিক ঘোরায়। আমার কপালে কিছুই জুটল না। প্রচুর টাই, টেবিল ন্যাপকিন, উড়েন স্পুন এবং টেবিল ল্যাম্প, আর কিছু না। অগত্যা রেন কোট আর গাড়ির ড্রাইভিং সীটে ফেলার জন্যে একটা ছোট কুশন নিয়ে বেরুতে হলো আমাকে।

চেন আর বোল্ট জোড়া খোলার সময় একাধারে নার্ভাস এবং বোকা লাগল নিজেকে। প্রথমে সামান্য একটু ফাঁক করলাম দরজা, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, কেউ ধাক্কা দিয়ে আমার কপালে ঠুকে দেবে কবাট। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। হলওয়েতে বেরিয়ে এসে দেখি থাকার মধ্যে শুধু এলিজা আছে, ক্লিনার, ওদিকের অ্যাপার্টমেন্টের সামনের মেঝে ঘষেমেজে আয়নার মত চকচকে করছে। সঙ্গত কারণেই আজ ওকে দেখে ঈর্ষা হলো আমার। কাজের ভেতর কি সুন্দর নিরুদ্বিগ্ন সময়টা কাটাচ্ছে। বুঝতে না পেরে বেকুব হয়ে গেছে এমন ঘটনা কি ঘটেছে কখনও ওর জীবনে? থাক, কৌতূহল জ্যান্ত থাকলে পরে জেনে নেয়া যাবে। দরজা বন্ধ করে সতর্কতার সাথে এগোলাম। এলিভেটরে ঢুকে দুরু দুরু বুকে টিপে দিলাম

বোতাম। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। দ্রুত, নিঃশব্দে নিচে নামতে শুরু করল এলিভেটর। দুই ফ্লোর নেমে একটা প্রৌঢ় দম্পতিকে তোলার জন্যে থামল একবার। এরপর সোজা নেমে এল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। দরজা খুলে যেতেই হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেল ওরা ওদেরকে আমার সাথে বেসমেন্টে নামতে বলার ইচ্ছে থাকলেও, কমনসেন্স এবং ভদ্রতায় বাধল। গ্যারেজ লেখা বোতামে আঙুলের চাপ দিলাম আমি।

একটু পরই সামান্য একটু ঝাঁকি খেল এলিভেটর; আবার খুলে যেতে শুরু করল দরজা। না বেরিয়ে, গাড়িগুলোর দিকে তাকালাম। কিছুই নড়ছে না। তারপর ঘন ঘন ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে একরকম ছুটেই বেরিয়ে এলাম এলিভেটর থেকে। মাত্র পাঁচ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার এম-জি, আশপাশে কোথাও কাউকে দেখলাম না। গভীর একটা শ্বাস টেনে গাড়ির দরজা খুলে সীটের ওপর ফেললাম কুশনটা, বসে পড়লাম সেটার ওপর। আমাকে চমকে দিয়ে মৃদু শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা। সাংঘাতিক একা লাগল নিজেকে।

উইন্ডস্ক্রীনের গর্ত দিয়ে বাইরে তাকালাম। কেউ নেই। কিছু নড়ছে না। পাশের জানালা দিয়ে ডান বাঁ দুটো দিকেই চোখ বুলিয়ে নিলাম। একটা বিড়ালের ছায়া পর্যন্ত নেই। পিছনটা দেখার জন্যে তাকালাম রিয়ার-ভিউ মিররে। চোখাচোখি হলো নিজের সাথে। একটা এম-জিতে ঢোকা বা বেরুনো সহজ কাজ নয়, কিন্তু অনেকদিনের অভ্যেস বশে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজগুলো সারতে পারি আমি। বিশেষ করে লক্ষ রাখি, ধাক্কা লেগে যেন সরে না যায় আয়নাটা। কাজটা তাহলে কার? হাত বাড়িয়ে অ্যাডজাস্ট করছি ওটা, এই সময় আয়নায় দেখতে পেলাম সেটা। ধক্ করে উঠল বুক। রুফ লাইনিঙে কিসের গর্ত ওটা?

বড় কিছু নয়। চার কি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। বোকার মত তাকিয়ে আছি, অনুভব করছি শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসছে ঠাণ্ডা হিম একটু অনুভূতি। আমার প্রথম ধারণাটা ভুল ছিল, বুঝতে অসুবিধে হলো না। উইন্ডস্ক্রীনে নুড়ি পাথর নয়, বুলেট লেগেছিল। স্ক্রীন ফুটো করে ভেতরে ঢোকে সেটা, রুফ লাইনিং চিরে দেয়। তারপর হয়তো মেটাল ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

সামনেটা আরও ভাল করে দেখতে পাবার জন্যে তালুর ধাক্কায় ফেলে দিতে শুরু করলাম স্ক্রীনের বাকি কাঁচ। সেই সাথে দৃষ্টিগোচর হলো উইং মিরর। আয়নায় চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম লোকটাকে। পঁচিশ কি ত্রিশ গজ দূরে, গ্যারেজের আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বুইক, ড্রাইভিং সীটে বসে আছে লোকটা। ইঞ্জিন চালু কিনা বোঝা গেল না কিন্তু লোকটা কি করছে বোঝা গেল পরিষ্কার—সরাসরি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার দিকে একটা চোখ রেখে কাঁচ ফেলার কাজ চালিয়ে গেলাম। এক চুল নড়ল না লোকটা।

রিয়ার-ভিউ মিররটা আবার অ্যাডজাস্ট করলাম, তাকে যাতে আরও পরিষ্কার দেখতে পাই। চোখের পাতা হয়তো পড়ছে, কিন্তু নড়তে চড়তে দেখলাম না। এম-জির দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে, ত্রিশ গজ দূর থেকে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, রাতে কেউ আমার গাড়িতে ঢুকেছিল।

গাড়ির চাবি আমার বাঁ হাতে রয়েছে, সেটা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকালাম

ইগনিশন সুইচের দিকে ছায়াছবিতে দেখেছি, গাড়িতে উঠে বসল একজন লোক, সুইচ অন করল···বুম! খবরের কাগজেও পড়েছি মাফিয়ারা এই পদ্ধতিতে কাজ সারে। কিন্তু আমি, একজন নিরীহ ডাক্তার, সেই পদ্ধতির শিকার হব কেন? ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝিম ঝিম করতে শুরু করল আমার। বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে আমাকে, ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু সত্যি তা হবে কিনা জানার জন্যে সুইচ অন করব, অত বোকা আমি নই।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে আছে, সিগন্যাল দেখে বুঝলাম ওটা এখন ছ'তলায়। এখন যদি ওটা নিচে থাকত, ছুটে গিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারতাম আমি। কিন্তু কেউ বোতাম না টিপলে ওটা নিচে নামবে না। আর কাজটা করার জন্যে আমি ছাড়া নেই-ও কেউ।

শান্ত ভাবে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। পকেটগুলো এমন ভঙ্গিতে হাতড়াতে শুরু করলাম, কি যেন হারিয়ে ফেলেছি। মনে মনে প্রার্থনা করছি, আচরণটা যেন নিখুঁত, বিশ্বাস্য হয়। অবশেষে, যেন সাংঘাতিক বিরক্ত হয়েছি নিজের ওপর, এই রকম একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্যে নিজের কোমরে চাপড় দিলাম কষে, মুখ বেজার করে এগোলাম এলিভেটরের দিকে। বোতাম টিপে দিয়ে অপেক্ষা করছি। চোখের কোণ দিয়ে দেখি, খুলে গেল বুইকের দরজা। বেরিয়ে আসতে শুরু করল লোকটা। পিঠে ঘামের ধারা আগেই অনুভব করেছি, এখন ধড়াস ধড়াস করে লাফাতে শুরু করল বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড। ডানপিটে সত্তাটাকে জাগাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। অত্যন্ত অপমানজনক ভাবে নিজের কাছে স্বীকার করলাম, আমি আসলে কোনকালেও দুঃসাহসী ছিলাম না। ভয় হলো, যা ভয় পেয়েছি, কেঁদে না ফেলি শেষে!

লোকটা যে তাড়াহুড়ো করে এগোল, তা নয়। ওরও ভয় আছে, তাড়াহুড়ো করতে দেখলে আমি ছুটে পালাবার চেষ্টা করব। পালাতে পারি বা না পারি, ছুটোছুটি তো করবই। সেই সাথে চিৎকার—হেলপ্! হেলপ্! আশপাশে লোকজন দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এসে পড়তে কতক্ষণ। কাজেই ঝুঁকিটা না নিয়ে ধীরস্থির ভাবে; নিঃশব্দ পায়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসতে শুরু করল সে। চট্ করে একবার ইন্ডিকেটরের দিকে তাকালাম। নামতে শুরু করেছে এলিভেটর বোতামটায় আরেকবার চাপ দিলাম, এলিভেটরের ইলেকট্রনিক মন বদলে গিয়ে যাতে আবার ওপর দিকে উঠতে শুরু না করে দেয়। পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। গ্রাউন্ড ফ্লোরে থেমে গেছে এলিভেটর। নিশ্চয়ই কেউ নামছে। কিন্তু আমার ঠিক এই বিপদের সময় গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে কেউ যদি চড়ে, এবং ওপরে উঠতে চায়, তাহলেই সর্বনাশ!

লোকটা এখন আমার কাছ থেকে দশ গজ দূরেও নেই একটা কংক্রিট পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আড়চোখে তাকাতেই দেখি, আবার নামতে শুরু করেছে এলিভেটর। কিন্তু ভেতরে ঢুকব কিভাবে? আমি ঢোকার আগেই বা সাথে সাথে মাঝখানের দূরত্ব ছুটে পেরিয়ে আসবে লোকটা। কি করি! কি করি!

বিপদের মুখে পড়লে মানুষের নাকি বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায়, কিন্তু আমার বেলায় উল্টোটা ঘটল। রেনকোটের পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করলাম, মাথার

ওপর শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম সেটা, তারপর লুফে নিলাম খপ্ করে, ভাবটা যেন এইমাত্র খুঁজে পেয়েছি। ঘুরে দাঁড়ালাম। এগোলাম এম-জির দিকে। বুঝতে পারছি, সম্পূর্ণ শান্ত আর স্বাভাবিক দেখাচ্ছে আমাকে। কান খাড়া ছিল, পিছনে দরজা খুলে যাবার মৃদু শব্দ হলো। ইতিমধ্যে দু'পা এগিয়েছি আমি, শব্দটা কানে ঢোকার পর আরও দু'পা এগোলাম এম-জির দিকে এই সময় আবার শব্দ। বুঝলাম, দরজাটা এবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটলাম। কিন্তু আমার সাথে ছুটতে শুরু করল লোকটাও। একটা ছুরি দেখলাম তার হাতে।

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা সামনে আমার দুটো কাজ। ভেতরে ঢুকে বোতাম চাপ দিতে হবে। তারপর লক্ষ্য রাখতে হবে লোকটা যেন দরজার লিডিং এজের অ্যান্টি-ট্র্যাপ মেকানিজমে কিছু সেঁধিয়ে না দিতে পারে। অবশ্য কাজ দুটো করার প্রশ্ন তখনই উঠবে, আমি যদি একা ঢুকতে পারি এলিভেটরে।

লোকটা বোধহয় টের পেল, অন্তত এক সেকেন্ড আগে হলেও আমিই প্রথমে ঢুকব এলিভেটরে। বাগিয়ে ধরা ছুরিটা কানের পাশে তুলল সে, যেন ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছে। জান বাঁচানো ফরজ হয়ে দেখা দিলে অস্ত্র হিসেবে মানুষ কি-না ব্যবহার করতে চায়! আর কিছু যখন নেই, হাতে ভাঁজ করে রাখা রেনকোটটাই ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে। সুফল দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। লোকটা যেন স্রেফ একটা পাঁচিলের সাথে ধাক্কা খেল। রেনকোটটা তার মুখের ওপর মুখোশের মত লেপ্টে গেল। নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ায় গুঙিয়ে উঠল সে। ইতিমধ্যে এলিভেটরে ঢুকে গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে দিয়েছি আমি।

রেনকোটটা এক কি দু'সেকেন্ড দেরি করিয়ে দিল লোকটাকে। দরজাটা সম্পূর্ণ বন্ধ হতে আর যখন মাত্র ইঞ্চিখানেক বাকি, ফাঁকের ভেতর হাতটা গলিয়ে দেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে এক চুলের জন্যে তার উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। দরজার লিডিং এজ পরস্পরকে চুমু খাচ্ছে দেখে আমারও ইচ্ছে হলো ওদেরকে আদর করি।

একটু পরই আবার খুলতে শুরু করল দরজা। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেই গ্রাউন্ড ফ্লোরের লবি ধরে ছুটলাম। জানি, আমার হাতে সময় খুব কম। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফায়ার এস্কেপ অথবা সার্ভিস স্টেয়ারের দিকে ছুটতে শুরু করেছে মি. বুইক। যেভাবেই হোক, এই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে।

নির্জন লবি। বুড়ো রয়কে দেখলাম না। হাঁপাতে হাঁপাতে লবি থেকে পাশের করিডরে বেরিয়ে এলাম শেষ মাথায় জ্যানিটরের স্টোররুম দরজাটা কখনও তালা বন্ধ অবস্থায় দেখিনি। দরজার ঠিক উল্টো দিকে একটা জানালা আছে, যেটা দিয়ে বিল্ডিঙের পিছনে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকে তালা দেয়া যায় কিনা জানা নেই আমার

যায় না। তালা আছে, কিন্তু চাবি নেই। আস্তে দরজা বন্ধ করে জানালার সামনে চলে এলাম। মনটা দমে গেল। পুরানো, লোহার ফ্রেম দিয়ে তৈরি, বোধহয় গত একযুগ এর গায়ে হাত পড়েনি কবাটের গায়ে ছোট ছোট লোহার চৌকো ফ্রেম, সেগুলোর মাঝখানে কাঁচ মাথা তো দূরের কথা, মুঠো করা একটা হাতও

গলবে না। হাতলটা ধরে নিচের দিকে নামাতে চেষ্টা করলাম। এর চেয়ে বেশি জোর নেই আমার গায়ে। একচুল নড়ল না হাতল। মনে পড়ল মানুষের অসাধ্য কিছু নেই, একবার না পারিলে দেখো শতবার। হাতলটা ঘোরাবার, নোয়াবার, নামাবার, তোলার—কোন চেষ্টাই বাদ দিলাম না। নিষ্ফল। মরিয়া হয়ে ছোট স্টোররুমের চারদিকে তাকালাম। যে-কোন মুহূর্তে দরজাটা খুলে যেতে পারে, ছুরি হাতে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে মি. বুইক। ভাগ্যের ক্ষীণ সমর্থন না থাকলে আপদ-বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন—দেখি কি, ঘরের এককোণে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে যন্ত্রপাতির একটা ব্যাগ। ওপরতলার মত বসবাসযোগ্য অ্যাপার্টমেন্ট নয়, এটা কাজের জায়গা, এ-ধরনের একটা ব্যাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। ব্যাগে হাত ভরে যেটা প্রথমে আঙুলে ঠেকল সেটাই বের করে নিলাম। একটা হাতুড়ি, সেটা ধরার জন্যে কাপড়ের একটা লম্বা প্যাডও রয়েছে, হাতলের সাথে লম্বা সুতো দিয়ে বাঁধা। একটু ভরসা পেলাম। এখন আর আমাকে নিরস্ত্র বলা যাবে না। লোকটা ঘরে ঢুকলে প্যাড ছুঁড়ে বিরক্ত করতে পারব, সে যখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে, অনায়াসে দুম করে তার বুকে বসিয়ে দিতে পারব হাতুড়ির এক ঘা। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত অন্য কাজ আছে হাতুড়ির।

লোহার হাতলে হাতুড়ির বাড়ি পড়লে বেজায় আওয়াজ হবে, এই মুহূর্তে বুইক হয়তো হলে দাঁড়িয়ে আছে, ছুটে আসতে বিশ সেকেন্ডও লাগবে না তার। কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই। প্রচণ্ড এক ঘা বসিয়ে দিলাম। কাজ হলো না। আবার, আবার, আবার আঘাত করলাম। জানালাটা যেখানে ফ্রেমের সাথে জোড়া লেগেছে সেখান থেকে খানিকটা শুকনো রঙ ছুটে গেল। আরও দু'বার ঘা দিলাম হাতলে। নত হলো এবার। কবাট দুটো খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে হলো রঙ শুকিয়ে গিয়ে শক্তভাবে আটকে রেখেছে। ফ্রেমের ওপর দমাদম ঘা দিতে শুরু করলাম। হঠাৎ দেখি, ইঞ্চিখানেক নড়ল। আর মাত্র গোটা দুয়েক বাড়ি দিতেই তেলহীন কব্জা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠে ঢিল করে দিল কবাট দুটোকে। দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ঘর্মাক্ত কলেবরে, হাঁপাতে হাঁপাতে চৌকাঠ পেরোল বুইক। বাঁ হাত দিয়ে সুতোর ডগায় বাঁধা প্যাডটা ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে। হাত-ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল সে। আক্রোশে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, তার ভোগান্তির জন্যে আমিই যেন দায়ী। ঠোঁট জোড়া ফাঁক আর সরু হয়ে আছে। ডান হাতে ধরা ইস্পাতের ফলাটা চকচক করছে। পায়ের পিছন দিয়ে কবাটে ধাক্কা দিল সে, তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

আবার প্যাডটা ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে। এবারও ঝাপটা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল সে। তারপর একটু সামনে বাড়ল। লক্ষ করলাম, প্যাডটা তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যতবার আমার চোখে তাকাচ্ছে ততবার আমার বাঁ হাতের দিকেও তাকাচ্ছে। ছুরিটা ধরে আছে পাকা পেশাদারের ভঙ্গিতে। ডগাটা সামনের দিকে, ফলার ধারাল দিকটা ওপর দিকে, সোজা রাখার জন্যে বুড়ো আঙুলটা ফেলে রেখেছে সেটার ওপর। বুঝলাম, দেরি করা বোকামি হয়ে যাবে যাই ঘটুক, তাড়াতাড়ি ঘটে যাওয়া ভাল। সাহসের সাথে রুখে দাঁড়িয়েছি, আমার জন্যে সেটাই যথেষ্ট। আতঙ্ক কখন কাবু করে ফেলে, তার কোন ঠিক নেই। তখন

যদি ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে প্রাণ ভিক্ষা চাই, আমি অন্তত আশ্চর্য হব না।

আবার তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম প্যাড। তার আগে ছোট্ট একটা লাফও দিলাম। প্যাডের দিকেই লক্ষ ছিল তার, কাজেই আমার ডান হাতের বিদ্যুৎগতি তার চোখে পড়ল না প্যাডের ছোবল থেকে বাঁচার জন্যে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিল সে। এই সময় তার বুকে দুম করে বসিয়ে দিলাম হাতুড়ি। তারপর কি হলো দেখার জন্যে আমি আর দাঁড়াইনি। ঘুরেই লাফ দিলাম জানালা লক্ষ্য করে। তবে গুঙিয়ে ওঠার শব্দ ঠিকই শুনতে পেলাম।

জানালার সরু কার্নিসটা মেঝে থেকে কম করেও চার ফিট উঁচুতে, তবে প্রথমবারের চেষ্টাতেই সেটার ওপর উঠে বসতে পারলাম আমি। বসেই ঘুরিয়ে নিলাম শরীরটাকে। দেখি, মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে বুইক, এক হাত দিয়ে খামচে ধরে আছে শার্টসহ বুকের মাংস। ভাঁজ করা হাঁটু দুটো বুকের কাছে তুলে নিয়ে এলাম, তারপর ঝেড়ে জোড়া লাথি চালালাম লোকটার মুখ লক্ষ্য করে। হরে দরে সমান হয়ে গেল ব্যাপারটা। জোড়া পা তার মুখেই লাগল, কিন্তু তার ছুরির কোপটাও লাগল আমার হাঁটুর উল্টোদিকে। সেখানের নরম মাংস থেকে একেবারে গোড়ালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল শিরশিরে একটা অনুভূতি।

আঘাতটা পরীক্ষা করার সময় নেই, জানালার ওপর ঘুরে বসেই এদিক ওদিক না তাকিয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়লাম। মাত্র পাঁচ ফিট নিচে মেঝে, কিন্তু পড়লাম যেন আকাশ থেকে—ধপাস করে যে আওয়াজটা হলো তাতেই আমার জ্ঞান হারাবার অবস্থা। হাঁসফাঁস করতে করতে উঠে দাঁড়ালাম। টের পেলাম, পায়ের নরম মাংস থেকে কলকল করে রক্ত গড়াচ্ছে। ক্ষতটা গভীর নয়, এই বলে অভয় দিলাম নিজেকে। সরু গলি ধরে ছুটতে শুরু করলাম এবার। একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এলাম বড় রাস্তায়। বেশ বেলা হয়েছে, কাজেই রাস্তায় তো লোকজন থাকবেই। তারা সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। সামনের লোকগুলো দেখামাত্র অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রতিটি লোককে পাশ কাটাবার জন্যে ঘুরপথ ধরতে হলে প্রচুর সময় বেরিয়ে যাবে, তাই মাথা-কাঁধ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ফুটবল খেলোয়াড়ের মত ছুটলাম। পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু এতক্ষণে পায়ের পিছন দিকটা ব্যথা করতে শুরু করেছে, দপ দপ করছে ক্ষতটা। বুইকের কাজটা কত সহজ ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলাম আমি। তাকে শুধু রক্তের একটা দাগ অনুসরণ করতে হবে। এই সময় হলুদ রঙের একটা আশার আলো দেখতে পেলাম। এইমাত্র আরোহী নামিয়ে ভাড়া গুণে নিল ট্যাক্সির ড্রাইভার। কাছে গিয়ে পৌঁচেছি, এই সময় গাড়ি ছেড়ে দিল সে। দরজা খুলে ধপাস করে পড়লাম সীটের ওপর। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ড্রাইভার।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'যেখানে খুশি! স্রেফ চালিয়ে যাও!'

কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি। ড্রাইভারও নড়ল না। 'খুব ব্যস্ত, স্যার?'

'মাইলে পাঁচ ডলার,' চিৎকার করে বললাম। 'ট্যাক্সি ছাড়ো!'

'ই-ই-য়েস, স্যার!'

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে ট্রাফিকের মিছিলে যোগ দিল ট্যাক্সি। সীটের ওপর ঘুরে

বসে পিছনের জানালা দিয়ে তাকালাম। মনে হলো চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে কাকে যেন ছুটতে দেখলাম।

'জোরে, আরও জোরে!'

বাঁক নিয়ে পার্ক এভিনিউয়ে বেরিয়ে এল ট্যাক্সি, ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ছুটে চলল দক্ষিণ দিকে। স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে সীটে হেলান দিয়ে বসলাম। কিন্তু পায়ে খচ্ করে একটা ব্যথা লাগতে নিজের অজান্তেই আবার সিধে হয়ে গেল শিরদাঁড়া। ট্রাউজারের পায়া এরই মধ্যে রক্তে ভিজে গেছে, সাবধানে হাঁটুর দিকে তুললাম সেটা। হাঁটুর উল্টোদিকে, এবং খানিকটা নিচে, নরম মাংসের ওপর চার ইঞ্চি লম্বা একটা ক্ষত। সড় সড় করে এখনও বেরিয়ে আসছে রক্ত। ভাল ভাবে লক্ষ করে দেখলাম, না, পাম্প করলে যেভাবে বেরিয়ে আসে সেভাবে নয়, ধীর গতিতে গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে। কোন শিরা ছেঁড়েনি, এইটুকুই আনন্দের কথা। কিন্তু তবু, এখুনি সেলাই দরকার। যেভাবে রক্ত গড়াচ্ছে, খানিকপর ফুয়েলের অভাবে অচল হয়ে পড়তে পারে জন এডওয়ার্ডস নামের মেশিনটা। বিয়াল্লিশ নম্বর স্ট্রীটে গ্র্যান্ড সেন্ট্রালে আছে ওষুধের দোকান। ওদিকে যেতে বললাম ড্রাইভারকে। খানিকপর দোকানের সামনে থামল ট্যাক্সি। নেমে গেলাম আমি। একটা ড্রেসিং, কিছু টেপ, একটা সার্জিক্যাল নীড্‌ল্, আর খানিকটা স্টেরিলাইজড থ্রেড কিনে ফিরে এলাম আবার।

'এবার তুমি খুব আস্তে আস্তে চালাবে,' ড্রাইভারকে বললাম, 'সুঁই-সুতো দিয়ে কিছু নকশা তৈরি করব।'

সীটের ওপর ঘুরে বসে আমার দিকে তাকাল ড্রাইভার। 'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল সে।

'তোমার নয়,' বললাম। 'তোমার কাজ তুমি করো।'

ভুরু কুঁচকে চেহারায় সন্দেহ ফুটিয়ে তুলল সে। 'কিন্তু স্যার, আপনার এই অবস্থা দেখে আমি তো...'

পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে তার পাশে সীটের ওপর ফেললাম। 'আমার নাম জন এডওয়ার্ডস। আমি একজন ডাক্তার। ছোটখাট একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম।'

'আচ্ছা?' আমার কথা বিশ্বাস করেনি লোকটা।

'ওয়ালেটের ভেতর আমার আইডেনটিটি কার্ড আছে।' সেটা দেখল কি দেখল না তা জানার জন্যে আমি আর অপেক্ষা না করে নিজের কাজ শুরু করলাম। কাপড় আর মাংস সেলাই, দুটোর মধ্যে ফারাক আছে, কাজেই আমি যে ব্যথা পাব আর ব্যথা পেয়ে উহ্ আহ্ করব সে তো জানা কথা। কিন্তু ড্রাইভার লোকটার মধ্যে আমার জন্যে কোনরকম সহানুভূতি দেখা গেল না। শব্দ শুনে বুঝলাম ওয়ালেট খুলেছে সে, ভেতরের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে।

খানিক পর আমার পাশে সীটের ওপর পড়ল ওয়ালেট। 'কিছু মনে করবেন না, ডাক্তার সাহেব, কিন্তু এই অবস্থা আপনার হলো কিভাবে?'

'বেশি কথা বলার পরিণাম এই-ই হয়,' হুমকি দেবার সুরে বললাম।

বিপদ সঙ্কেতটা ঠিকই টের পেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল, 'কোথায় যাবেন আপনি?'

দিল ফ্যাসাদে ফেলে! কোথায় যাব, জানি আমি? অ্যাপার্টমেন্টে ফিরব না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুকলেটের কথা মনে পড়তে হাত দিয়ে স্পর্শ করে পকেটে ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিলাম। আমার পরবর্তী কাজ হওয়া উচিত এই বুকলেটটার রহস্য উদ্ঘাটন করা। জিনিসটা আসলে কি? এই প্রশ্নের উত্তর পেলে হয়তো অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। হঠাৎ মনে হলো, প্রতি মাইল পাঁচ ডলার খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে।

'হার্জ স্টেশনে নিয়ে চলো আমাকে,' বললাম আমি। 'আর, ফালতু কোন কথা নয়। আমি কাপড় সেলাই করছি না।'

'ইয়েস, স্যার!' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বোবা বনে গেল ড্রাইভার।

সেলাইটা আরও ভাল হতে পারত, কিন্তু চলন্ত একটা গাড়িতে বসে এর চেয়ে ভাল আর কি আশা করতে পারি? মোটামুটি ক্ষতটার মুখ বন্ধ করা গেছে। সেটার ওপর ড্রেসিং চাপিয়ে টেপ দিয়ে আটকে দিলাম।

হার্জ স্টেশনে পৌঁছুবার আগেই ধকলটা সামলে নিতে পারলাম। অন্তত মুখের সব ঘাম মুছে নিয়েছি রুমাল দিয়ে। ট্রাউজারে রক্ত লাগলেও, সেটার রঙ গাঢ় বলে খুঁটিয়ে না দেখলে কারও চোখে পড়বে না দাগটা।

ট্যাক্সি থামল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ড্রাইভার। 'পঁচিশ ডলার।'

নগদ টাকা বেরিয়ে গেল বলে একটু উদ্বেগ বোধ করলাম বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবলাম চিন্তা কি, সাথে তো ক্রেডিট কার্ড আছেই। দশ মিনিট পর ঝকঝকে একটা শেভ্রলে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। স্বীকার করতে হলো, আমার এম-জি যদি চড়ুই পাখি হয়, এটা তাহলে পক্ষীরাজ।

খুব সাবধানে, অনেকক্ষণ ধরে রিয়ার-ভিউ মিররে তাকিয়ে থাকলাম। কেউ অনুসরণ করছে বলে মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই।

ছয়

সোজা কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে চলে এলাম। গাড়ি থেকে নেমে এগোলাম লাইব্রেরীর দিকে। ভেতরে না ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকলাম দোর-গোড়ায়। চারদিকটা দেখে নেয়া দরকার। ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনের মেইন এন্ট্রান্সের দিকে তাকালাম মাঝে মধ্যে, আমার পরে আর যারা আসছে তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। এক মিনিটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলাম ওখানে। যারা আসছে তারা যে সবাই ছাত্র, লম্বা চুল দেখে তা আর বুঝতে অসুবিধে হয় না। এত চুল এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয় লিঙ্গই অত্যন্ত যত্নের সাথে যথাসম্ভব লম্বা করে রেখেছে চুল, ছেলে কিনা চেনার একমাত্র উপায় হলো দাড়ি। তারা যখন দাঁড়িয়ে বা হাঁটা অবস্থায়, তখন ঠিকই আছে; কিন্তু আমার সামনে লাইব্রেরীর ভেতর যারা বসে আছে তাদের হয়েছে মহা জ্বালা। চোখের সামনে ঝালর দেয়া পর্দার মত ঝুলছে চুল, কয়েক সেকেন্ড পরপরই হাত দিয়ে

সরিয়ে না দিলে আড়ালে পড়ে যাচ্ছে বইয়ের পাতা।

ধীর পায়ে কাউন্টারের দিকে এগোলাম। আমাকে দেখে এগিয়ে এল একটা মেয়ে। কালো ফ্রেমের প্রকাণ্ড চশমা, ঘাড়ের ওপর মস্ত খোঁপা, দেখেই বোঝা যায় লাইব্রেরী-কন্যা। পকেট থেকে বুকলেটটা বের করে তার সামনে ধরলাম। বললাম, 'এই কাগজগুলো আইডেনটিফাই করতে চাই।'

বুকলেটের ওপর নজর বুলিয়েই আমার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'রাশিয়ান।'

মাথা ঝাঁকালাম। 'সে তো বর্ণমালা দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু আমি এটা আইডেনটিফাই করতে চাই।'

'কে আপনি, স্যার?'

'জন এডওয়ার্ডস। ড. জন এডওয়ার্ডস।'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল মেয়েটার ঠোঁটে। 'দেখি কি করতে পারি, ডা. এডওয়ার্ডস।' বুকলেটটা ফিরিয়ে না দিয়েই চলে গেল সে।

বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। একজন প্রৌঢ় লোককে সাথে নিয়ে ফিরল মেয়েটা। লোকটার লম্বা দাড়ি নাভিমূল ছুঁই ছুঁই করছে।

'আপনি জানেন কি এটা?' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ। ইন্সটিটিউট অভ ইঞ্জিনিয়ারিং। লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটির আওতায়। টাইটেল হলো, "আউটলাইন অভ দা প্রবলেমস্ অভ হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই টু দা অ্যাকটিউবিন্সক রিজিয়ন অভ কাজাকস্তান"। বেশ পুরানো। উনিশশো সাতাত্তর সালের।'

'সাতাত্তর সালের?'

আঙুল দিয়ে কয়েকটা শব্দ দেখাল সে। 'এখানে তাই বলা হয়েছে।'

বুকলেটটা খুললাম। 'ভেতরের একটা পাতা নেই। ইচ্ছে ছিল অনুবাদ করাব, কিন্তু...'

লোকটা বাধা দিল আমাকে। 'সম্ভবত এর একটা কপি আমাদের কাছেও আছে। লেনিনগ্রাদের সাথে কাগজ-পত্র বিনিময় করে থাকি আমরা। নন স্ট্র্যাটেজিক।'

'চেক করে যদি দেখেন আছে কিনা...'

মেয়েটাকে আমার সামনে রেখে ফিরে গেল লোকটা। কিন্তু এবার আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, অপেক্ষার মুহূর্তগুলো তেমন বোরিং-ও লাগল না। ফিরে এসে লোকটা বলল, 'ক্যাটালগে আছে। কিন্তু...দুঃখিত, কারও কাজে লাগছে সেটা। ধার নিয়ে গেছে।'

'প্রায়ই কি নেয়া হয় ওটা?' জানতে চাইলাম।

'মনে হয় না,' হাতের খাতাটা খুলল লম্বা দাড়ি। দ্রুত কয়েকটা পাতা উল্টে কিছু দেখল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটা। সাড়ে পাঁচটায়।'

'কে?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল লোকটা। নিশ্চয়ই আমার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। খাতাটা খুলে আবার দেখল সে। 'ভদ্রলোকের নাম

আয়ান স্মিথ।'

'কাল সাড়ে পাঁচটায়?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে শেষ কবে নেয়া হয়েছিল, জানার উপায় আছে?'

আবার চেক করল লোকটা। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'এই প্রথম, এর আগে নেয়নি কেউ। অনুবাদ করা হয়েছে বলেও মনে হয় না। অন্তত এখানে তার কোন রেকর্ড নেই।'

'ধন্যবাদ,' বলে ঘুরে দাঁড়ালাম। নজরে পড়ার সাথে সাথে বেখাপ্পা লাগল একটা ব্যাপার। লম্বা চুলের ভিড়ে চকচকে একটা টাক। অনেকেই অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। তাদের দিকে আমি যখন ফিরলাম, কেউই তাদের দৃষ্টি বা মুখ ঘুরিয়ে নিল না, একজন বাদে। মাথা নামিয়ে নিয়েছে টেকো। তার পাশ ঘেঁষে যাবার সময়ও চেহারাটা ভাল করে দেখতে পেলাম না। চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে টের পেলাম, হাতে একটা খোলা বই থাকলেও একটা শব্দও পড়ছে না সে।

ধীর পায়ে বেরিয়ে এলাম লাইব্রেরী থেকে। লবিতে পা দিয়ে আর দেরি নয়, ছুটতে শুরু করলাম। তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ টপকে চাতালে, সেখান থেকে তীরবেগে কার পার্কে। স্টার্ট দিয়েই ছুটিয়ে দিলাম শেভ্রলে। চোখে দেখেও প্রত্যয় হলো না, সত্যি ওরা আবার খুঁজে পেয়েছে আমাকে, কিংবা কল্পনায় এল না কিভাবে খুঁজে পেল—কিন্তু দেখলাম, প্রাণপণে ছুটছে তিনজন লোক। একটা বুইকের দিকে। আশ্চর্য!

মিডটাউনে যাবার পথে আয়নার দিকে না তাকিয়ে রাস্তার ওপর চোখ রাখতে চেষ্টা করলাম। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে আশা করি ট্রাফিকের ভিড়ের সাথে মিশে গিয়ে ফাঁকি দিতে পারব বুইকটাকে। কিন্তু শহরের এদিকটা আমার ঠিক পরিচিত নয়। বারবার আয়নায় চোখ রেখে পিছন দিকটা না দেখে পারলাম না। প্রতিবারই দুটো কি তিনটে গাড়ির পিছনে দেখলাম বুইকটাকে। সমস্যা হলো, এত কাছে থাকলে ওটাকে আমি ফাঁকি দেব কিভাবে? চারদিকে ট্রাফিকের প্রচণ্ড ভিড়, ডানে-বাঁয়ে দ্রুত বাঁক নিচ্ছে, নিচের রাস্তা থেকে ওপরে উঠে আসছে, ওপরের রাস্তা থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে, সারি সারি অসংখ্য গাড়ির মিছিল, তীর বেগে ছুটছে সবগুলো—এই রকম একটা পরিস্থিতি দরকার আমার। ফুয়েল ডায়ালের দিকে তাকালাম। ভাড়া করা গাড়ির মস্ত একটা সুবিধে হলো, ট্যাংক ভরে তারপর মানুষের হাতে গাড়ি তুলে দেয় ওরা। বাঁক নিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চললাম।

কুইনস্ হয়ে সারাটা পথ ওরা আমাকে অনুসরণ করে এল। সারাটা পথ আমি এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রইলাম, আমার পাশে চলে এসে ওরা না রিভলভার ব্যবহার করে! কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে তা ওরা করল না। আমার ঠিক পেছনের গাড়িতে পুরো আধ ঘণ্টা আরাম করে বসে থাকল তিনজন সুযোগ বুঝে বার দুয়েক ওদেরকে খসাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না শেষ পর্যন্ত সোজা টি. ডব্লিউ. এ. বিল্ডিঙের দিকে এগোলাম ওখানে পৌঁছে আমি যে থামব, তা ওদেরকে

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টের পেতে দিলাম না। হুট্ করে রাস্তার একেবারে মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে, স্টার্ট বন্ধ না করেই, লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম। কি ঘটছে বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ওদের, এরই মধ্যে এক ছুটে বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে পড়েছি আমি। এসকালেটরে চড়েও পিছন দিকে তাকালাম না, যদিও জানি খুব একটা পিছিয়ে পড়েনি ওরা। জানি, হয়তো ধরা পড়ে যাব। কিন্তু ভাগ্য যদি একটু সহায়তা করে আর আমার আহত পা যদি না ডোবায়, এ-যাত্রা রেহাই পেয়ে যেতেও পারি। অনবরত দপ দপ করছে ক্ষতটা। ছুটতে শুরু করে এরই মধ্যে দু'বার প্রচণ্ড খামচি অনুভব করেছি। তার মানে দুটো সেলাই ছিঁড়ে গেছে।

এসকালেটর থেকে নেমে আবার ছুটলাম। একটা কোণ ঘুরে আসতেই দেখি ভাগ্য প্রসন্ন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা রয়েছে অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল, বেশিরভাগই খালি। একটা চেয়ারে ডোরাকাটা লাম্বার কোট আর মস্ত একটা হ্যাট দেখলাম, কেউ নেই আশপাশে। ছোটার মধ্যেই ছোঁ দিয়ে তুলে নিলাম ওগুলো। তিনটে ধাপ টপকে ঢুকে পড়লাম লবিতে। ট্যাক্সি লেখা দরজা টপকে বেরিয়ে এলাম উল্টোদিকে। ওরা যদি আমাকে কোট আর হ্যাট তুলে নিতে না দেখে থাকে, তাহলে বোধহয় আর কোন ভয় নেই। ছোটার মধ্যেই কোটটা চাপিয়ে নিয়েছি গায়ে। হ্যাট-কোট পরা অবস্থায় নিশ্চয়ই কাউবয়ের মত দেখতে হয়েছি আমি। অদূরেই সারি সারি অফিস, প্রত্যেকটির কপালে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সাইনবোর্ড। সামনে পড়ল ব্রাজিলিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিস, ঢুকে পড়লাম। ভেতরে অনেক লোকজন, তার মানে হয় এইমাত্র কোন ফ্লাইট এসেছে নয়তো এখুনি কোন ফ্লাইট ছাড়বে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে সবার সাথে দাঁড়িয়ে আমিও অপেক্ষা করতে শুরু করলাম।

একটু পরই ঘড় ঘড় করে উঠল একটা লাউডস্পীকার। একটা মেয়ের গলা। 'ট্যাক্সি আছে। তাছাড়া, আমাদের নিজস্ব বাস ডিপো পর্যন্ত যাবে। এয়ারপোর্ট থেকে আপনারা ইচ্ছে করলে হেলিকপ্টারে চড়েও বেরিয়ে যেতে পারেন। মিডটাউন ম্যানহাটনে প্যান অ্যাম বিল্ডিঙের ছাদে নামবে। ধন্যবাদ।'

ওই হেলিকপ্টারে আমার চড়া চাই! ভিড় ঠেলে কাউন্টারের দিকে এগোলাম। মেয়েটার সামনে পৌঁছে বললাম, হেলিকপ্টার ফ্লাইটের একটা টিকিট দাও আমাকে। মিনিট তিনেক পর উঠে বসলাম চপারে। আর সব আরোহীদের মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম; আমার জন্যে ওরা কেউ পকেটে ছুরি বা রিভলভার লুকিয়ে রেখেছে কিনা।

ম্যানহাটনে পৌঁছুবার আগেই এরপর কি করব ঠিক করে ফেললাম। কাজটার কথা আরও আগেই মাথায় ঢোকা উচিত ছিল। ঢোকেনি তার কারণ আজব সব ঘটনা ঘটতে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। প্যান অ্যাম বিল্ডিঙের এলিভেটরটা ঝপ করে নেমে এল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। হন হন করে হেঁটে বেরিয়ে এলাম বিল্ডিং থেকে। খানিক দূরে কমান্ডার হোটেল, এই বাজ পড়া শহরে আসার পর প্রথম দিকে ওখানেই উঠেছিলাম। হোটেলটা এক কোণে, আরেক কোণে একটা ট্র্যান্সপোর্টেশন অফিস। হোটেলে উঠে প্রথম কাজ হলো, আমেরিকান জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ঠিকানা যোগাড় করা। সহজেই পাওয়া গেল সেটা

কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল, একশো ছাপ্পান্ন নম্বর স্ট্রীটে যাব কিভাবে? তাছাড়া, হাতে কিছু নগদ টাকাও থাকা দরকার।

হাজার হোক পুরানো খদ্দের, কমান্ডার বিশেষ খাতির দেখাল আমাকে। ক্রেডিট কার্ড ভাঙাবার সিস্টেম রাখেনি ওরা, কিন্তু আমারগুলো রেখে নগদ টাকা গুণে দিল। দরজার পাশেই অ্যাভিজ কার, ফোন করে জানিয়ে দিল আমার একটা গাড়ি দরকার। প্রথমে অবশ্য হার্জকে ফোন করতে চেয়েছিল ম্যানেজার, সবাই জানে ওদের সার্ভিস খুব ভাল, কিন্তু আমি যুক্তি দেখিয়ে বললাম, সবাই যদি হার্জের তেলা মাথায় তেল ঢালি, অ্যাভিজের মত ছোটখাট প্রতিষ্ঠানগুলো টিকবে কিভাবে? পিছনের লবি-রেস্তোরাঁয় কফির কাপ হাতে নিয়ে বসে থাকলাম। চোখ জোড়া পড়ে থাকল দরজার দিকে। এক সময় ইঙ্গিতে বেল ক্যাপ্টেন জানাল, গাড়ি পৌঁছে গেছে। সাথে সাথে বেরিয়ে এলাম আমি। মনে মনে জানি, অ্যাভিজ সহ অন্যান্য রেন্ট-এ-কার কোম্পানীকে সতর্ক করে দিতে শুরু করেছে হার্জ। হারানো খ্যাতি পুনরায় উদ্ধারের চেষ্টা পরে করলেও চলবে, এই ভেবে আপটাউনের দিকে ছুটে চললাম।

ভাব-গম্ভীর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন একটা অট্টালিকা—আমেরিকান জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি। এ-ধরনের প্রাসাদের ভরণ-পোষণ আজকাল শুধু মাত্র একাডেমিগুলোর পক্ষেই করা সম্ভব। ভেতরে পালিশ করা ফার্নিচারের গন্ধ ভাসছে। একটু কান পাতুন, একটু কল্পনা করুন, শত বছর আগে এখানে যে-সব গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার কিছুটা অন্তত শুনতে পাবেন। এনকোয়্যারী উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে কি চাই জানালাম। ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো আমাকে। টিডি রয়্যাল নামে আধাবয়েসী এক মহিলা এল আমাকে সাহায্য করতে। বলল, 'ইয়েস?'

'আমি প্রফেসর এডওয়ার্ডসকে খুঁজছি,' বললাম আমি। 'তিনি আপনাদের একজন ফেলো, মানে ফ্যাগস, তাই···'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে টিডি রয়্যাল বলল, '···তাকে একজন জিয়োগ্রাফার বলে মনে করাই নিরাপদ।' মুচকি হাসল সে। 'ঠিক আছে। প্রফেসর এডওয়ার্ডস নামে কাউকে আমি চিনি না, তবে দেখছি।'

অন্য এক অফিসে চলে গেল সে, ফিরে এল হাতে একটা মোটা আর লম্বা খাতা নিয়ে। 'আমাদের দেশের সব ইউনিভার্সিটিতে জিয়োগ্রাফিতে যাঁরা চেয়ারের অধিকারী, তাঁদের তালিকা এটা।'

খাতাটা নিয়ে খুললাম। এক রকম নিজের অজান্তেই গোঙানির মত আওয়াজ বেরিয়ে এল আমার নাক-মুখ দিয়ে। ইউনিভার্সিটির নামগুলো বর্ণমালা ধরে সাজানো হয়েছে, কিন্তু প্রফেসরদের নামগুলো সাজানো হয়নি। তার মানে, প্রত্যেকটি নামের ওপর চোখ বুলাতে হবে আমাকে। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। 'মেম্বার আর ফেলোদের আলাদা কার্ড ইনডেক্স ফাইল নেই?'

'আছে বৈকি,' বলল টিডি রয়্যাল। 'দেখেছি। তালিকায় নেই তিনি। হয়তো ভুল করে ছাপা হয়নি···' কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো, ভুল হবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে না সে।

অগত্যা মোটা, ভারী খাতাটা আবার খুললাম।

'ইচ্ছে করলে বসতে পারেন আপনি,' দূরের একটা চেয়ার দেখাল টিডি রয়্যাল।

চেয়ারটা জানালার সামনে, দরজার দিকে মুখ করে বসলাম। তিনটে ইউনিভার্সিটির তালিকা শেষ করতেই এক ঘন্টা বেরিয়ে গেল ওয়াশিংটন শেষ করে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ধরেছি। কিন্তু যতই এগোচ্ছি ততই ভাটা পড়ছে উৎসাহে। ধারণাও ছিল না যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙের ছাতার মত এত বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগল, চারদিকে তাহলে এত বোকার হদ্দ দেখি কেন?

জেদের বশেই সবগুলো তালিকা শেষ করলাম অবাক কাণ্ড, একটা এডওয়ার্ডসও নেই। শব্দ করে বন্ধ করলাম খাতা। টিডি রয়্যাল মুখ তুলে তাকাল।

'নো লাক?'

'নো লাক।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ক্লান্ত শরীর নিয়ে তার ডেস্কের সামনে এসে থামলাম। খাতাটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'যথেষ্ট করেছেন আমার জন্যে। ধন্যবাদ।'

কোন মন্তব্য না করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল টিডি রয়্যাল। আমি বিদায় হলেই যে বাঁচে সে, পরিষ্কার বোঝা গেল সেটা। কিন্তু খানিকটা অপ্রতিভ ভাব নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকলাম আমি, মনস্থির করতে পারছি না। অলস চোখে চারদিকে তাকালাম। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু আর কামরার গোটা দেয়াল জোড়া শেলফ, তাতে বই, বই আর বই। চেহারা দেখে বোঝা যায় এগুলোর মধ্যে দুশো বছরের পুরানো বইয়েরও অভাব নেই।

কামরাটা ছেড়ে নড়তে মন চাইল না। আমার নিরুপদ্রব জীবনে হঠাৎ এই যে এসব ঘটছে, এর একটা সূত্র এই বিল্ডিঙের কোথাও না থেকেই পারে না! খুক করে কাশল টিডি রয়্যাল। এরপর হয়তো মুখ ফুটে বলবে, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

সত্যিই তো, দাঁড়িয়ে আছি কেন? আপন মনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলাম। ঠিক এই সময় কি যেন চোখে পড়ল আমার। দেখেই যে বুঝলাম, তা নয়। আসলে নামটা নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামিয়েছি যে আমার অবচেতন মনে খোদাই হয়ে গিয়েছিল ওটা, তাই দেখা মাত্র সচেতন মনকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে। লাল একটা মলাট। সোনালী হরফগুলো এই ভাবে সাজানো—

কালেকটেড
পেপারস্
প্রেজেন্টেড
টু আমেরিকান্
জিয়োগ্রাফিক্যাল
এসোসিয়েশন
কনফারেন্স
নাইনটিন-সেভেনটিসেভেন
এড.
ওয়ার্ড.

'ওয়ার্ড কে?' হঠাৎ চিৎকার করে ওঠায় চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠল টিডি রয়্যাল। ছুটে গিয়ে শেলফ থেকে বইটা পেড়ে নিয়ে এলাম। শিরদাঁড়াটা ধরলাম মহিলার নাকের নিচে। 'ওয়ার্ড! কে ইনি?'

'ও. উনি তো প্রফেসর ওয়ার্ড প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র এডিট করেছেন।'

ডেস্ক থেকে মোটা খাতাটা তুলে নিয়ে আবার খুললাম। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির তালিকায় পেলাম তাকে। 'এডউইন অসলে ওয়ার্ড, এম. এ. (প্রিন্সটন), পি-এইচ. ডি. (ক্যান্টাব, ইং), এফ-এজিএস.'।

'আপনি ভদ্রলোককে চেনেন?'

'হ্যাঁ,' বলল টিডি রয়্যাল। 'উনি তো অত্যন্ত নামী মানুষ। কাউন্সিলের মেম্বার। আমাদের কাউন্সিলের।'

'এডউইন ওয়ার্ড। সাধারণত কি নামে ডাকা হয় তাঁকে বলতে পারেন?'

'কেন, প্রফেসর ওয়ার্ড।'

'তাঁর বন্ধুরা,' দ্রুত জানতে চাইলাম। 'ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা? তারা কি তাঁকে এড বলে ডাকে?'

একটু ইতস্তত করে বলল টিডি রয়্যাল। 'হ্যাঁ, তাও বলে কেউ কেউ...'

'নিজের কানে শুনেছেন আপনি?'

'শুনেছি।'

'ধন্যবাদ!' ছুটে বেরিয়ে এলাম কামরা থেকে।

প্রিন্সটন। নামী মানুষ। হতেই হবে! রাশিয়ানরা প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির প্রখ্যাত একজন প্রফেসরের কাছে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠাবে না তো কি অখ্যাত একজন তরুণ সার্জেনের কাছে পাঠাবে? গাড়িতে উঠে ছুটে চললাম ডাউনটাউনের দিকে। হঠাৎ মনে পড়ল, আমার আজকের লেকচারটা বাদ পড়ল। ছাত্ররা ভারী অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু এতে করে দুনিয়ার মানুষের ওপর কেয়ামত নেমে আসার কোনই সম্ভাবনা নেই, কাজেই ফোন করে সময় নষ্ট করারও কোনই মানে হয় না।

অনেক দূর, একেবারে তেতাল্লিশ নম্বর স্ট্রীট পর্যন্ত চলে এলাম, তারপর বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিকে ছুটলাম। লিংকন টানেল পেরিয়ে বাঁক নিলাম আবার, এবার দক্ষিণ দিকে, সেই নিউ জার্সি টার্নপাইক পর্যন্ত। উৎসাহের জোয়ার অনুভব করছি সারা শরীরে, শুধু পা বাদে। এমন কোথাও যাচ্ছি যেখানে একটা উত্তর পাওয়া যাবে। এগজিট নাইনে পৌঁছে টার্নপাইক ছেড়ে এলাম। লরেন্স রিভার পেরিয়ে ইউ.এস. নাম্বার ওয়ান হাইওয়ে ধরলাম। ঝড়ের বেগে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলল গাড়ি। দেড় ঘন্টার কিছু বেশি সময় লাগল, পৌঁছে গেলাম প্রিন্সটন।

বিশাল এলাকা। গোটা একটা সামরিক বাহিনীর জায়গা দেয়াও সম্ভব। ক্যাম্পাসে ঢুকে সামনে যাকে পেলাম তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, জিয়োগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট কোন্ দিকে? ছেলেটাকে দেখে ছাত্র বলে মনে হলো, অথচ মুখ তো নয়ই, কপালও চুলে ঢাকা পড়েনি। নরম সুরে রাস্তাটা বলে দিল সে।

চারদিকে কোথাও তেমন ভিড় দেখলাম না। আন্দাজ করলাম বেশিরভাগ ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট বিল্ডিঙে ঢুকে প্রফেসর ওয়ার্ডের অফিস খুঁজতে শুরু

করলাম। একটু পর পেয়েও গেলাম এদিক ওদিক দেখে নিয়ে মৃদু নক করলাম দরজায়।

ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। দেবার কথাও নয়। পাশের দরজার গায়ে লেখা রয়েছে প্রাইভেট, সেটাতেও তালা।

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তাই করছি···আড়াইটার সময় করিডরে একটা মেয়েকে দেখলাম। ব্যাগের ভেতর হাত ভরে চাবি খুঁজছে। প্রফেসর ওয়ার্ডের দরজার সামনে থামল সে। তালা খুলল।

বললাম, 'প্রফেসর ওয়ার্ডের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, উনি কি···?'

চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেয়েটা। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চোখ দুটো নীল। চকচকে কালো ফ্রেমের মত চুল, মাঝখানে মুখটা ভারী নির্মল। 'আপনার নাম, প্লীজ?' ঠাণ্ডা, কোমল কণ্ঠস্বর—কিন্তু তরল নয়, ব্যক্তিত্বের ধার আছে।

'এডওয়ার্ডস। ডক্টর এডওয়ার্ডস।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মেয়েটা। নিজের ডেস্কের সামনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা তুলে নিয়ে খুলল সেটা।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, ড. এডওয়ার্ডস?' ভেতরে ঢুকছি, মুখ তুলে তাকাল সে।

'না, কিন্তু অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলা দরকার আমার।'

হাতের বই বন্ধ করল মেয়েটা। 'দুঃখিত। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া প্রফেসর ওয়ার্ড কারও সাথে দেখা করেন না। অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ তিনি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। আশা করি আপনি বুঝবেন।' একটু হাসল বটে, কিন্তু তাতে এতটুকু সহানুভূতি বা প্রশ্রয় নেই।

'তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাই। তিনটের সময়?'

ভুরু কুঁচকে উঠল মেয়েটার। 'আজ বিকেলেও তাঁর লেকচার আছে। কিন্তু সকালে···'

'সকালে কি?'

'না কিছু না।'

'নিশ্চয়ই কিছু! তা নাহলে বলতে শুরু করে থামলেন কেন?'

'কিছু না, ড. এডওয়ার্ডস। আজ সকালেও তাঁর লেকচার দেবার কথা ছিল, এই আর কি।'

'কথা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'অথচ দেননি?'

গোপন করার চেষ্টা করলেও মেয়েটার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'তিনি···আজ এখনও তিনি ইউনিভার্সিটিতে আসেননি।'

সাত

ভেতর ভেতর চমকে গেলাম। দুশ্চিন্তার ছায়া ঢাকা মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড তারপর নিচু গলায় জানতে চাইলাম, 'সকালের লেকচারটা তিনি মিস করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'প্রায়ই এই রকম করেন?'

'না!'

'শেষবার কবে এই রকম আসেননি?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'লেকচার মিস করেছেন এমন ঘটনা অন্তত আমি আসার পর থেকে ঘটেনি। প্রফেসর ওয়ার্ড...'

'বলুন?'

'ঘড়ির কাঁটা ধরে সব কাজ করেন। তাছাড়া, তাঁর মত আর কাউকে এতটা ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে দেখেনি আমি...'

'একান্তই যদি কোন কারণে দেরি হয়ে যায় বা আসতে না পারেন, ফোন করে খবর দিতেন, তাই বলতে চাইছেন?'

'দেখুন, আগে তো কখনও এরকম ঘটেনি, কিন্তু...'

'কোন কারণে কোথাও যেতে পারেন। হয়তো ইউনিভার্সিটিরই কোন কাজে?'

'আমাকে না জানিয়ে? মনে হয় না। প্লীজ, ড. এডওয়ার্ডস, আপনার এখানে আসার কারণটা পরিষ্কার করে বলুন আমাকে। এত কথা জানতে চাইছেন আপনি, অথচ...'

'তিনি সপরিবারে বাস করেন, নাকি...?'

'তিনি ব্যাচেলার। প্লীজ, ড. এডওয়ার্ডস!'

'দুঃখিত। প্রথমেই বলা উচিত ছিল আমার।' মেয়েটাকে এসবের মধ্যে জড়াবার কোন ইচ্ছে নেই আমার। 'একটা ব্যাপারে প্রফেসরের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম...নিউ ইয়র্ক, এ-জি-এ থেকে এসেছি।' মিথ্যে হলেও এটাকে ঠিক জঘন্য মিথ্যে বলা যায় না

'এ-জি-এ থেকে?' ভুরু কুঁচকে উঠল মেয়েটার। 'ওখান থেকে তো সাধারণত জরুরী কোন ব্যাপারে...'

'আপনি তাঁর বাড়িতে খবর নিয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল। 'সাড়া পাইনি।'

'সেটা কখন?'

'কয়েকবারই ফোন করেছি

একটু ভাবলাম 'মিস...'

'লীডস, মেরী লীডস।'

'আজ বিকেলের লেকচারটা যদি তিনি মিস করতে না চান, এখানে তাঁর কখন পৌঁছুবার কথা?'

রিস্টওয়াচ দেখল মেরী। 'পৌঁছুবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

'তাহলে আর দেরি না করে, দুটো ফোন করবেন? খোঁজ নিন, তিনি পৌঁচেছেন কিনা। তারপর জানুন, ক্যাম্পাসে তিনি লাঞ্চ সেরেছেন কিনা।'

ফোনের রিসিভার তুলল মেরী। ওর ভাব, কথা, ইত্যাদি লক্ষ করলাম। দক্ষ একজন সেক্রেটারি বলতে যা বোঝায়, মেরী তাই। খুব বেশি সময় নিল না। রিসিভার রেখে দিয়ে তাকাল আমার দিকে। 'না।'

'ঠিকানা?'

'কিন্তু আপনাকে আমি চিনি না...' ইতস্তত করতে দেখা গেল মেরীকে

হাত বাড়ালাম, বললাম, 'তাহলে ফোন গাইডটা দিন আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করল মেরী, তারপর ঠিকানাটা জানিয়ে দিল। বেরিয়ে আসছি, পিছন থেকে জানতে চাইল, সে, 'তেমন কোন খবর থাকলে আমাকে জানাবেন তো?'

ঠিকানায় কোন ভুল নেই, তবু বাড়িটা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো। এটা এমন একটা ডিস্ট্রিক্ট, স্ট্রীট সাইনগুলো ঠিক কি বলতে চায় বুঝতে হলে গবেষণার দরকার পড়ে, আর বাড়ির গেটে নাম্বার লেখা হয় না। একটা রাস্তা দিয়ে দু'বার গেলাম, তারপর বুঝলাম, এটাই খুঁজছি। গাড়ির স্পীড কমিয়ে আনলাম, মেরীর বর্ণনা অনুসারে জাপানী চেরী গাছ দেখতে পাব। একটু পরই পেলাম। গেটটা খোলা দেখে গাড়ি নিয়েই ঢুকে পড়লাম ভেতরে। গাড়ি বারান্দায় থামলাম। নিচে নামার আগে চারদিকটা দেখে নিলাম একবার। কাউকে দেখলাম না চারটে ধাপ টপকে উঠে গেলাম ফ্রন্ট পোর্চে। আগেকার দিনের বাড়ি—বিশাল, সাদা রঙ করা, জানালায় শাটার, প্রচুর খোলামেলা জায়গা। ডোর পিলারের গায়ে বোতাম, আঙুল চেপে ধরলাম। বেলের শব্দ না পেয়ে আবার টিপলাম। তবু কোন আওয়াজ নেই। খারাপ হয়ে গেছে?

খানিক অপেক্ষা করে আবার বোতামে চাপ দিলাম। এবার অস্পষ্ট একটা আওয়াজ পেলাম। অনেক দূর থেকে ভেসে এল বেলের আওয়াজ। কিন্তু দরজার ওপারে কেউ এল না। গভীর নিস্তব্ধতা অনুভব করে বুঝতে অসুবিধে হয় না বাড়িতে কেউ নেই।

বড়সড় একটা জানালা দেখলাম ডান দিকে। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা কিছু ফার্নিচার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। অগত্যা গাড়ি বারান্দা হয়ে বাড়ির পাশে চলে এলাম। ওখান থেকে পেছন দিকে। সুন্দর একটা বাগান, দেখে মন ভরে যাবার মত। কিন্তু পায়ের ব্যথা আর নানান দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি আমি, বাগানের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করতে পারল না। লক্ষ করলাম, বাগানের পর শুরু হয়েছে ঝোপ-ঝাড়, তারপর আকাশ ছোঁয়া জঙ্গল।

কয়েকটা ধাপ টপকে চওড়া একটা টেরেসে উঠে এলাম সামনেই একটা

ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, কাঁচে নাক ঠেকিয়ে ভেতরে তাকালাম। একটা সিটিংরূম। পুরানো আমলের দুটো কোচ, কয়েকটা গভীর চেয়ার। কিন্তু একেবারে খালি, লোকজন নেই। হাতলে হাত রেখে ঘোরাতে শুরু করলাম, জানি খুলবে না। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। খুলে গেল কবাট।

সাথে সাথে গরম বাতাস এসে ধাক্কা দিল মুখে। বুঝলাম, ভেতরে হিটার চালু আছে। অদ্ভুত কিন্তু পরিচিত একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। বাড়িতে প্রচুর বই থাকলে এই গন্ধটা হয়। চেয়ারগুলোকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো খোলা দেখে খুব যে একটা অবাক হয়েছি তা নয়। বীমা কোম্পানী পরামর্শ দিলেই যে বাইরে বেরুবার আগে গোটা বাড়ি চক্কর দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে তার কোন মানে নেই। প্রফেসর ওয়ার্ড বরং চক্কর না দিয়ে ভালই করেছেন, দিলে আমি ভেতরে ঢুকতাম কিভাবে? দরজা টপকে হলে বেরিয়ে এলাম। এটাও খালি। চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কান পাতলাম। দুনিয়ার সব বাড়িই কিছু আওয়াজ করে, এটাও তার ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু এই বাড়িটা মাত্র একটা শব্দ করছে। মৃদু একটা গুঞ্জন। সম্ভবত হিটার পাম্পের আওয়াজ ওটা। একটু পর আরেকটা শব্দ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম আমি। দরজার পাশে বড় একটা ঠাকুরদা দেয়ালঘড়ি। টিক টিক টিক টিক করছে। তাছাড়া গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ।

'প্রফেসর ওয়ার্ড,' প্রথমে আস্তে করেই ডাকলাম। ভদ্রলোক হয়তো অসুস্থ, হয়তো ঘুমাচ্ছেন—কত কিছুই তো হতে পারে। অচেনা গলার চিৎকার তাঁর হার্টের জন্যে যদি ক্ষতিকর হয়? কিন্তু সাড়া পেলাম না এবার একটু গলা চড়ালাম। তবু কোন সাড়া নেই।

ফ্রন্টডোরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পিছনে সাদা রঙ করা একটা সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে ওপরে। আমার বাঁ দিকে দুটো দরজা। প্রথমটা চলে গেছে কিচেনে। পা টিপে টিপে সেদিকেই এগোলাম ভেতরে ঢুকে দেখি, সব কিছু মাজাঘষা, কোথাও কোন নোংরা কাপ-পিরিচ বা তরকারির খোসা পড়ে নেই। ভয়ে ভয়ে স্টোভটা ছুঁয়ে দেখলাম। ঠাণ্ডা। কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে দু'নম্বর দরজা দিয়ে পাশের কামরায় ঢুকলাম। বাইরে থেকে এটাই দেখতে চেষ্টা করেছিলাম আমি। আগে চোখে পড়েনি, গোল একটা টেবিলের চারধারে কয়েকটা রিজেন্সী চেয়ার। হিটারটা এই ঘরেই রয়েছে। গ্যাস বিলটা আমাকে দিতে হবে না, কাজেই সেটা অফ করার কথা মনেই পড়ল না। বলাই বাহুল্য, এটাও একটা খালি ঘর।

পা টিপে টিপে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। কাঠের ধাপ, সতর্ক থাকা সত্ত্বেও ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো এক-আধটু। দরজা খুলে তবু বেরিয়ে এল না কেউ। সিঁড়ির মাথায় থামলাম। খুক খুক করে কাশলাম কয়েকবার পরের বাড়িতে এভাবে ঘুরঘুর করার কোন অধিকার আমার নেই, অস্বস্তি বোধ করা স্বাভাবিক। কাশির উত্তরে কেউ ধমকে উঠল না, কাজেই আবার এগোলাম। বেশ কয়েকটা দরজা দুদিকে, আমি ডান দিকেরগুলোয় এক এক করে ঢুকলাম এবং বেরিয়ে এলাম। সবগুলোই বেডরূম, কিন্তু কোনটাতেই কেউ নেই, এবং বিছানায় নিভাঁজ চাদর দেখে মনে হলো কেউ শোয়ওনি। এবার বাঁ দিকের প্রথম দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখতে পেলাম তাঁকে একটা চেয়ারে বসে আছেন। ডানদিকে

ঝুঁকে পড়েছে মাথা। হাঁটুর ওপর মেলা রয়েছে একটা খবরের কাগজ

'প্রফেসর ওয়ার্ড?' ফিসফিস করে ডাকলাম

সাড়া নেই

এবার গলা চড়িয়ে ডাকলাম তবু কোন সাড়া নেই এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাঁধ ছুঁলাম। সাথে সাথে তাঁর হাত নড়ে উঠল, কিন্তু সিকি ইঞ্চির বেশি নয়। কাঁধ থেকে হাত তুলে আমি তাঁর কপাল ছুঁলাম। যা ভয় করেছিলাম, তাই। শক্ত হয়ে গেছে চামড়া। আঙুলের উল্টো পিঠে ঠাণ্ডা স্পর্শ পেলাম

মারা গেছেন প্রফেসর ওয়ার্ড।

লাশ পেলে কি করতে হয়, ভালই জানা আছে আমার। হাত দুটোকে সামলে রাখতে হয়, ভুল করেও কিছু যেন ছুঁয়ে না ফেলে। সম্ভব হলে কার্পেট ছোঁয়াও বারণ। তারপর টেলিফোনের কাছে ছুটে গিয়ে খবর দিতে হয় পুলিসকে। কিন্তু আমি তা করলাম না। কারণ আমার জানতে হবে প্রফেসর ওয়ার্ড সময় হয়ে গেছে বলে চলে গেছেন নাকি তাঁকে জোর করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওপারে।

প্যাথোলজিস্টের একটু সাহায্য আর যদি একটা ল্যাবরেটরি থাকত, সহজেই পেয়ে যেতাম উত্তরটা। কিন্তু এখানে ওসব আশা করা বৃথা। প্রফেসরের চেহারাতেই লেখা রয়েছে, মৃত্যুটাকে সানন্দে গ্রহণ করেননি তিনি। মুখে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই। তাই বলে, তাঁর চোখে মুখে আতঙ্ক বা ভীতিরও কোন ছাপ নেই। মরার আগেও বোধহয় ঠিক এই রকমই দেখাত তাঁকে—গম্ভীর, ভুরু দুটো সামান্য একটু কোঁচকানো, তার নিচে সতর্ক, অনুসন্ধিৎসু এক জোড়া চোখ, চোখে কর্তৃত্ব সুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মৃত্যুর পর শক্ত হয়ে গেছে তাঁর শরীর, মুঠোর ভেতর থেকে খবরের কাগজটা না ছিঁড়ে বের করা সম্ভব নয় জ্যাকেটটা খুলে সরিয়ে শার্টটা পরীক্ষা করলাম। ঠিক জানি না কি খুঁজছি, হয়তো বুলেটের গর্ত, হয়তো ছুরির আঘাত কিংবা রক্ত। কিন্তু সে-ধরনের নাটকীয় কিছুই দেখলাম না। স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হতে লাগল।

দরজার দিকে পা বাড়ালাম। আদর্শ নাগরিক হিসেবে পুলিসকে খবর দিতে যাচ্ছি। কিন্তু ঘর থেকে বেরুবার আগে দুটো জিনিস বাধা দিল আমাকে।

প্রথমে একটা ডেস্ক। আকারে বেশ বড়, মেহগনি কাঠের তৈরি। সুন্দর দেখতে। লাল লেদার দিয়ে ওপরটা মোড়া। সেটার ওপর অনেক কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু প্রফেসর ওয়ার্ডকে জীবিত অবস্থায় না দেখলেও, কেন যেন মনে হলো, আর যাই হোন, তিনি অগোছাল ছিলেন না। কাগজ এলোমেলো করে তার মাঝখানে বসে তিনি কাজ করবেন, উঁহুঁ। শুধু যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাও নয়, অনেক কাগজ উল্টেও আছে। ডেস্ক ঘুরে চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, খোপ থেকে নামিয়ে কার্পেটে রাখা হয়েছে দুটো দেরাজ। সেগুলোর চারদিকেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কাগজপত্র।

বুঝলাম, প্রৌঢ় প্রফেসর যেভাবেই মারা যান, তাতে প্রকৃতির কোন হাত ছিল না। গতরাতে আমার অ্যাপার্টমেন্টের মতই এই কামরাটাও সার্চ করা হয়েছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, ছড়ানো কাগজগুলো থেকে চোখ সরাতে পারছি না, এই

সময় দ্বিতীয় ঘটনাটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম আমি। একটা শব্দ ঢুকল কানে।

কাঁকরের ওপর পা পড়লে এই শব্দটা হয়।

মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা বোধ করলাম পিছু পিছু এখানেও এসেছে ওরা? নিজের অজান্তেই প্রফেসরের দিকে চোখ পড়ল চোখ দুটো এখনও খোলা, মনে হলো তিনি যেন নিঃশব্দ ইঙ্গিতে আমাকে পালাতে বলছেন। আবার পেলাম শব্দটা হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লাম কার্পেটে, ক্রল করে এগোলাম জানালার দিকে। তারপর মাথা তুলে পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকাতেই দেখি মেইন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন লোক, রাস্তার দিকে পিছন ফিরে, যেন পাহারা দিচ্ছে। কাঁকর বিছানো গাড়ি-পথ ধরে হন হন করে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে আরও দু'জন। গেটের বাইরে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গাড়ি।

দ্রুত বেরিয়ে এলাম কামরা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম। কোথাও থামলাম না, সোজা বেরিয়ে এলাম বাড়ির পিছন দিকে। ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা খোলাই পেলাম, বেরুবার আগে মাথা বের করে দেখে নিলাম চারদিক। পিছনের বাগানে এখনও ওরা কেউ পৌঁছায়নি। লাফ দিয়ে বাগানের নিচু পাঁচিল টপকে ঘাসের ওপর পড়লাম। উঠেই ছুটলাম ঝোপ লক্ষ্য করে। ছোটার মধ্যেই পিছন দিকে তাকালাম একবার। কাউকে দেখলাম না। বাগান থেকে বেরিয়ে আসতেই বিপত্তি। ভিজে এঁটেল মাটিতে পা হড়কে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। জুতোর নিচে ইঞ্চিখানেক পুরু হয়ে সেঁটে গেল মাটি। এরপর আবার যখন পিছনে তাকালাম, দেখি বাড়ির পাশ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে একজন লোক হাতে চকচকে রিভলভার।

মাটি শক্ত বা সাধারণ কাদা হলে আরও অনেক জোরে ছুটতে পারতাম। প্রতিটি পা সাবধানে ফেলতে হলো আমাকে, তার ওপর লক্ষ রাখতে হলো ঝোপে যেন ধাক্কা না খাই, ডালপালা দুলে উঠলে আমাকে দেখে ফেলবে লোকটা। ঘাড় ফেরালাম। খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর দিকে তাকিয়ে আছে। আর কেউ হলে বোধহয় ভেতরে ঢুকত, কিন্তু এই লোকটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, সরাসরি তাকাল আমার দিকে। চেঁচিয়ে কি যেন বলল কাকে, তারপর রিভলভার ধরা হাতটা তুলল আমার দিকে। ঘাড় সোজা করে নিয়ে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। আহত পায়ের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করলাম না। গুলির শব্দ হলো। আমার সামনের একটা গাছে লাগল বুলেট। পরমুহূর্তে আরেকটা গুলি। সেই একই গাছে লাগল এটাও।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে সময় নষ্ট করলাম না, ঢুকে পড়লাম জঙ্গলের ভেতর। লোকটা এখন আর আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু জানি সদলবলে ওরাও ঢুকবে জঙ্গলে। ছোটার গতি ঠিক রেখে আর বোধহয় মিনিট দুয়েক কাটিয়েছি, এই সময় যমদূতের মত সামনের পথ রোধ করে দাঁড়াল দুই মানুষ সমান উঁচু একটা পাঁচিল। হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে চলে এলাম বাঁচতে হলে থামা চলবে না, কাজেই পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে ছুটতে লাগলাম কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে বলতে পারব না, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি আর ছুটছি না ফেললেই মাটিতে আঠার মত আটকে যাচ্ছে পা। অনেক কষ্টে যদি বা তুলছি, লোহার মত ভারী লাগছে জুতো। সামনে খানিকটা ভেঙে আছে পাঁচিল, কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে পারব কিনা সন্দেহ। এই সময় গলার আওয়াজ পেলাম পিছনে। পাঁচিল ঘেঁষে ছুটে আসছে ওরাও।

এখন যদি তাড়াহুড়ো করি, নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব ওদের হাতে। জানি, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে ওরা, কিন্তু পাঁচিলের ভাঙা অংশটার দিকে না গিয়ে একটা গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। শুকনো একটা ডাল তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়লাম সামনের দিকে, হাঁটু ভাঁজ করে ওপর দিকে তুললাম একটা জুতোর তলা। ডালের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি পরিষ্কার করতে মূল্যবান কয়েকটা সেকেন্ড বেরিয়ে গেল। কাজটা সম্পূর্ণ করলাম না, চলনসই মনে হতেই আবার ছুটতে শুরু করলাম। ফাঁকটা দিয়ে পাঁচিলের ওপারে একটা পা ফেলেছি, পিছন থেকে একসাথে চিৎকার এবং গুলি হলো। শরীরের পাশে, পাঁচিলের গায়ে লাগল বুলেট। কতটা পিছনে ওরা, জানার চেষ্টা করলাম না। পাঁচিল পেরিয়ে এসে ছুটতে শুরু করলাম আবার। এর মধ্যে কতবার যে আছাড় খেয়ে পড়লাম তার লেখাজোখা নেই। একবার তো একটা ঢাল গড়িয়ে ঝপাৎ করে গিয়ে পড়লাম ডোবার মধ্যে। স্বচ্ছ পানি। পকেট থেকে পেইনকিলার চারটে ট্যাবলেট বের করে পুরে দিলাম মুখে। আঁজলা ভরে পানি খেলাম। ধরা পড়ি পড়ব, কিন্তু এখন আমার বিশ্রাম দরকার!—এই রকম একটা জেদ চেপে গেল। কিন্তু খানিক পর ওদের আওয়াজ পেয়ে ঢাল বেয়ে উঠে আবার অন্ধের মত ছুটতে শুরু করলাম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এর মধ্যে বেশ কয়েক বার মিনি কান্না কেঁদে নিয়েছি আমি। ঠিক ভয়ে, তা নয়। আসলে সাংঘাতিক কষ্ট হচ্ছিল আমার। পায়ের ব্যথাটা মাথায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। এমন হাঁপাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল ছাতি ফেটে যাবে।

আরও প্রায় আধ মাইলটাক পেরোলাম। সরু একটা পায়ে চলা পথ দেখে মনে মনে একটু আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু পথটা দু'দিকে চলে গেছে, সব পথই তাই যায়, কিন্তু আমি যাব কোন্ দিকে? এতক্ষণ ডান দিকে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম বাঁ দিকে যাওয়াই উচিত হবে। পথের শেষে কিছু না কিছু একটা থাকেই, সেই আশা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু খানিক পরই বুঝলাম, আর সব রাস্তার মত নয় এটা। ডানদিকে কি আছে জানি না, কিন্তু বাঁ দিকে আবার জঙ্গল। একশো গজের মত এগিয়েছি, দেখি সামনে হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে পথ। আবার আমি জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি।

পথটা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে এসে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। গায়ে আর বল নেই। পায়ের ক্ষতটা দপ দপ করছে। ভীষণ, ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি। তার ওপর, জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেছি আমি।

অনেকক্ষণ ওদের আর কোন আওয়াজ পেলাম না। ইতিমধ্যে বিশ্রামের ফলে আবার একটু দম ফিরে পেয়েছি। যখনই হোক, জঙ্গল থেকে বেরুতে তো হবে, কাজেই আবার আমি হাঁটতে শুরু করলাম। পথের শেষে কিছু যখন পেলাম না, দেখি জঙ্গলের শেষে কিছু আছে কিনা, সেই বাঁ দিক ধরেই এগোলাম। প্রায় সিকি মাইল এগোবার পর লক্ষ করলাম, হালকা হয়ে আসছে জঙ্গল।

মিনিট দুয়েক পর কিনারায় এসে থামলাম। সামনে, ডানে, বাঁয়ে—তিন দিকেই ফাঁকা মাঠ। দেখে ভয় ভয়ই করল। খোলা জায়গায় বেরুলেই হয়তো ওদের চোখে ধরা পড়ে যাব। কে জানে, ওরাও হয়তো আমার মত কিনারায় দাঁড়িয়ে ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরুতে হলে ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হবে। বুকে সাহস বেঁধে পড়লাম বেরিয়ে। মাঠের অর্ধেকটা পেরিয়েছি, এই সময় পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। আবার আমি ছুটলাম। সামনে কাঁটাতারের বেড়া প্রথমবারের চেষ্টায় সেটা টপকাতে পারলাম না। দ্বিতীয়...

হাত তুলল রানা। 'বাকিটুকু আমি নিজেই দেখেছি।' দ্বিতীয়...

ভাবছে রানা। ড. জন এডওয়ার্ডস তার অদ্ভুত গল্প শেষ করল, কিন্তু বোঝা গেল না কিছুই। লোকটা যে বুদ্ধিমান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে? পাগল ইন্টেলেকচুয়াল? ওয়েটারকে ডেকে আরেক প্রস্থ কফি চাওয়া হলো। শর্তটা ডাক্তারই দিয়েছিল, মন্তব্য করা চলবে না, তা সত্ত্বেও চেহারায় একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে, রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। কিন্তু রানা তাকে সম্পূর্ণ নিরাশই করল। একেবারে চুপ।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে এডওয়ার্ডসের দিকে তাকাল ও। 'এখন আপনি কি করবেন বলে ভাবছেন?'

'জানি না।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল এডওয়ার্ডস।

'মেরীকে খবর দেবার কথা ছিল, মনে আছে?'

'ও, হ্যাঁ,' ঘাড় ফিরিয়ে রেস্তোরাঁর দরজার কাছে ফোন বুথটার দিকে তাকাল এডওয়ার্ডস। তারপর উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'কি বলবেন ওকে?'

'খবরটা দিই আগে। দেখি কি প্রতিক্রিয়া হয়।' চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল এডওয়ার্ডসের। 'হয়তো আমাকেই খুনী ভেবে বসবে মেয়েটা সব বুঝিয়ে বলার জন্যে ওকে এখানে আসতে বলা কি উচিত হবে?'

'আপনার ভয়, সাথে করে যদি পুলিস নিয়ে আসে?'

'ওর জায়গায় আমি হলে কি ঠিক তাই করতাম না?'

'সেটা নির্ভর করে গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব আপনি ওকে বোঝাতে পারবেন কিনা তার ওপর,' বলল রানা।

মাথা নিচু করে এগোল এডওয়ার্ডস। ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে উঠল রানার। কই, লোকটা তো খোঁড়াচ্ছে না! সোজা বুথের ভেতর ঢুকল এডওয়ার্ডস। ব্যাপার কি! সত্যিই ফোন করবে নাকি আবার?

ডায়াল করে ডাক্তার বলল, 'জন এডওয়ার্ডস। খারাপ খবর।'

'বলুন,' শান্ত গলায় বলল মেরী।

'প্রফেসরের বাড়িতে লোক ঢুকেছিল। তিনি মারা গেছেন।'

দু'সেকেন্ড কোন আওয়াজ নেই। তারপর, 'ওহ্ গড!'

'দুঃখিত,' বলল এডওয়ার্ডস। 'আমার কিছু করার ছিল না। আমি পৌঁছুবার আগেই মারা গেছেন তিনি। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে—বোধহয় রাতেই।'

'কে...কিভাবে...কেন?'

'জানি না। শুনুন, চিন্তা করে উত্তর দিন, কেউ তাঁর খোঁজ করেছিল? এমন কেউ যাকে আপনি চেনেন না?'

অভিযোগের সুরে, একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে উত্তর দিল মেরী লীডস। 'আপনি।'

'আমার খুন করবার প্রশ্নই ওঠে না। বললাম তো, কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছেন তিনি। কেউ খোঁজ করেছিল কিনা মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ, এই মিনিট কয়েক আগে,' গলার আওয়াজ স্বাভাবিক হয়ে আসছে মেরীর। 'ফোন করে বলল, ভুল করে প্রফেসর ওয়ার্ডকে একটা জিনিস পাঠিয়েছে সে। এনভেলাপে ভরা কিছু কাগজ…'

'তারপর?'

'জিজ্ঞেস করল, জিনিসটা ফেরত নেবার জন্যে এখানে আসবে কিনা।'

'নাম? নাম বলেছে?'

'আয়ান স্মিথ।'

'হ্যাঁ, আয়ান স্মিথই হবার কথা। শুনুন, মন দিয়ে শুনুন। পুলিসকে ফোন করে জানান, প্রফেসর মারা গেছেন। বলুন, আপনাকে হুমকি দেয়া হয়েছে, এবং আপনি আশঙ্কা করছেন কিছু লোক প্রফেসরের অফিস ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে। মোটকথা যেভাবে পারেন ওদেরকে অফিসে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। তারপর দেখা করুন আমার সাথে। আমি এখন…'

'আপনার সাথে দেখা করব? না!'

'শুনুন, প্লীজ, রিসিভার রাখবেন না।' উত্তেজিত গলায় বলল এডওয়ার্ডস। 'আপনি যেখানে বলবেন সেখানেই দেখা করব আপনার সাথে। যীশুর কিরে, কারও কোন ক্ষতি করার মানুষ নই আমি। আমি শুধু জানতে চাই, প্রফেসর খুন হলেন কেন? কেন আমাকেও ওরা খুন করতে চাইছে?'

মেরীর নিঃশ্বাস আটকে যাবার আওয়াজ পেল এডওয়ার্ডস। 'আপনাকে?'

'গতরাতে। আজ সকালে দু'বার। এবং এই কিছুক্ষণ আগে। এক ভদ্রলোকের দয়ায় কোনমতে পালিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু আমি জানি, আবার ওরা…'

'ঠিক আছে,' এডওয়ার্ডসকে অবাক করে দিয়ে বলল মেরী। 'দেখা করব আপনার সাথে। কোত্থেকে বলছেন আপনি?'

'কোন ভয় নেই আপনার,' আন্তরিক সুরে বলল এডওয়ার্ডস। রেস্তোরাঁর নাম এবং লোকেশনটা জানিয়ে দিল সে। 'প্রচুর লোক আছে এখানে।'

'রেস্তোরাঁটা আমার চেনা, ওখানে সবাইকে আমি চিনি,' বলে রিসিভার রেখে দিল মেরী লীডস।

টেবিলে ফিরে এসে মেরীর সাথে যা যা কথা হয়েছে সব রানাকে শোনাল এডওয়ার্ডস। মন দিয়ে শুনল বটে রানা, কিন্তু কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল।

'আপনার কি মনে হয়, পুলিস নিয়ে আসবে ও?' প্রায় মিনিট পাঁচেক গুম মেরে বসে থাকার পর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইল এডওয়ার্ডস।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

আরও দু'মিনিট পর রেস্তোরাঁর সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল মেরী লীডস। এডওয়ার্ডসকে দেখে এগিয়ে আসতে শুরু করল সে, কিন্তু টেবিলে আরেকজন বসে

রয়েছে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল. তারপর আবার এগোল বটে. কিন্তু এবার আগের চেয়ে ধীর ভঙ্গিতে, সতর্কতার সাথে। তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছে. মুখে পাউডার ইত্যাদি কিছু নেই। চোখ দুটো ভিজে না হলেও ফোলা ফোলা লাগল. কাঁদলে যেমন হয়, চেহারাটা থমথমে। এতক্ষণে চোখ দুটো ছোট হয়ে এল রানার তবে কি এতক্ষণ ডাক্তার যা শোনাল, সব সত্যি?

'আসুন, আসুন.' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এডওয়ার্ডস।

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মেরী। রানার দিকে তাকাল, তারপর ফিরল এডওয়ার্ডসের দিকে। 'আপনার সাথে ইনি···'

'ইনিই তো! ওঁর কথাই তো আপনাকে বললাম! ভদ্রলোক দয়া করে গাড়ি না থামালে এতক্ষণে আমার লাশ···'

'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন,' অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার জন্যে মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

এগিয়ে এসে খালি চেয়ারটায় বসল মেরী। মনে মনে মেয়েটার আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা না করে পারল না রানা। আর কেউ হলে এভাবে আসত বলে মনে হয় না।

কফির অর্ডার দিল এডওয়ার্ডস। কিন্তু সেটার জন্যে অপেক্ষা করল না মেরী।

জানতে চাইল, 'আপনি আসলে কে, ড. এডওয়ার্ডস? আপনার উদ্দেশ্য কি?'

'আমি একজন অতি সাধারণ ডাক্তার, বিশ্বাস করুন। খুন-খারাবি, রহস্য, এসবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।' পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে টেবিলের ওপর রাখল 'ওতে আমার আইডেনটিটি কার্ড আছে।'

কার্ডটা বের করে দেখল মেরী। 'কিন্তু তাহলে···? প্রফেসর মারা গেছেন? সত্যি?' গলাটা কেমন যেন বুজে এল।

'নিজের চোখে দেখে এসেছি। তাঁর বাড়িতে, চেয়ারে বসা অবস্থায়।'

'কিভাবে মারা গেছেন তিনি, ডক্টর?'

'তা বলতে পারব না ভায়োলেন্সের কোন প্রমাণ পাইনি।'

মেরীর চোখের কোণে টলমল করে উঠল দু'ফোঁটা পানি। 'বুড়ো হয়েছিলেন, সাতষট্টিতে পড়েছিলেন গতমাসে, হার্টের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের ছিল না···' গলাটা বুজে গেল। রানা এবং এডওয়ার্ডস দু'জনেই চোখ নামিয়ে নিল। একটু পরই নিজেকে সামলে নিতে পারল মেয়েটা তারপর আবার বলল, 'মৃত্যুর কারণটা বুঝতে পারেননি আপনি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল এডওয়ার্ডস। 'ময়না তদন্ত ছাড়া কিভাবে!' একটু থেমে আবার বলল, 'স্টাডি রুমটা সার্চ করা হয়েছে। কারা যেন···'

'সার্চ করা হয়েছে?' অবাক দেখাল মেরীকে।

মাথা ঝাঁকাল এডওয়ার্ডস।

'কিন্তু কেন? কি খুঁজছিল ওরা?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল এডওয়ার্ডস। বলল, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমি। প্রফেসর ওয়ার্ড কি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন?'

'অবশ্যই। নিজের ফিল্ডে তিনি একজন টপ ম্যান।' চেহারা এবং গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো অন্য কি যেন ভাবছে মেরী। 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, ড. এডওয়ার্ডস। এসবের মধ্যে আপনার কোন হাত নেই তা আমি বুঝব

কিভাবে?'

'প্রমাণ করার সাধ্য এবং সময় কোনটাই নেই আমার,' বলল এডওয়ার্ডস 'শুধু জানি, আমার মত আপনিও এর সাথে জড়িয়ে পড়েছেন বললাম "এর" সাথে, কিন্তু আসলে কিসের সাথে, তাও আমি জানি না'

চোখে পরিষ্কার সন্দেহ নিয়ে এডওয়ার্ডসের দিকে তাকাল মেরী

'কাল রাতে আমার গাড়িটাকে উল্টে ফেলে থামাতে চেয়েছিল কেউ পারেনি, তাই গুলি করেছিল। আজ সকালে ছুরি নিয়ে হামলা করে একজন লোক তারপরই একদল লোক গোটা নিউ ইয়র্কে ধাওয়া করে বেড়িয়েছে আমাকে। কবার গুলি করেছে, গুণে রাখিনি। এখনও যে বেঁচে আছি, এটাই আশ্চর্য। ওদেরকে দেখে প্রফেসর ওয়ার্ডের গাড়ি থেকে জঙ্গলে পালাই আমি।' পকেট থেকে বুকলেটটা বের করে মেরীর দিকে বাড়িয়ে ধরল সে 'এর কোন অর্থ বলতে পারেন কিনা দেখুন তো?'

বুকলেটটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল মেরী তারপর মাথা নাড়ল। 'রাশিয়ান, তাই না?'

'আমিও ওইটুকু জানি, রাশিয়ান। বলতে পারেন, রাশিয়ার সাথে প্রফেসরের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা?'

চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল মেরীর। 'কি বলছেন! কোন সম্পর্কই ছিল না।'

'ঠিক জানেন?'

'নিশ্চয়ই জানি! আপনি নিশ্চয় সন্দেহ করছেন না যে প্রফেসর ওয়ার্ড একজন...'

'একজন... কি?'

'তিনি রাশিয়ার হয়ে কাজ করতেন, এই-ধরনের কিছু বলতে চাইছেন নাকি, ড. এডওয়ার্ডস?' রেগেমেগে জানতে চাইল মেরী।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বুকলেটটা ইঙ্গিতে দেখাল এডওয়ার্ডস 'কাল ওটা পিয়ন দিয়ে গেছে, তারপর থেকেই শুরু হয়েছে এসব।'

'যতদূর বুঝতে পারছি, এটা একটা অ্যাকাডেমিক পেপার,' বলল মেরী। 'অনেক দেশ থেকেই তাঁর কাছে এ-ধরনের পেপার পাঠানো হয়

'রাশিয়া থেকে?'

মাথা ঝাঁকাল মেরী। 'হ্যাঁ। মাঝে মধ্যে

'কার কাছ থেকে? কেন?'

চুপচাপ ওদের কথা শুনছে রানা। দু'জনকেই লক্ষ করছে ও, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই কি ভাবছে না ভাবছে।

'তথ্য বিনিময়ের প্রোগ্রামের আওতায় আসত ওগুলো,' বলল মেরী

'আমি জানতে চাইছি, পাঠাত কে? রাশিয়ার কোন প্রতিষ্ঠান, নাকি ব্যক্তি?'

'জিয়োগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট এবং ইন্সটিটিউট। কিংবা এই ধরনের আর কোন প্রতিষ্ঠান।'

'এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পেপার,' বলল এডওয়ার্ডস 'হাইড্রো ইলেকট্রিক স্কীমের ওপর। কিছু অর্থ করতে পারেন?'

একটু পর মাথা নাড়ল মেরী। 'না।' আবার মাথা নাড়ল সে। 'ইঞ্জিনিয়ারিং··· উঁহুঁ। তিনি একজন জিয়োগ্রাফার··· ছিলেন। যদিও এর আওতায় অনেক কিছুই পড়ে।'

'বন্ধু?' জানতে চাইল এডওয়ার্ডস। 'রাশিয়ায় তার কোন বন্ধু ছিল?'

'উঁহুঁ। দেশেই খুব কম লোকের সাথে মেলামেশা করতেন তিনি। রাশিয়ায় অবশ্য বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল। কনফারেন্স। বা ওই ধরনের কিছু। তবে, যতদূর জানা আছে, এক ভদ্রলোকের সাথে তাঁর কাগজপত্র বিনিময় হত। ভদ্রলোক লেনিনগ্রাদে থাকেন। প্রফেসর সেসলভ আইজ্যাক। শুনেছি, ভদ্রলোক রাশিয়ান নন।'

সবার অজান্তে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার।

'রাশিয়ান নন মানে?'

নিজেকে সংশোধন করে নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল মেরী, 'না, মানে, এখন তিনি হয়তো রাশিয়ারই নাগরিক, কিন্তু আসলে তিনি যুগোশ্লাভিয়ার মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় ছিলেন, তারপর আর দেশে ফেরেননি।'

তেমন আগ্রহ দেখা গেল না এডওয়ার্ডসের। এনভেলাপে পোস্টমার্ক ছিল মস্কোর, মনে পড়ল তার। তবু জানতে চাইল, 'ভদ্রলোক সম্পর্কে আর কিছু জানেন?'

'সম্ভবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তিনি। অ্যাকাডেমিক অভ সায়েন্সের মেম্বার।'

'প্রফেসরের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক ছিল?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেরী। 'একবার রাশিয়ায় গিয়ে ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হয় প্রফেসরের। ভদ্রলোক নিউ ইয়র্কেও এসেছিলেন একবার, কিন্তু আমি তখন প্রফেসরের সাথে ছিলাম না। প্রফেসর মাঝে মধ্যে কাগজপত্র পাঠাতেন তাঁকে, সেই রকম তিনিও···'

'এক্সকিউজ মি.' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। টয়লেটের দিকে চলে গেল ও।

'কাজাকস্তানের হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম। এর সম্পর্কে উৎসাহ দেখাবার কোন কারণ ছিল কি প্রফেসর ওয়ার্ডের?' জানতে চাইল এডওয়ার্ডস।

'বুকলেটের বিষয় কি তাই?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হয় না। প্রায় সব ব্যাপারেই আগ্রহ ছিল তাঁর, কিন্তু···'

'ওটায় তারিখ দেয়া আছে উনিশশো সাতাত্তর।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল মেরী। 'তাহলে আমি বুঝতে পারছি না···'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল এডওয়ার্ডস, কিন্তু ওকে বাধা দিয়ে পিছন থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর বলল, 'আপনিই কি ড. জন এডওয়ার্ডস?'

আট

ঘাড় ফিরিয়েই চমকে উঠল এডওয়ার্ডস। বোকার মত তাকিয়ে থাকল একটা রিভলভারের ব্যারেলের দিকে। প্রকাণ্ড এক গরিলার হাতে ধরা। পাশেই ঠিক যেন যমজ ভাই দাঁড়িয়ে। দু'জনের পরনেই পুলিস ইউনিফর্ম।

'আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। আপনি ডক্টর জন এডওয়ার্ডস?'

'হ্যাঁ।'

মেরীর দিকে তাকাল পুলিস অফিসার। 'আপনি মেরী লীডস?'

মাথা ঝাঁকাল মেরী।

'গুড। চেয়ার ছাড়ুন। বাইরে চলুন।'

'হাতের ওটা সরিয়ে নিন,' মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল এডওয়ার্ডস।

'কেন?' এডওয়ার্ডসের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ল গরিলা পুলিস অফিসার। 'ভয় লাগছে?'

কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল এডওয়ার্ডস। তারপর জানতে চাইল, 'কেন, কোথায় যেতে হবে, বলবেন কি?'

রেস্তোরাঁ খালি হতে শুরু করেছে। পুলিসী হাঙ্গামায় কেউই জড়িয়ে পড়তে চায় না।

পাল্টা প্রশ্ন করল পুলিস অফিসার, 'এই খুনের পেছনে আপনার মোটিভ কি?'

'কি বলছেন?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল এডওয়ার্ডস। 'কাকে খুন করেছি আমি?'

'ন্যাকামি রাখুন!' ধমকের সুরে বলল অফিসার। 'আগে স্টেশনে চলুন, কাকে খুন করেছেন টের পাওয়াব। উঠুন!'

চেয়ার ছেড়ে নড়ল না এডওয়ার্ডস। 'না। আগে আমি আপনাদের অভিযোগটা জানতে চাই।'

'প্রফেসর এডওয়ার্ডকে খুন করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে!'

'আমি কাউকে খুন করিনি।'

'কি?' মেরীর সাথে কথা বলছে অফিসার। 'আপনিই তো আমাদের ফোন করেছেন। আধ ঘণ্টা আগে।'

'হ্যাঁ।'

'বলেছেন, প্রফেসর ওয়ার্ড মারা গেছেন, এবং কে যেন অফিসে ঢোকার হুমকি দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

মেরীকে থামিয়ে দিল পুলিস অফিসার। 'প্রফেসর যে মারা গেছেন তা আপনি জানলেন কিভাবে?'

এডওয়ার্ডসের দিকে তাকাল মেরী। 'ড. এডওয়ার্ডসের কাছ থেকে জেনেছি

আমি।'

'তিনি তো জানবেনই!' সবজান্তার ভাব করে মুচকি হাসল অফিসার। 'খুনীই তো জানবে…'

'না! তাঁকে আমি মরা অবস্থায় পেয়েছি!' বল্ল এডওয়ার্ডস। 'তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম…'

'হ্যাঁ। জানানো হয়েছে আমাদের। গত রাতে নীল রঙের একটা এম-জিতে চড়ে।' লাইসেন্স নাম্বারটা আওড়াল অফিসার। 'তারপর আজ আবার বিকেলে। এবার একটা শেভ্রলে নিয়ে।'

হঠাৎ সারা শরীর ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে এল এডওয়ার্ডসের। হতভম্ব হয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'মিথ্যে কথা! আমি…'

'এম-জি গাড়িটা আপনার?' প্রশ্ন করল অফিসার। একদৃষ্টিতে মেরীও তাকিয়ে আছে এডওয়ার্ডসের দিকে। চেহারায় গভীর সন্দেহ।

কথাটা অস্বীকার করে লাভ নেই, বুঝতে পারল এডওয়ার্ডস। লাইসেন্স নাম্বার নিশ্চয়ই চেক করেছে ওরা। 'হ্যাঁ।'

'কাজেই, আপনাকে পুলিস স্টেশনে যেতে হবে। উঠুন।'

'কিন্তু বললাম তো, আমি খুন করিনি!'

'সেটা কোর্টে বলবেন।'

মাথার পিছনে চুল ভিজে গেছে, অনুভব করল এডওয়ার্ডস। কথা বলতে গিয়ে গলায় জোর পেল না সে। 'আমার এম-জি নিউ ইয়র্কে। এখানে সেটা আসার প্রশ্নই ওঠে না!'

'ঠিক,' মুচকি হাসল অফিসার। 'সেজন্যেই তো এখানে দেখা গেছে সেটাকে। রাত তিনটের দিকে।' কৃত্রিম অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'বেশ, আপনার কথা সত্যি ধরে নিয়েই আলোচনা করা যাক। রাত তিনটের দিকে কোথায় ছিলেন আপনি?'

'আমি…' ইতস্তত করে থেমে গেল এডওয়ার্ডস। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ছিল সে, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। কিন্তু সেটা প্রমাণ করার কোন উপায় দেখল না। 'আমি বাড়িতে ছিলাম,' নিজের কানেই মিথ্যে অজুহাতের মত শোনাল কথাটা।

ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকল অফিসার, যেন এডওয়ার্ডসের জন্যে করুণা বোধ করছে সে। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, 'নিউ ইয়র্কের সাথে কথা হয়েছে আমার। ওখানের পুলিস এখনও চেক করে দেখছে সব। কিন্তু আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কেন, ড. এডওয়ার্ডস? প্রফেসরকে আপনি খুন করলেন কেন?'

'কি আশ্চর্য!' প্রায় চিৎকার করে বলল এডওয়ার্ডস। 'এক কথা বারবার বলছেন কেন! আমি কেন খুন করতে যাব? ভদ্রলোককে আমি চিনতামই না! গতরাতে আমি নিউ ইয়র্কে ছিলাম। নিমন্ত্রণ ছিল, ডিনার খেতে বেরিয়েছিলাম। ফিরে দেখি, আমার ঘর তছনছ করা হয়েছে। কথাটা সত্যি কিনা বুড়ো রয়কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারেন। আমাদের বিল্ডিঙের গার্ড যে…'

'কাকে কি জিজ্ঞেস করতে হবে না হবে আপনার চেয়ে ভাল জানি আমরা,'

গম্ভীর সুরে বলল অফিসার। 'অনেক সময় নষ্ট করেছেন, এবার উঠুন। নাকি জোর করে নিয়ে যেতে হবে?'

কিন্তু তবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না এডওয়ার্ডসের মধ্যে। দ্রুত ভাবছে সে, সব কথা খুলে বললেও কি গ্রেফতার এড়ানো যায় না? পুলিসকে তার ভারী ভয়। কোথায় যেন শুনেছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিসে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। কিন্তু যা যা ঘটেছে, ওর জন্যে সে-সব ভয়ঙ্কর হলেও, আর কাউকে বিশ্বাস করাবে সে কিভাবে? বুকলেটটা পকেট থেকে বের করে অফিসারকে যদি দেখানো হয়, যদি সব ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়, হয় ওকে পাগল নয়তো ধুরন্ধর চালবাজ ভাববে। আর ভাববেই বা না কেন? কোন কারণ নেই, হঠাৎ নিরীহ একজন লোকের ওপর হামলা হয়? এটা কি বিশ্বাস করার মত একটা ঘটনা? পুরানো একটা অ্যাকাডেমিক পেপার। ওটা থেকে কোন অর্থ বের করা সম্ভব? হয়তো সম্ভব, কিন্তু এখনই নয়। আরও সময় দরকার, তাহলে হয়তো এই রহস্যের কোন সূত্র তার নাগালের মধ্যে আসতে পারে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে কোনভাবেই তার গ্রেফতার হওয়া চলে না। কিন্তু পুলিসকে সে এ-সব কথা বোঝাবে কিভাবে?

অত্যন্ত শান্ত কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বলল এডওয়ার্ডস, 'আমার কথা বিশ্বাস করলে ভাল করবেন, অফিসার। আবারও বলছি, আমি কাউকে খুন করিনি। আমাকে গ্রেফতার করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রফেসরের অফিসটা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা।'

'হুঁ।' মেরীর দিকে ফিরল অফিসার। 'কথাটা সত্যি নাকি? অফিসে ঢোকার হুমকি দিয়েছে কেউ?'

'না,' বলল মেরী। 'ডক্টর এডওয়ার্ডস আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন...'

বাঁকা হাসিটা অফিসারের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। 'আগেই সন্দেহ করেছি!'

'ঘটনার মধ্যে এইটুকু ঘটেছে,' আবার বলল মেরী, 'একজন লোক ফোন করে আমাকে, বলে, ভুল করে একটা জিনিস প্রফেসরের নামে পাঠিয়েছে, সেটা ফেরত পেতে চায়।'

দুম করে টেবিলে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল এডওয়ার্ডস। 'ওই অফিসে এখুনি পাহারা বসানো দরকার! ওরা ওখানে ঢোকার চেষ্টা করবে।'

অফিসার কানেই তুলল না কথাটা। জানতে চাইল, 'আপনি তাকে কি বলেছেন, মিস?'

'বলেছি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে, তারপর দেখব কি করা যায়।'

'গুড।' ঝুঁকে এডওয়ার্ডসের একটা হাত ধরল অফিসার। 'অনেক হয়েছে। এবার আপনাকে যেতে হবে।'

সটান উঠে দাঁড়াল এডওয়ার্ডস। 'হাত ছাড়ুন।' ঝাঁকি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। 'ওয়ারেন্ট দেখান, তা নাহলে আপনাদের সাথে কোথাও যাব না আমি!'

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে নিঃশব্দে এডওয়ার্ডসের নাকের দিকে ধরল অফিসার।

কাগজটায় চোখ বুলাল এডওয়ার্ডস। সাথে সাথে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। কিন্তু পরমুহূর্তে চিৎকার করে বলল সে, 'আমার ওপর অন্যায় করা হচ্ছে! ট্যাক্স দিয়ে এই জন্যেই কি পুলিস পুষি আমরা? নিরীহ লোককে হয়রানি করার জন্যেই কি আছেন আপনারা? আমাকে গ্রেফতার করলে খুনীকেই সাহায্য করা হবে...'

অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাশে দাঁড়ানো সহকারী অফিসারের দিকে তাকাল গরিলা অফিসার। সহকারী পকেট থেকে হ্যান্ডকাফ বের করে পরিয়ে দিল এডওয়ার্ডসের হাতে। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল এডওয়ার্ডস নিজের হাতের দিকে।

'এক্সকিউজ মি,' পুলিস অফিসারের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। টয়লেট থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছে ও। এক ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কথাবার্তা সবই শুনেছে। 'অফিসার,' শান্ত, নরম সুরে বলল আবার, 'আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'কি অনুরোধ?' ভুরু কুঁচকে রানার আপাদমস্তক দেখে নিল অফিসার। 'কে আপনি?'

একটা প্রশ্ন এড়িয়ে গেল রানা। বলল, 'ড. এডওয়ার্ডসের বাঁ পা-টা একটু দেখতে চাই আমি। ট্রাউজারটা একটু তুলতে বলবেন?'

অফিসার না বুঝলেও, অনুরোধের তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধে হলো না এডওয়ার্ডসের। সাথে সাথে ট্রাউজারের পায়া হাঁটুর ওপর তুলে ঘুরে দাঁড়াল ও। ইঞ্চি চারেক একটা ক্ষত দেখতে পেল রানা পরিষ্কার। টেপ সরে গিয়ে অনেকটাই উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে।

অফিসারের দিকে ফিরল রানা। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে খুলল। পাসপোর্ট এবং নিজের পরিচয়-পত্রটা মেলে ধরল অফিসারের সামনে।

'বাংলাদেশী...মাসুদ রানা...রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সীর চীফ...' বিড় বিড় করে পড়ল অফিসার। 'হুঁ। তো কি? আপনার নাক গলাবার কারণ, মি. রানা?'

'একদল খুনীর হাত থেকে ডক্টর এডওয়ার্ডসকে বাঁচিয়েছি আমি,' বলল রানা। 'তারপর ওঁর মুখ থেকে সম্পূর্ণ ঘটনাও শুনেছি। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করিনি এতক্ষণ, কিন্তু এখন আমি মনে করি, ডক্টর এডওয়ার্ডস মিথ্যে কথা বলছেন না। প্রফেসরকে তিনি খুন করেননি। তাঁকে যারা খুন করেছে তারা ওঁকেও খুন করতে চাইছে।'

'কাজেই?' রানাকে যেন উৎসাহিত করতে চাইল অফিসার।

'কাজেই ওঁকে গ্রেফতার করলে ভুল করবেন আপনি,' শান্ত গলায় বলল রানা 'আপনি চাইলে আমি ওঁর জামিন হতে পারি। থানায় নিয়ে যেতে চাইছেন, চলুন, কিন্তু আপনি যদি বলেন আমার জামিনে ওকে ছেড়ে দেবেন তাহলে আপনাদের সাথে আমিও যেতে পারি।'

'একজন বিদেশীর তুলনায় আপনার আচরণ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল অফিসার। 'বেকায়দায় পড়লে আপনার জামিন কে হবে তার নেই ঠিক, আর আপনি একজন খুনীর জামিন হতে চাইছেন!

হাসালেন দেখছি!'

'চীফ অভ পুলিস মি. উইলিয়াম ওয়ারেনকে একটা ফোন করে জিজ্ঞেস করুন,' বলল রানা, 'আমি বেকায়দায় পড়লে আমার জামিন কে হবে বলতে পারবেন তিনি।'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করতে দেখা গেল অফিসারকে। কিন্তু তারপরই তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল সে। 'চীফ অভ পুলিসের নাম আজকাল অনেকেই এভাবে ব্যবহার করছে। এসবে আমরা কান দিই না।' এডওয়ার্ডসের দিকে তাকাল সে। 'আপনার আশান্বিত হবার কোন কারণ নেই। চলুন।'

কোনরকম উত্তেজনার ভাব দেখা গেল না রানার মধ্যে। শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'আমি কি ধরে নেব আমার অনুরোধ আপনি রাখছেন না?'

হঠাৎ রুখে দাঁড়াল অফিসার। 'কাজের মধ্যে বাধা দেবেন না, সাহেব। বেশি কথা বললে আপনাকেও...' কি ভেবে কথাটা শেষ করল না অফিসার।

এডওয়ার্ডসের দিকে তাকাল রানা। 'ঠিক আছে, ড. এডওয়ার্ডস, আপনি যান। কোন চিন্তা নেই। আধ ঘণ্টার মধ্যে ছাড়িয়ে আনব আপনাকে। কথা দিলাম।' বলে আর দাঁড়াল না রানা। হন হন করে এগিয়ে গেল ফোন বুদের দিকে।

'হুঁহ্,' রানার গমন পথের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সাথে আওয়াজটা করল অফিসার। এডওয়ার্ডসকে নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। ওদের সাথে মেরীকেও যেতে হলো।

বুদের ভেতর ফোনে কথা বলছে রানা।

নয়

পুলিস স্টেশনের উঠানে থামল কার। গরিলা দু'জন সারা পথ একটাও কথা বলেনি এডওয়ার্ডসের সাথে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি, হাসি, এমন কি বসার ভঙ্গিতেও প্রকট হয়ে ফুটে ছিল হুমকি। কার থেকে নামানো হলো এডওয়ার্ডসকে। বড় একটা কামরায় ঢোকানো হলো, সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটা ছোট কামরায়। এটায় না আছে জানালা, একটা মাত্র চেয়ার ছাড়া না আছে কোন ফার্নিচার। এবারও সেই প্রথম অফিসার জেরা করল এডওয়ার্ডসকে। তবে, এবার প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো লিখে ফেলা হলো। আসল প্রশ্ন সেই একটাই—খুন করার পিছনে তার মোটিভ কি?

বিশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল ওরা। এডওয়ার্ডসেব সেই একই কথা, সে খুন করেনি। ছোট কামরাটা থেকে এবার তাকে সেলে নিয়ে যাওয়া হলো। অফিসাররা ফিরে যাচ্ছে, পিছু ডেকে মেরী কোথায় জানতে চাইল সে। জবাব পেল, মেরীকে তার অফিসে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

পুলিস কারে চড়ার পর থেকে সেই যুবকের কথা মন থেকে সরাতে পারছে না এডওয়ার্ডস। বয়সে তরুণ, চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞের ছাপ, অথচ বিদেশী! সে যদি গাড়ি না থামাত...ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল। কিন্তু তাকে যা বলল তার মানেটা

কি? আধঘণ্টার মধ্যে তাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে! দূর, তা কি ভাবে সম্ভব! রিস্টওয়াচ দেখল এডওয়ার্ডস। আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কই! আসলে রাগের মাথায় কথাটা বলেছে লোকটা। হয়তো ভেবেছিল তার এই কথা শুনে ওকে ছেড়ে দেবে পুলিস। আসলে এখন আর কারও সাধ্য নেই পুলিসের খপ্পর থেকে ওকে উদ্ধার করে।

আরও বিশ মিনিট কাটল। সেলের ভেতর পায়চারি শুরু করল এডওয়ার্ডস। ধরেই নিয়েছে, বিদেশী যুবক মাসুদ রানা তাকে উদ্ধার করতে আসছে না। কিন্তু তবু কেন যেন নিজের অজান্তেই ক্ষীণ একটু আশার কাঁপন জাগছে বুকে। বার বার মনে হচ্ছে, ফালতু কথার মানুষ নয় সে। মনে হচ্ছে, আর সবার সাথে তাকে এক করে দেখা বোকামি হয়ে যাবে।

আরও দশ মিনিট কেটে গেল। প্রথম অফিসারের সাথে সেলে ঢুকল একজন ডিটেকটিভ। ছোট ঘরটায় আবার নিয়ে যাওয়া হলো এডওয়ার্ডসকে। অনুরোধ করায় চেয়ারটায় বসল ও। অস্বাভাবিক শক্ত লাগল সেটা।

'আপনার পেশা?' ডিটেকটিভ জেরা শুরু করল।

'ডাক্তারী।'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব, বলুন তো, ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকশন দেয়াটা কি খুব সহজ কাজ?'

অবাক হয়ে ভাবল এডওয়ার্ডস, এ-ধরনের প্রশ্ন করার মানে কি? 'উঁহুঁ, সহজ নয়।'

'বিশেষ দক্ষতা, সূক্ষ্ম নিপুণতা ইত্যাদি দরকার হয়?'

'না,' বলল এডওয়ার্ডস। 'শিরাটা খুঁজে পেতে হয়।'

ডিটেকটিভের চেহারা বদলে যেতে দেখে পরিষ্কার বুঝল এডওয়ার্ডস, খবরটা ডিটেকটিভের জন্যে সু, তারমানে তার জন্যে কু।

'ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়ে গেছি আমরা,' বলল ডিটেকটিভ। 'আপনিই বলুন, কিভাবে মারা গেছেন প্রফেসর ওয়ার্ড?'

'আমি জানি না।'

'খোদার দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় পাপ খুন,' গম্ভীর সুরে বলল গরিলা অফিসার। 'কিন্তু মিথ্যে কথা বলাও কম বড় পাপ নয়!'

চুপ করে থাকল এডওয়ার্ডস।

'প্রফেসরকে লং-অ্যাকটিং ইনসুলিনের একটা ম্যাসিভ ডোজ দিয়ে খুন করা হয়েছে। ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকশন।'

হঠাৎ শিউরে উঠল এডওয়ার্ডস।

'কাজেই আমরা ধরে নিচ্ছি, খুনটা আপনিই করেছেন।'

'কেন?'

'সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন! মোটিভটা আমরাও জানতে পারব, হয়তো কিছু সময় লাগবে। কিভাবে কি করেছেন, বলছি।' শরীরের ভার এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপাল ডিটেকটিভ প্রবর। 'আপনি রিপোর্ট করলেন, অ্যাপার্টমেন্টে চোর ঢুকেছিল। এতে করে আপনি যে মাঝরাতের পর নিউ ইয়র্কে

ছিলেন সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তারপর আপনি গাড়ি চালিয়ে এখানে চলে আসেন, প্রফেসরকে ইঞ্জেকশন দেন, এবং ফিরে যান নিউ ইয়র্কে। আজ আবার আপনি এখানে আসেন, ভাব দেখান প্রফেসর ওয়ার্ডকে আপনি চেনেন না, তাঁর বাড়িতে যান, লাশটা দেখেন, এবং ফোন করে মিস মেরীকে জানান, কেউ আপনাকে খুন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আপনার জন্যে দুঃসংবাদ হলো, একজন লোক রাত চারটের দিকে আমাদের ফোন করে জানায়, প্রফেসরের বাড়ির আশপাশে একটা গাড়িকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। পুলিস দেখেই পালায় গাড়িটা—কিন্তু নাম্বার টুকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সেটা আপনার গাড়ি, এম-জি। ড. এডওয়ার্ডস, এটা নিউ ইয়র্ক নয়—অত রাতে রাস্তায় একটা গাড়িকে ঘুর ঘুর করতে দেখলে মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দেয়।'

ষড়যন্ত্রটা সুন্দর, নিখুঁত ভাবে পাকানো হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না এডওয়ার্ডসের। প্রফেসরকে খুন করে, চারটের সময়, ফোন করে তার এম-জির কথা পুলিসকে জানানো—একটা বুদ্ধিদীপ্ত আইডিয়া। উপলব্ধি করল, আজ সকালে ওরা যদি তাকে নিউ ইয়র্কে খুন করতে পারত, তাহলেও প্রফেসরের খুনের দায় চাপত তার ঘাড়ে। কিন্তু আজ সকালে তাকে ওরা খুন করতে না পারলে কি হবে, তাদের কাজটা পুলিসই এখন করতে চাইছে।

বিপদের গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে টের পেলেও, একেবারে যে দিশেহারা হয়ে পড়ল এডওয়ার্ডস, তা নয়। যুক্তির ধাপ সাজিয়ে এখনও সে চিন্তা-ভাবনা করতে পারছে। সব কথা খুলে বলবে কিনা, আরেকবার ভেবে দেখল সে। কিন্তু জানে, লাভ নেই কোন, ডিটেকটিভ তার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। তবু আগাগোড়া সবই বলে গেল সে। মুখে বাঁকা হাসি নিয়ে শুনল ডিটেকটিভ। তার চেহারায় কৌতূহল বা আগ্রহের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। বুকলেটটাও তাকে বের করে দেখাল এডওয়ার্ডস। তাচ্ছিল্যের সাথে একবার খুলল বটে, কিন্তু তারপরই ভাঁজ করে রেখে দিল পকেটে।

সেলে ফিরিয়ে নেয়া হলো ওকে। তিক্ততার সাথে উপলব্ধি করল সে, শুনানী শুরু না হওয়া পর্যন্ত এখানেই তাকে থাকতে হবে। ভাল একজন উকিল কপালে জুটে গেলে সে হয়তো এম-জির লাইনিঙে ফুটোটা দেখিয়ে প্রমাণ করতে পারবে ওকে খুন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু ওই একটা ফুটো দেখে কি আর জুরীরা তাকে নির্দোষ বলে মনে করবে? হতাশায়, ভয়ে এই প্রথম অসুস্থ বোধ করল এডওয়ার্ডস। এক ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে পুলিস স্টেশনে এসেছে ও, এখন আর সেই যুবককে সে আশা করে না।

সব দিক বিবেচনা করে চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করল এডওয়ার্ডস।

সেলে ফিরে আসার পর দশ মিনিটও কাটেনি, আবার ওকে সেই ছোট্ট কামরায় নিয়ে আসা হলো। দুশ্চিন্তায় বদলে গেছে মুখের চেহারা, ক্লান্ত পা ফেলে ভেতরে ঢুকল সে, ধপ করে বসল চেয়ারটায়। গরিলার সাথে ডিটেকটিভ এবং আরও দু'জন লোককে ভেতরে ঢুকতে দেখল সে। একজনকে দেখতে পেল পরিষ্কার, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা তার ঠিক পিছনে থাকায় ভাল করে দেখতে পেল না। ঘরের ভেতর

আলোও খুব কম।
গরিলা এবং ডিটেকটিভ, দু'জনের চেহারাতেই কেমন যেন বেজার বেজার ভাব।
'ডক্টর এডওয়ার্ডস,' বলল ডিটেকটিভ, ইঙ্গিতে দেখাল একজন আগন্তুককে, 'ইনি মার্টিন কুপার। আপনার সাথে কথা বলতে চান।'
লোকটাকে ভাল করে দেখল এডওয়ার্ডস। বয়সে তরুণ, কিন্তু চেহারায় আশ্চর্য একটা কাঠিন্য আছে, যেন পেটানো লোহা। চোখ দুটো শান্ত, কিন্তু সতর্ক। পরনে দামী স্যুট। আঙুলে নিকোটিনের দাগ। সেই বিদেশী তরুণের সাথে কোথায় যেন মিল আছে এর।
এডওয়ার্ডসের দিকে চোখ রেখেই মার্টিন কুপার বলল, 'আপনারা এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কি মনে করে?' বলার স্বর এবং ভঙ্গি, দুটো থেকেই কর্তৃত্বের সুর বেরিয়ে এল।
'কিন্তু উনি আমাদের বন্দী,' তর্কে প্রবৃত্ত হলো ডিটেকটিভ। 'ল-ইয়ার ছাড়া আর কেউ এঁর সাথে একা কথা বলতে পারে না!'
'তাহলে সময় নষ্ট করুন। ফোন করুন ওয়াশিংটনে। ফোন করুন গভর্নরকে। কিন্তু চাকরি চলে গেলে আমাকে দুষতে পারবেন না!'
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল এডওয়ার্ডস মার্টিন কুপারের দিকে। কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। কুপারের পিছন থেকে দ্বিতীয় আগন্তুক বেরিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল। আরে! নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হলো না তার। এ যে সেই তরুণ, মাসুদ রানা! এসেছে তাহলে! সত্যিই কি এ পারবে তাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে? প্রবল সন্দেহে দুলতে শুরু করল মন।
ধমক খাওয়া অধঃস্তনের মত মাথা নিচু করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল গরিলা আর ডিটেকটিভ। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর এডওয়ার্ডসের সামনে এসে বলল, 'সময় মত আসতে পারিনি, সেজন্যে দুঃখিত, ড. এডওয়ার্ডস। এখন, মি. কুপার আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন।' বলে কুপারকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল ও।
এগিয়ে এসে এডওয়ার্ডসের সামনে দাঁড়াল কুপার। 'ওদের ধারণা, প্রফেসর ওয়ার্ডকে আপনি খুন করেছেন।'
'আপনি...আপনার পরিচয়?'
'গভর্নমেন্ট।'
কিছুই বুঝল না এডওয়ার্ডস। গভর্নমেন্ট বলতে কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টের র‍্যাটক্যাচার থেকে শুরু করে ইনল্যান্ড ব্যুরোর রেভিনিউ পর্যন্ত অনেক কিছু হতে পারে।
এডওয়ার্ডসকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার প্রশ্ন করল কুপার, 'এই রকম একটা জঘন্য কাজ কেন করলেন?'
'আমি খুন করিনি।'
'ওয়ার্ড সম্পর্কে কতটা কি জানেন আপনি?'
'সম্ভবত আপনার চেয়ে কম।'
'নিরীহ পাখি ফাঁদে পড়লে টের পাই আমরা,' বলল কুপার। 'সব কথা খুলে

বলুন আমাকে।'

নির্বাক দর্শকের মত বুকে হাত বেঁধে এক ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলে গেল এডওয়ার্ডস। গভীর মনোযোগের সাথে শুনল কুপার। তারপর জানতে চাইল সে, 'প্রফেসর ওয়ার্ডকে খোঁজাখুঁজি করছিলেন কেন?'

কারণটা বলল এডওয়ার্ডস। পুলিস স্টেশনে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে তাও জানাল।

'বুকলেটটা কোথায়?' জানতে চাইল কুপার।

'পুলিস নিয়ে গেছে।'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল কুপার। বলল, 'আসুন।'

দরজার সামনে থেমে কবাটে টোকা দিল কুপার। তার পিছনে এসে দাঁড়াল এডওয়ার্ডস। সবার পিছনে রানা। টোকা পড়ার সাথে সাথে, কোন বিরতি ছাড়াই, খুলে গেল দরজা। কুপারকে অনুসরণ করে ডিটেকটিভের অফিসে এসে ঢুকল ওরা।

ডিটেকটিভ এবং গরিলা, দু'জনেই অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করছে।

'ডক্টর এডওয়ার্ডসকে আমি নিয়ে যাচ্ছি,' আমি শব্দটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলল কুপার।

'কিন্তু আমরা তাকে খুনী সন্দেহে আটক করেছি!' প্রতিবাদের সুরে বলল ডিটেকটিভ। সুরটা প্রতিবাদের, কিন্তু তাতে তেমন জোর নেই।

কুপার বলল, 'সন্দেহ জমাট বাঁধলে ভদ্রলোককে আপনারা ফেরত পাবেন।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'কিন্তু জমাট বাঁধবে না।' এরপর বুকলেটটা ফেরত চাইল সে।

এডওয়ার্ডসকে নিয়ে উঠানে নেমে এল কুপার। এখানে রানার সামনে দাঁড়াল সে। 'দোস্ত, এবার তোমার বোঝা তুমি ঘাড়ে নাও। জরুরী কাজ ফেলে এসেছি সে তো তুমি জানোই।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'কাগজটা ঠিক করে রেখেছ তো?' জানতে চাইল কুপার। বিশেষ পরিচয়-পত্র দেয়া হয়েছে রানাকে, কোথাও কোন বাধা পেলে ওটা শুধু দেখাতে যা দেরি, সাথে সাথে আইন রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাবে ও।

'রেখেছি,' বলল রানা।

'তাহলে আর নয়,' বলল কুপার। মুচকি একটু হাসল সে। 'যতদূর বুঝতে পারছি, এটা একটা জটিল রহস্য। কিন্তু তদন্তের ব্যাপারে তোমাকে পরামর্শ দেব সে যোগ্যতা আমি রাখি না।' রানার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'আমি শুধু তোমার সাফল্য কামনা করতে পারি। ও, ভাল কথা, ফোন নাম্বার তো জানাই আছে তোমার, দরকার হলেই ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ কোরো। ডেভিড, নোলার, জ্যাকি অনেককেই পাবে ওখানে। তোমার সাথে ওরা আমার চেয়েও ঘনিষ্ঠ। আর যদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার দরকার হয়ে পড়ে, কি করতে হবে তাও তোমার জানা আছে…'

'সে-সব তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল রানা। 'তোমার সাথে আর

তাহলে দেখা হচ্ছে না?'

'কিভাবে? কি কাজে জড়িয়ে আছি সে তো তোমাকে বলেছি···' নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল কুপার। 'তবে তুমি কতদূর কি করতে পারলে না পারলে সে-খবর আমি সময় মত পেয়ে যাব।'

হ্যান্ডশেক করে গাড়িতে চড়ল কুপার। হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

এডওয়ার্ডসকে নিয়ে মার্সিডিজে চড়ল রানা। ওদেরকে এসকর্ট করে নিয়ে গেল একটা পুলিস কার।

সোজা ইউনিভার্সিটিতে চলে এল ওরা। সারাটা পথ সাইরেন বাজিয়ে এল পুলিস কার। ক্যাম্পাসে পৌঁছে মার্সিডিজ থেকে নামল রানা, হাত নেড়ে সামনে এগোতে বলল এডওয়ার্ডসকে, 'পথ দেখান।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল এডওয়ার্ডস। করিডর ধরে এগোল সে। থামল মেরী লীডসের অফিস কামরার সামনে। কিন্তু রানা কোন রকম ইতস্ততও করল না, থামলও না। দরজার দিকে মুখ করে ডেস্কে বসে আছে মেরী, থমথমে চেহারা, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। এডওয়ার্ডসকে দেখেই চমকে উঠল সে, ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। কিন্তু কাছে পিঠেই পুলিসের ইউনিফর্ম দেখে প্রাণ ফিরে পেল ধড়ে।

রানা বলল, 'প্রফেসর ওয়ার্ডকে ড. এডওয়ার্ডস নয়, আর কেউ খুন করেছে। আর কেউ ফোন করেছিল, বা এসেছিল?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মেরী।

'প্রফেসর তাঁর চিঠিপত্র কোথায় রাখতেন?'

এক সার ফাইলিং কেবিনেট দেখাল মেরী। 'ওখানে।'

কিন্তু সেদিকে রানা তাকালই না। 'তাঁর সব চিঠিপত্র আপনিই খুলতেন, আপনিই ফাইলে ভরতেন?'

'পার্সোন্যাল লেখা চিঠি ছাড়া সব।'

'পার্সোন্যাল চিঠি প্রচুর আসত?'

'না।'

হাত পাতল রানা। 'চাবি।'

কিন্তু মেরী লীডস ট্রেনিং পাওয়া প্রাইভেট সেক্রেটারি। রানার ভাব-গম্ভীর চেহারা, কর্তৃত্বসুলভ আচরণ সত্ত্বেও নিজের অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকল সে। নিজের চেয়ারে টান টান হয়ে বসেই থাকল, তারপর জানতে চাইল, 'আপনি চাবি চাওয়ার কে? কার প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি?'

'সরকারের।'

'আপনি কে?'

ওয়ালেট বের করে খুলল রানা। একটা কাগজ বের করে মেরীর চোখের নিচে ধরল। 'এতেও যদি সন্তুষ্ট না হন, ফোন নাম্বার তো দেখতেই পাচ্ছেন, যোগাযোগ করুন ওয়াশিংটনের সাথে।'

ব্যাগ খুলে চাবি বের করল মেরী।

'তবু ওই নাম্বারে ডায়াল করুন,' বলল রানা। 'বলুন, জন নোলারকে চাই।'

চাবির গোছাটা নাকের সামনে তুলে নাড়ল ও 'এতে কি ডেস্কের চাবিও আছে?'

'না। ডেস্কের চাবি তিনি নিজের সাথে রাখতেন।'

একজন পুলিসের দিকে ফিরল রানা। 'ওটা আমার চাই। মর্গ থেকে আনিয়ে দিন।'

পুলিসটা বেরিয়ে যেতেই ওয়াশিংটনের লাইন পাওয়া গেল। মেরীর হাত থেকে ফোনের রিসিভার নিল রানা। 'কে, নোলার?'

'হ্যাঁ, খানিক আগে কুপার ফোন করে জানাল, আমাকে নাকি দরকার হতে পারে তোমার। ব্যাপার কি, দোস্ত?'

'কাজের কথায় আসি, কেমন?' বলল রানা। 'আমার হাতে একটা রাশিয়ান অ্যাকাডেমিক পেপার রয়েছে। লেনিনগ্রাদের ইনস্টিটিউট অভ ইঞ্জিনিয়ারিং। ন'নম্বর পাতা নেই। টাইটেল—আউটলাইন অভ দি প্রবলেমস্ অভ হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই টু দি অ্যাকটিউবিন্সক রিজিয়ন অভ কাজাকস্তান। তারিখ, উনিশশো সাতাত্তর। খোঁজ নিয়ে দেখো, আর কোথাও এর কোন কপি আছে কিনা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আর কোথাও বলতে আমি ঠিক কি বুঝাতে চাইছি?'

'গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।'

'না। গোটা দুনিয়া। যদি থাকে, তার একটা ফটোস্ট্যাট কপি চাই আমি।'

রিসিভার রেখে দিল রানা।

ঠাট্টার সুরে বলল এডওয়ার্ডস, 'আপনি বোধহয় চীনা ভাষাও জানেন?'

কিন্তু রসিকতাটা পানিতে পড়ল, হাসল তো নাই-ই, এডওয়ার্ডসের দিকে ফিরেও তাকাল না রানা। এমনকি রিসিভার রেখে মুহূর্তের জন্যে বিরতি পর্যন্ত দিল না হাতটাকে, গোছা থেকে নির্দিষ্ট চাবিটা বেছে নিতে নিতে দুটো অফিস ঘরের মাঝখানের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তালা খুলে ঢুকল প্রফেসরের খাস কামরায়।

বড়সড় অফিস। চারদিকে বুক-শেলফ, ম্যাপ র‍্যাক, স্টোরেজ কেবিনেট। বিরাট, এবং ভারি সুন্দর একটা গ্লোব দেখল ওরা, যে-কোন মিউজিয়ামের গর্বের বস্তু হতে পারে। অফিসটা সার্চ করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

'বুকলেটটা নেবার জন্যে যার আসার কথা আছে, তার ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন, মি. রানা?' জানতে চাইল এডওয়ার্ডস।

'কেউ আসবে না।' অফিসের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে শুরু করল ও। কিন্তু এতে মন বসছে না। আসলে ডেস্কটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে।

একটু পরই আবার শোনা গেল সাইরেনের আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ড পর রানার হাতে ডেলিভারি দেয়া হলো চাবির গোছাটা। ডেস্কের সবগুলো দেরাজের তালা খুলল রানা। দেরাজগুলো কার্পেটের ওপর নামাল। তারপর প্রথম দেরাজের কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করল ও। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওর কাজ দেখতে লাগল এডওয়ার্ডস। একটু পর মুখ তুলে তাকাল রানা।

'হেলপ মি, প্লীজ, ডক্টর।'

'কি খুঁজছেন আপনি, মি. রানা?'

'জানি না। কিন্তু দেখলে চিনতে পারব আমরা।'

পাথরের নমুনা থেকে শুরু করে ম্যাগনেশিয়ার বোতল, কি নেই দেরাজগুলোয়? আর আছে রাশি রাশি কাগজ। ম্যাপিং পেন, রঙ-পেন্সিল, ড্রইং ইনস্ট্রুমেন্ট, ম্যাগনেট, এই রকম হাজারটা জিনিস মোটা একটা খাম পাওয়া গেল, ভেতরে একগাদা পুরানো কালের চিঠি। সবগুলো লিখেছে লুসি নামে এক মেয়ে। সেগুলো ঘেঁটে প্রেমিক ওয়ার্ডের পরিচয় জানা গেল। তখনও তিনি প্রফেসর হননি। এডওয়ার্ডসের হাত থেকে চিঠিগুলো নিল বটে রানা, কিন্তু সাথে সাথে সেগুলোর বয়স আন্দাজ করতে পেরে রেখে দিল এক পাশে।

ইদানীং কালে প্রফেসরকে লেখা কিছু চিঠিও পাওয়া গেল। কিন্তু এগুলো সবই বন্ধু এবং আত্মীয়দের লেখা। বব কেমন লেখাপড়া করছে, জেনির বিয়ের তারিখ, এই ধরনের তথ্য ছাড়া কিছু নেই।

আঁতিপাতি করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে ডেস্কের নিচের অংশটা দেখল রানা আক্ষরিক অর্থেই ডেস্কের ভেতর হারিয়ে গেছে যেন। খানিক পর হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্যুট থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মেরীকে বলল, 'কেবিনেট আর বইগুলো সার্চ করব আমরা।'

চোখ বড় করে একটা ঢোক গিলল মেরী, কিন্তু মুখ খুলল না, বোধহয় সাহসই পেল না বেচারী। ভাগ করে দেয়া হলো কাজ। ম্যাপ র‍্যাক আর কেবিনেটে কাজ শুরু করে দিল মেরী। নির্দিষ্ট একটা সিস্টেম ধরে বইগুলো সার্চ করতে শুরু করল রানা আর এডওয়ার্ডস। ওপরের শেলফ থেকে শুরু করল ওরা, ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামল। বইয়ের কোন সংখ্যা সীমা নেই, তাছাড়া কাজটা নোংরাও বটে। হাত না দিলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সব শেলফেই থাকে রাজ্যের ধুলো। নিজের কাজ শেষ করে দাঁড়িয়ে ছিল মেরী, দেখতে পেয়েই তার সাহায্য চেয়ে বসল রানা। একটানা ঘণ্টা দুয়েক কাজ করার পর মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইল এডওয়ার্ডসের। কিন্তু রানার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, এই মাত্র কাজে হাত দিল সে। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। মেশিন নাকি? তাজ্জব না হয়ে পারল না এডওয়ার্ডস এমনকি শোক-বিহ্বল মেরীও মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে।

প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে দেখল রানা। বাইন্ডিঙের ভেতর কোথাও কিছু থাকতে পারে, তাই প্রতিটি বাইন্ডিং আঙুল দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করল। বইয়ের এই সমুদ্রে কোথাও যদি কিছু থাকে, ওকে সেটা ফাঁকি দিতে পারবে না।

আরও চার ঘণ্টা, রাত দেড়টায়, মৃদু গলায় বলল মেরী, 'মি. রানা।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এডওয়ার্ডস। দেখল, রানার দিকে তিন শীট রাইটিং পেপার বাড়িয়ে ধরেছে মেরী। তার হাত থেকে কাগজগুলো ঠিক যে ছোঁ মেরে নিল রানা, তা নয় অবাক হয়ে লক্ষ করল এডওয়ার্ডস, উত্তেজনা বা আনন্দের একটু ছিটেও স্পর্শ করেনি রানাকে। কাগজগুলোয় দ্রুত, মাত্র একবার চোখ বুলাল রানা। বলল, 'গাড়িতে চলুন।'

দশ

দু'ঘণ্টা পর এডওয়ার্ডসকে নিয়ে ওয়াশিংটনে পৌঁছল রানা। সারা পথে ছ'টার বেশি শব্দ উচ্চারণ করেনি ও। চিঠি তিনটে বুকলেটের সাথে পকেটে ভরে তার সমস্ত মন-মানস তল্লাশীর কাজ থেকে তুলে নিয়ে আরোপ করল গাড়ি চালানোয়। প্রকাণ্ড মার্সিডিজ দ্রুত কিন্তু সাবলীল ভঙ্গিতে ছুটে চলল হাইওয়ে ধরে। এডওয়ার্ডস আবিষ্কার করল, রানা এমন একজন ড্রাইভার, যে স্পীড লিমিট অমান্য করে ঝড় তুলে ছুটলেও নিশ্চিন্তে সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজতে পারে আরোহী। দূরত্ব আর সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি, এবং তারপর যেন হঠাৎ করেই ম্লান, ঠাণ্ডা আকাশের গায়ে পিকচার পোস্টকার্ডের মত দেখা গেল ক্যাপিটল বিল্ডিং। পথে একবার মাত্র গাড়ি থামিয়েছে রানা। ওয়াশিংটনের জন নোলারের সাথে কথা বলেছে টেলিফোনে। কথা মানে দুটো শব্দ—আমরা আসছি।

টেলিভিশন দেখে আর থ্রিলার উপন্যাস পড়ে এডওয়ার্ডসের ধারণা ছিল, তার মত সাধারণ লোকের পক্ষে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর ধারে কাছেও ঘেঁষা সম্ভব নয়। সি-আই-এর প্রধান দফতর ঠিক কোথায়, তাও জানা ছিল না তার। অথচ রানার সাথে এসে দেখল, কোথাও কোন গোপনীয়তার বালাই নেই। বড় একটা দালান দেখল সে, তার কপালে প্রকাণ্ড হরফে লেখা রয়েছে সাইনবোর্ড—সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী। তারপর জানল, ফোন গাইডে সি-আই-এ-র নাম্বারও ছাপা আছে। যে-কেউ ইচ্ছে করলে যোগাযোগ করতে পারে।

কিন্তু কেউ যদি ভিতরে ঢুকতে চায়, অত্যন্ত সতর্ক তল্লাশীর সামনে পড়তে হবে তাকে। বিল্ডিঙের ভিতরও, বিশেষ বিশেষ জায়গায়, তিন বার থামানো হলো রানাকে। স্পেশাল কার্ড দেখাতে হলো ওকে। এবং প্রতিটি চেক পয়েন্টে খাতায় নিজের নাম ঠিকানা লিখে দিতে হলো এডওয়ার্ডসকে। এদিকে ফিরুন, ওদিকে তাকান—সিকিউরিটি অফিসাররা একের পর এক নির্দেশ দিল ওদের। অমন তিন ডজন ফটো তোলা হলো। অবশেষে মাঝারি আকারের একটা কনফারেন্স রূমে ঢুকল ওরা।

গোল একটা টেবিল, তার চার ধারে বারোটা চেয়ার। সিলিঙের কাছে, এবং চারদিকের দেয়াল জুড়ে আজব আকারের সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি একজন লোক অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। রানা তার সাথে এডওয়ার্ডসের পরিচয় করিয়ে দিল। 'নোলার, দোস্ত, কুপারের কাছে এই ডক্টর ভদ্রলোকের কথাই শুনেছ তুমি।' নোলার এবং এডওয়ার্ডস করমর্দন করল। সি-আই-এ বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে একজন কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হতে পেরে ঠিক ধন্য নয়, বিহ্বল হয়ে পড়ল ডাক্তার। জন নোলারকে মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকল সে। জানে, গোটা দুনিয়াকে তার শেষ গন্তব্যের দিকে এরাই গাইড করছে। রানার সাথে যেমন কুপারের মিল লক্ষ করেছিল সে, তেমনি প্রথম দু'জনের সাথে নোলারেরও চেহারা এবং

আচরণগত মিল লক্ষ করল। দেখল, নোলারের কব্জিতে বাঁধা রয়েছে একটা রোলেক্স রিস্টওয়াচ।

'বুকলেটের কোন কপি পেলে, জন?' জানতে চাইল রানা।

নোলার জানাল, পাওয়া যায়নি, তবে খোঁজ চলছে। 'কোথাও যদি থাকে,' বলল সে, 'পাওয়া যাবেই। কলম্বিয়ার কপিটা আমাদের আগেই হাতিয়ে নিয়েছে ওরা। কিন্তু কলম্বিয়ায় যদি থাকতে পারে, নিশ্চয়ই আরও কোথাও আছে।'

'ওরা কারা?' জানতে চাইল এডওয়ার্ডস।

চট করে নোলারের দিকে একবার তাকাল রানা। মুখে কিছু বলল না, শুধু চোখের পাতা জোড়া একবার নেমেই উঠে গেল।

মৃদু হেসে নোলার তাকাল এডওয়ার্ডসের দিকে। 'কে. জি. বি.।'

সারা শরীরে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল এডওয়ার্ডসের। কে. জি. বি. মানে রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা! তবে কি তার পিছনে ওরাই লেগেছে? কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল তার। সি. আই. এ, কে. জি. বি.…তার নিরুপদ্রব জীবনে এসব কেন? আন্তর্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তির সাথে তার কি সম্পর্ক? শেষ পর্যন্ত পৈত্রিক প্রাণটা না খোয়াতে হয় তাকে!

'কিন্তু কেন?' আবার জানতে চাইল সে।

আবার এডওয়ার্ডসের দিকে তাকাল নোলার। বোঝা গেল, কি উত্তর দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। শান্তভাবে বলল, 'কে জানে! বোধহয় কাগজটার কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমাদের হাতে পড়ুক, তা ওরা চায়নি।' মৃদু হাসল সে। 'কিছু খেতে পেলে ভাল হত, তাই না, ড. এডওয়ার্ডস?'

খানিক ইতস্তত করে এডওয়ার্ডস বলল, 'ধন্যবাদ।'

'মুরগীর রোস্ট?'

হ্যাঁ বলার আগেই এডওয়ার্ডসের মুখের ভেতরটা পানিতে ভরে গেল। ফোনের রিসিভার তুলে মুরগীর রোস্ট আর কফির অর্ডার দিল নোলার।

খেতে খেতে পুরো ঘটনাটা আরেকবার শোনাল এডওয়ার্ডস। তার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা আর নোলার। তারপরই দু'জন পালা করে শুরু করল প্রশ্ন বাণ।

অনেক প্রশ্নের উত্তর দিল এডওয়ার্ডস, কিন্তু বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরই জানা নেই তার। সে জানতে চাইল, 'চিঠিগুলো আমি কি পড়তে পারি?'

'না,' বলল নোলার। কিন্তু রানা, 'ক্ষতি কি!' বলায় চিঠিগুলো এডওয়ার্ডসের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

চিঠি তিনটে নয়, দুটো—তবে, একটা চিঠি বেশ বড়, দু'পাতায় লেখা। দুটোই হাতে লেখা চিঠি। প্রথমটা এই রকম:

মস্কো,
তেরোই মে, উনিশশো আটাত্তর

কমরেড প্রফেসর,

আমাদের দেখা হয়েছিল, আমার জন্যে সেটা একটা অতীব আনন্দময় অভিজ্ঞতা, সেই আনন্দ প্রকাশের জন্যেই এই চিঠি। অন্তরের অন্তস্তল থেকে

উপলব্ধি করেছি, আমাদের আলোচনাটা শুধু যে প্রেরণাদায়ক ছিল তাই নয়, সম্ভাব্য সব অর্থেই অত্যন্ত গঠনমূলকও হয়েছিল। এ-থেকে আরেকবার প্রমাণিত হলো আদর্শগত বিরোধ আছে এমন দুটো দেশেরও ব্যক্তি-মনের মিল সম্ভব।

কাস্পিয়ান সী-তে আমরা যে কাজ করেছি তার ওপর কিছু বলার জন্যে আমেরিকান জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমাকে, বুঝতে পারি, এই আমন্ত্রণের পিছনে আপনার হাত আছে। এজন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আগামী মাসে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে আপনার দেখা পাব, এই রোমাঞ্চকর আশায় থাকলাম। যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকেই আবার আমরা শুরু করব আলোচনাটা। ঠিক আছে?

প্রিয় ভাই,
আইজ্যাক সেসলভ।

'ইংরেজীটা ভাল,' মুখ তুলে বলল এডওয়ার্ডস।

'তিন বছর অক্সফোর্ড আর দু'বছর হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেছিলেন,' বলল নোলার।

দ্বিতীয় চিঠিটা পড়তে শুরু করল এডওয়ার্ডস।

মস্কো,
চোদ্দই মার্চ, উনিশশো বিরাশি

প্রিয় ওয়ার্ড,

তোমার শুভেচ্ছার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ। বলতে পারো আমার অবস্থা এখন একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে থেমে আছে। পথ্য-নির্দেশ মেনে চললে এবং সময় সময় শরীরটা ডাক্তারকে দিয়ে চেক করিয়ে নিলে আরও বহু বছর কাজ করতে পারব আমি।

অতিভোজন ব্যাপারটা অতি-খাটুনির মতই ক্ষতিকর—বদহজমের পরিণতি সম্পর্কে সবারই সতর্ক থাকা উচিত। মাঝেমধ্যে চাপ প্রতিহত করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে, পিছিয়ে দাঁড়াতে হয়, এবং খুব বেশি সরে যাওয়ার আগে চিন্তা করতে হয়।

প্রিন্সটনের কাছে তোমার বাড়িতে আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, সে-কথা এখনও আমি আনন্দের সাথে স্মরণ করি। বর্তমান দুনিয়া যতটুকু অনুমতি দেয় তারচেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে আমরা যদি কাজ করতে পারতাম, নিশ্চিতভাবে জানি, তার ফল সবার জন্যেই ভাল হত।

আশা করি আবার হয়তো আমাদের মধ্যে দেখা হবে। যদিও ভয় হয়, বর্তমানে আমার যা শারীরিক অবস্থা তাতে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আমেরিকান জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটিকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলো না। এবং জেনো, তোমাকে আমি প্রীতির সাথে স্মরণ করি।

আন্তরিক,
আইজ্যাক সেসলভ।

চিঠিগুলো নোলারের হাতে ফিরিয়ে দিল এডওয়ার্ডস। 'যাকে বলে মানিকজোড়!' বলল সে।

'কিন্তু চিঠিতে অনেক হেঁয়ালি আছে, সেগুলোর অর্থ কি?' নোলারের দিকে তাকাল রানা।

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলে নিল নোলার, কিছু শুনল, তারপর রেখে দিল রিসিভার। 'ইম্পিরিয়াল কলেজ, লন্ডনে একটা কপি পেয়েছে ওরা,' বলল সে। 'তার করে পাঠানো হচ্ছে।'

'গুড!' বলল রানা।

অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। তবে কপিটা পৌঁছতে খুব বেশি সময় নিল না। স্মার্ট এক যুবক ঢুকল কনফারেন্স রুমে, নোলারের হাতে একটা ফটোগ্রাফিক পেপার দিয়ে বেরিয়ে গেল আবার। সেটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল নোলার। 'রাশিয়ান।'

পড়তে শুরু করল রানা। খানিক পর জানতে চাইল নোলার, 'কিছু বোঝা গেল?'

'আর সব অ্যাকাডেমিক পেপারের মতই, যতদূর বুঝতে পারছি,' বলল রানা। 'মেগাওয়াটস্ এবং মোটিভ পাওয়ার...আগাগোড়া টেকনিক্যাল সাবজেক্ট। না...থামো, দেখি!'

'কি ব্যাপার, রানা?' শান্ত গলায় জানতে চাইল নোলার।

কয়েক সেকেন্ড কিছু না বলে মনোযোগ দিয়ে পড়ে গেল রানা, তারপর মুখ তুলে তাকাল। 'টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন টেকনিক সম্পর্কে এখানে একটা রেফারেন্স রয়েছে, অ্যাকাডেমিশিয়ান আইজ্যাক সেসলভের একটা গবেষণা এবং ভবিষ্যদ্বাণী।' শেষটুকু পর্যন্ত পড়ে গেল রানা। 'আর কিছু নেই।'

'শেষ পর্যন্ত তাহলে একটা পাত্তা পাওয়া গেল!' বলল নোলার। 'বুকলেটে শুধু যে সেসলভের নাম পাওয়া গেল তাই নয়, সেই সাথে জানা গেল তিনি একটা বিশেষ সাবজেক্টের ওপর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছেন।'

'কমরেড সেসলভ সম্পর্কে কি জানি আমরা?' প্রশ্ন করল রানা।

'দাঁড়াও, ইনফরমেশন শীটটা আনি,' বলে দ্রুত কামরার আরেকদিকে এগিয়ে গেল নোলার। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল, থামল একটা কীবোর্ড টার্মিন্যালের সামনে। সুইচ অন করে টেপ করতে শুরু করল সে। অবাক বিস্ময়ে দেখল এডওয়ার্ডস, পর্দার ওপারে আরও কয়েকটা ছোট কমপিউটার রয়েছে। টেপ করা শেষ হতেই মৃদু একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল, তারপর প্রিন্ট-আউট টার্মিন্যাল থেকে বেরিয়ে এল এক প্রস্থ কাগজ। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে টান দিয়ে কাগজটা ছাড়িয়ে নিল নোলার, দ্রুত ফিরে এল রানার সামনে। ফুলসক্যাপের চেয়ে একটু বেশি চওড়া কাগজটা। ছাপা। নোলারের হাত থেকে সেটা নিয়ে দ্রুত একবার চোখ বুলাল রানা, তারপর থ্রী-এম ওভারহেড প্রজেক্টরে ঢুকিয়ে দিল। সুইচ অন করতেই কামরার উল্টোদিকের স্ক্রীনে দেখা গেল টেপটা। ছাপা অক্ষরগুলো পরিষ্কার পড়তে পারল ওরা।

'নাম...অ্যাইজ্যাক সেসলভ।

জন্ম...উনিশশো বিশ।
জন্মস্থান... বেলগ্রেড, যুগোস্লাভিয়া।
লেখাপড়া...উনিশশো উনচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত মস্কো ইউনিভার্সিটিতে জিয়োগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা। ছেচল্লিশে ডক্টরেট লাভ। স্কলারশিপ নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন গমন, উনিশশো ছেচল্লিশ-উনপঞ্চাশ পর্যন্ত বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা। উনিশশো উনপঞ্চাশে যুক্তরাষ্ট্র গমন। উনিশশো একান্ন পর্যন্ত হার্ভার্ডে জিয়োলজি নিয়ে পড়াশোনা।
কোয়ালিফিকেশন...বায়োলজি, জিয়োলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং।
অন্যান্য তথ্য...উনিশশো একান্ন সালে রাশিয়ায় ফেরার পর তাঁকে বিস্মিত করে দিয়ে স্থায়ী সোভিয়েট নাগরিকত্ব দান করা হয়। পরের বছর মা এবং বাবার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও কাজের চাপে যুগোস্লাভিয়ায় ফিরে যেতে ব্যর্থ হন। উনিশশো পঞ্চান্ন সালে তাঁকে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার করা হয়। দু'বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের পর আবার তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায়। উনষাট সালে মস্কোয় ওশেনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন।
ওয়র সার্ভিস রেকর্ড স্পষ্ট নয়। তবে সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ ক্যাপ্টেন ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।
বাষট্টি সালে প্রবাসী এক যুগোস্লাভিয়ান বিজ্ঞানীর মেয়েকে বিয়ে করেন।
তেষট্টি সালে জিয়োগ্রাফিক স্টাডিজে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান। ওশেনোগ্রাফিক থিয়োরিস্ট, অ্যাডভোকেটস সী পাওয়ার। বিশ্বাস করা হয়, সোভিয়েত আর্কটিকে ভোরকুটা রিজিয়নে মিনারেল ফিল্ড ডেভেলপমেন্টে তাঁর একক অবদান আছে। ওখানে পাওয়া গেছে সোনা, হীরে, নিকেল, ইউরেনিয়াম, কয়লা। প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, ইচ্ছের বিরুদ্ধে চাপের সাহায্যে নয়, শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে রিক্রুটিঙের মাধ্যমে।
ফলে সরকার তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়।'

এরপর আইজ্যাক সেসলভের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা রিসার্চ পেপার তুলে দেয়া হয়েছে, এগুলো মস্কোয় ছাপা হয়েছিল। তারপর আবার তথ্য

'উনিশশো একান্নর পর সেসলভ আর মাত্র একবার যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। আমেরিকান জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে লেকচার দেন। বিষয় ছিল, নীড ডেভেলপমেন্ট সাউন্ড কম্যুনিকেশন চ্যানেলস সী ওয়াটার। প্রিন্সটনে প্রফেসর এডউইন ওয়ার্ডের অতিথি হিসেবে তিন দিন ছিলেন। ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অজ্ঞাত-কারণে স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পারেননি, সম্ভবত পাসপোর্ট যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। ফেরার সময় গ্রেট ব্রিটেনে যাত্রাবিরতি করেন। অক্সফোর্ডে ড. লিউগর নোলটনের অতিথি হিসেবে ছিলেন। ড. নোলটনের সাথে ছাত্র-জীবনে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।
উনিশশো একাশি সালে স্ত্রীকে হারান। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত। বার্লিন থেকে উনিশশো বিরাশির মে মাসে কে. জি. বি. ডিফেক্টর কর্নেল ওসিপভের দেয়া তথ্য: অজ্ঞাত কারণে গ্রেফতার হন সেসলভ, এবং গ্রেফতারের পর নিখোঁজ হয়ে গেছেন।

সোভিয়েত সরকারের অফিশিয়াল ঘোষণা: সেসলভ মারা গেছেন। মৃত্যুর তারিখ দেয়া হয়, এপ্রিল, উনিশশো বিরাশি। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করার খবর পরিবেশন করে তাস। মরণোত্তর পুরস্কার দেয়া হয় তাঁকে—হিরো অভ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন।'

'হায় যীশু!' কপাল চাপড়াল এডওয়ার্ডস।

শান্ত গলায় জানতে চাইল নোলার, 'কোথায় পৌঁছুলাম আমরা?'

'খুঁতখুঁত করছে মনটা,' বলল রানা। 'কোথায় যেন কি একটা পাকিয়ে উঠছে। আমি শিওর।'

'কারেক্ট!' সায় দিল নোলার। 'কনফারেন্স!' মাইকের সুইচ অন করে দ্রুত বলল সে। 'চলে এসো সবাই।'

দেখতে দেখতে দখল হয়ে গেল কনফারেন্স রুমের বারোটা চেয়ার। এডওয়ার্ডস ছাড়া আর সবার সাথে সবার চেহারায় না হলেও ভাবভঙ্গির অদ্ভুত মিল আছে। ভাবলেশহীন মুখ, চোখে সতর্ক দৃষ্টি, নড়াচড়ায় সংক্ষিপ্ত, সাবলীল, সপ্রতিভ ভাব। সবার পরনে গাঢ়রঙের স্যুট, সাদা টাই।

'ও. কে., জেন্টলমেন,' শুরু করল নোলার। 'একটা কিছুর আবছা ছবি পেয়েছি বটে, কিন্তু ওটা যে কিসের ছবি তা এখনও বুঝতে পারছি না। আলোচনা করে ছবিটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করব আমরা। শেষে হয়তো অ্যাকশন দরকার পড়বে। রানা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা। 'রাশিয়া,' বলল ও। তারপর হাত-ইশারায় এডওয়ার্ডসকে দেখাল। 'ওখান থেকে পাঠানো একটা পেপার এই ভদ্রলোকের হাতে এসেছে—উনি ড. জন এডওয়ার্ডস।' সবাই এডওয়ার্ডসের দিকে একবার তাকিয়েই রানার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল, বাউ করবে তার সময়ই পেল না এডওয়ার্ডস। 'পেপারটা হাতে আসার পর থেকে একের পর এক বেশ কয়েকটা হামলা চালানো হয় ড. এডওয়ার্ডসের ওপর। নেহাত ভাগ্যগুণে প্রাণে বেঁচে গেছেন তিনি। তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে লোক ঢুকেছিল, যার ভেতরে করে ডকুমেন্ট এসেছে সেই এনভেলাপটা ছাড়া আর কিছু চুরি যায়নি। বোঝা যায়, লেটারটা প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ওয়ার্ডের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ভুল করে চলে এসেছে ড. জন এডওয়ার্ডসের কাছে। প্রফেসর ওয়ার্ড খুন হয়েছেন।'

নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধেই থাকল। কারও চেহারায় কোন রকম ভাব নেই। উপস্থিত সবাই তথ্য হজম করতে এসেছে, প্রতিক্রিয়া দেখানো যেন এদের স্বভাব বিরুদ্ধ।

'এ-পর্যন্ত তিনটে ডকুমেন্ট উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা,' বলে চলল রানা। 'প্রথমটা একটা সোভিয়েত অ্যাকাডেমিক পেপার, এডওয়ার্ডস যেটা পেয়েছেন—হাইড্রো-ইলেকট্রিক ডেভেলপমেন্ট ইন কাজাকস্তান, উনিশশো সাতাত্তর। ওটায় এমন কিছু নেই যে ইন্টেলিজেন্স বা সিকিউরিটি অ্যাকটিভিটির দরকার পড়ে। ডকুমেন্টের একটা পাতা নেই। ওটার ডুপ্লিকেট কপি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউ ইয়র্কে ছিল, কিন্তু সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ওটা সরানো,

প্রফেসরের খুনের দায় এডওয়ার্ডসের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা, তারপর এডওয়ার্ডসকে খুন করার প্রয়াস, সব মিলিয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে—গোটা ব্যাপারটার পিছনে সুসংগঠিত একদল অপারেটর কাজ করছে। ডকুমেন্টটা রাশিয়ার দিকে আঙুল খাড়া করে আছে, কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি এসব কীর্তি ওদেরই তারমানে কে. জি. বি.।

'বাকি দুটো ডকুমেন্ট—প্রফেসর ওয়ার্ডকে লেখা অ্যাকাডেমিশিয়ান আইজ্যাক সেসলভের দুটো চিঠি। ওয়ার্ড ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী, একজন অত্যন্ত মেধাবী জিয়োগ্রাফার। তাঁর চরিত্রে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছিল। সেসলভেরও বেসিক ডিসিপ্লিন ছিল জিয়োগ্রাফী, কিন্তু তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে জিয়োলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ওশেনোগ্রাফীতে। চিঠিগুলো পড়ে বোঝা যায়, পরস্পরের কাজের ওপর তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই ওঁদের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিজেদের কাজ নিয়ে তাঁরা বিস্তর আলোচনা করারও সুযোগ নেন। পরস্পরের প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত সহানুভূতি লক্ষ করার মত। সবগুলো ডকুমেন্টের কপি তৈরি করা হচ্ছে, দু'এক মিনিটের মধ্যে সবার হাতে পৌঁছুবে।

'আমরা জানি, প্রফেসর ওয়ার্ড মারা গেছেন। আমরা এ-ও জানি, এ-বছরের এপ্রিল মাসে সরকারীভাবে মস্কোয় সেসলভের মৃত্যুর কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। জানি, মরণোত্তর খেতাব হিরো অভ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন দেয়া হয়েছে তাঁকে। সমাহিত করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়।

'আশা করি কে. জি. বি. ডিফেক্টর কর্নেল ওসিপভের কথা আপনাদের স্মরণ আছে। এ-বছরের মে-তে বার্লিনে পালিয়ে আসে সে। প্রাথমিক জেরা করার সময় তার কাছ থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলোর অধিকাংশ কি পরিমাণ সঠিক, সে-মূল্যায়ন এখনও করা হয়নি। তবে দু'চারটে তথ্যর সত্য-মিথ্যে নির্ণয় করতে গিয়ে প্রমাণ হয়েছে, কর্নেল ওসিপভের দেয়া তথ্যে ভুল বলতে গেলে একেবারেই নেই। প্রাথমিক জেরার সময় অনেক কথা বলার ফাঁকে অ্যাকাডেমিশিয়ান আইজ্যাক সেসলভের কথাও উল্লেখ করে ওসিপভ। তার বক্তব্য: সেসলভকে গ্রেফতার করে মস্কোর বাইরে কোথাও রাখা হয়েছে বলে শুনেছিল সে। গ্রেফতারের যে তারিখ উল্লেখ করছে সে, তার পর থেকে প্রকাশ্যে আর সেসলভকে রাশিয়ার কোথাও দেখা যায়নি। তাঁর অদৃশ্য হওয়া এবং মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচারণা যেহেতু প্রায় একই সময়ের ঘটনা, তাই এর মধ্যে ঘাপলা আছে বলে মনে করার অবকাশ থেকে যায়। আবার এ-ও সম্ভব, আসলে কোথাও কোন ঘাপলা নেই।'

বক্তব্য শেষ করে কোন রকম উপসংহার টানল না রানা। ইতোমধ্যে ডকুমেন্টগুলোর কপি পৌঁছে গেছে, সেগুলো সবাইকে বিলি করা হলো।

'অ্যাকশন, জেন্টলমেন?' নরম গলায় বলল নোলার।

ঝপাঝপ পরামর্শ আসতে শুরু করল। ডানে, বাঁয়ে, সামনে—পালা করে সবার দিকে তাকাল নোলার আর রানা।

'মারা গেছেন, নাকি গ্রেফতার হয়েছেন এই অনিশ্চিত অবস্থা দূর করার জন্যে

কর্নেল ওসিপভকে আরও জেরা করা যেতে পারে।'

'ঠিক,' বলল রানা।

'নাগালের মধ্যে আছে সেসলভের এমন সব পেপার যোগাড় করে মূল্যায়ন করা দরকার।'

নোলার বলল, 'কমপিউটারের কাছে একটা তালিকা আছে। সেটা হয়তো পূর্ণাঙ্গ নয়। সমস্ত অফিসকে ব্যাপারটার গুরুত্ব জানিয়ে দাও।'

'ডক্টর লিউগর নোলটনকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডেকে পাঠানো যেতে পারে।'

'রাইট।'

'প্রফেসর ওয়ার্ডের বাড়ি এবং অফিস ফুলস্কেল সার্চ করা দরকার। তার বন্ধু এবং কলিগদের জেরা করা দরকার। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারও সাথে তাঁর হয়তো কথা হয়ে থাকবে।'

'ও. কে.,' বলল রানা। এই প্রথম ওকে হাসতে দেখল এডওয়ার্ডস। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে হাসিটায়। 'কাজটায় একটু সময় লাগবে। প্রফেসরের অফিসে প্রচুর কাগজপত্র আছে।'

'বইয়ের ভারে তাঁর বাড়িটাকেও আমি গোঙাতে দেখেছি,' বলল এডওয়ার্ডস।

রানার মুখ থেকে হাসিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এডওয়ার্ডসের বুঝতে বাকি থাকল না, এই আলোচনায় তার অংশগ্রহণ আশা করা হচ্ছে না। ও তাকে চুপ করুন বা ওই ধরনের কিছু বলল না বটে, কিন্তু ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল পরিষ্কার নির্দেশ। এডওয়ার্ডস রাগ করবে নাকি অভিমান, সিদ্ধান্ত নেবার আগেই আরেকজন কথা বলতে শুরু করে দিল।

'সমস্ত ইন্টেলিজেন্স ইনফরমেশনের তাৎপর্য নতুন করে বিবেচনা করা দরকার, বিশেষ করে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি এমন সব ঘটনার,– এগুলোর কোনটার সাথে হয়তো সেসলভের রিসার্চের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'রাইট।'

'সেসলভের তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে রাশিয়ার ভেতর আমাদের লোকজনকে কাজে লাগানো যেতে পারে।'

মুখ তুলে তাকাল নোলার। 'এখুনি নয়,' শান্ত ভাবে বলল সে। 'এই রকম একটা ঝুঁকি নেবার মত সঙ্কটে এখনও পড়িনি আমরা।'

আবার জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল কনফারেন্স রুমে। টেবিলের চারদিকে তাকাল নোলার আর রানা। কিন্তু আর কোন সাজেশন এল না।

'তাহলে কাজ শুরু করা যেতে পারে,' বলল রানা।

রিস্টওয়াচে সময় এবং তারিখ দেখল নোলার, তারপর বলল, 'কাল ন'টায়।'

এগারো

রাত কাটাবার জন্যে সি. আই. এ. বিল্ডিঙের ভেতরই একটা কামরা দেয়া হলো এডওয়ার্ডসকে। কামরাটায় সংলগ্ন বাথরুম, রেফ্রিজারেটর, টিভি ইত্যাদি ছিলই, একটু অনুরোধ করতেই কোত্থেকে যেন স্কচ হুইস্কির একটা বোতলও যোগাড় হয়ে গেল। কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে জন নোলারের সাথে মাসুদ রানা কোথায় যে চলে গেল, তারপর তার আর দেখা পায়নি এডওয়ার্ডস। তবে মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছে, এই বিল্ডিঙের ভেতরই কোথাও তারও রাত কাটাবার আয়োজন করা হয়েছে। ছোকরা বিদেশী হলে কি হবে, ভাবল সে, দাপট আছে! দুনিয়া জোড়া যার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে সেই সি. আই. এ-র কর্মকর্তাদের সাথে যার গলায় গলায় ভাব, সে তো সাধারণ মানুষ হতে পারে না। কয়েকবারই ইচ্ছে হয়েছে তার, জিজ্ঞেস করে, 'আপনার পেশা কি, মি. রানা?' কিন্তু সাহসে কুলায়নি।

সকালে ভরপেট ব্রেকফাস্ট সেরে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে এডওয়ার্ডস, এই সময় তাকে নিয়ে যেতে লোক এল। কনফারেন্স রুমে ঢুকে দেখে, সবাই পৌঁচেছে, শুধু রানা বাদে। একটু পরই হাজির হলো সে। সবাই ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। শুরু হলো সভার কাজ।

'ও. কে.,' বলল নোলার। 'কি জানলাম আমরা?'

'কর্নেল ওসিপভের সাথে কাল রাতে তিন ঘণ্টা কাটিয়েছে স্টেশন ওয়াই। ড্রাগস, হিপনোসিস কিছু ব্যবহার করতে বাকি রাখা হয়নি। সেসলভের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তার মধ্যে কোন অনিশ্চিত ভাব, দ্বিধা বা সন্দেহ নেই। আরও একটা নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। সে শুনেছিল, গ্রেফতার করার পর সেসলভকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও বিষয়ে কাজ করানো হচ্ছে।'

'গুড,' বলল রানা। 'লিউগর নোলটনের খবর কি?'

'তিনি আসছেন। রাজি করাতে কোন অসুবিধেই হয়নি। আমরা আসতে বলতেই তিনি জানালেন, উৎসাহ বোধ করছি। কেন ডাকছি আমরা, এখনও জানেন না। যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যেতে পারেন।'

'আমি জানাব,' বলল নোলার। 'আর কি?'

'সেসলভের কিছু পেপার যোগাড় করা গেছে, কিন্তু শুধু ফ্রী ইন্টারন্যাশনাল সার্কুলেশনের জন্যে ছাড়া হয়েছিল যেগুলো। সারা দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে সব, যেখানে সুযোগ আছে সেখান থেকে ট্র্যান্সমিট করে পাঠানো হচ্ছে, অন্যান্য জায়গা থেকে প্লেনে করে।'

'এর মধ্যে একটাও এসে পৌঁছায়নি?' রানা।

'না।'

'সার্চের রেজাল্ট?' আবার রানা।

'প্রফেসর ওয়ার্ডের বাড়ি এবং অফিসের প্রতিটি ইঁট বলতে গেলে খুলে ফেলা হয়েছে। কিছুই পাওয়া যায়নি। তাঁর বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনদের জেরা করা হয়েছে, কিন্তু অদ্ভুত বা বিদঘুটে কিছু লক্ষ করেনি তারা। এদের একজনের সাথে সেসলভের দেখা হয়েছিল, কিন্তু সারাটা সময় পিকাসো ছাড়া আর কোন বিষয়ে আলাপ হয়নি। অবশ্য আলাপের প্রতিটি শব্দ মুখস্থ আছে তার।'

'অল-সোর্স পিকচার কি বলে?' নোলার।

'পরিষ্কার কোন ছবি পাওয়া যাচ্ছে না। সিগন্যালস্ ইন্টেলিজেন্স মনিটরের রিপোর্ট হলো, ট্রাফিক কোথাও একটু বেড়েছে, কোথাও একটু কমেছে। জটিল কিছু না, বড় ধরনের কিছু না যাতে ইমিডিয়েটলি রিপোর্ট করার দরকার পড়ে। নরম্যাল লিমিটের মধ্যেই পড়ে ট্রাফিকের এই উত্থান পতন। এসবের মধ্যে অনেকগুলো শিপিং মুভমেন্টের রিপোর্ট দিচ্ছে।' রিস্টওয়াচ দেখল এজেন্ট। 'সমস্ত ইনক্রিজের একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে।'

টেবিলের সবাইকে একটা করে কপি দেয়া হলো, এডওয়ার্ডসকেও দেয়া হলো। পড়ল সবাই, তারপর যে যার ফাইলে আর সব কাগজের সাথে রেখে দিল।

সেই এজেন্টই শুরু করল আবার, 'স্যাটেলাইট মনিটরিঙে দেখা যাচ্ছে সারা দেশে সাধারণ তৎপরতা চালু আছে। আর্কটিক থেকে তাসখন্দ এবং উক্রেন থেকে ভ্লাদিভোস্টক পর্যন্ত নতুন কিন্তু স্বাভাবিক তৎপরতা লক্ষ করা গেছে। মেজর রাডার ইন্সটলেশনের মত সমস্ত নতুন রকেট সাইলোগুলোও, অবশ্যই, অটোমেটিক রেড ফ্লাশ প্রায়োরিটি রিপোর্টের আওতায় পড়ে। পূর্ব জার্মানী এবং পোল্যান্ডে শিপ বিল্ডিং অ্যাকটিভিটি এখনও বেড়েই চলেছে, কিন্তু যে-সব খোল তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো দেখে বোঝা যায় এ ক্লাস হান্টার-কিলার নিউক্লিয়ার সাবমেরিন বা আর্কটিক ক্লাস আইসব্রেকারের চেয়ে উন্নতমানের কিছু নিয়ে কাজ করছে না ওরা। উত্তর রাশিয়ার বেশির ভাগটাই কয়েক হপ্তা থেকে প্রায় সারাটা সময় রাতের অন্ধকারে ঢাকা থাকছে, এবং যদিও ইনফ্রা-রেড স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফির মান বাড়ছে, তবু ইন্টারপ্রিটেশনের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। কালো দাগগুলোর কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। হতে পারে ট্র্যান্সমিশনের ত্রুটি, হতে পারে রিফ্লেকশনের অভাব। বা অন্য কিছু।'

মৃদু কণ্ঠে বলল নোলার, 'কাজ এগোচ্ছে না। কালো দাগগুলোর সাথে বেড়ে ওঠা ট্রাফিক মিলিয়ে দেখো কিছু ফোটে কিনা।'

রোলারের র‍্যাক থেকে নামানো হলো প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ। সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কয়েকজন। আধঘণ্টা পর ম্যাপের গায়ে মার্কিঙের ছড়াছড়ি দেখা গেল। এরপর মেঝেতে, ডেস্ক টপে, চেয়ারের সারফেসে এবং কামরার কোণে জমতে শুরু করল ম্যাপ, কাগজপত্র এবং ফটোগ্রাফ। জ্যাকেট খুলে মেঝেতেই বসে পড়েছে অনেকে, আলোচনা চলছে পুরোদমে। এই সময় গাঢ় রঙের স্যুট পরা আরেকজন কর্মকর্তার আবির্ভাব ঘটল কনফারেন্স রুমে। তার পিছনে দেখা গেল হাড্ডিসার এক বৃদ্ধকে। যার মাথায় মাত্র ক'গাছি চুল, কিন্তু প্রতিটি চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পাকা; চোখ দুটো কোটরাগত, কিন্তু গর্তের ভেতর থেকে বুদ্ধির দ্যুতি বেরিয়ে আসছে। নবাগত গাঢ় স্যুট বলল, 'ডক্টর লিউগর নোলটন।'

একরকম ছুটেই বৃদ্ধের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নোলার 'এত তাড়াতাড়ি আসার জন্যে ধন্যবাদ, ডক্টর নোলটন।'

'বেড়ানোর সুযোগ পেলে ছাড়ে কে!' দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসলেন ড. নোলটন। সবাই আশা করেছিল বৃদ্ধের গলার আওয়াজ একটু কর্কশই হবে, কিন্তু দেখা গেল তাঁর গলার সুরে অদ্ভুত একটা মধুর ঝঙ্কার আছে। তবে চেহারাটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মত। সারা মুখে জরার অসংখ্য খুদে রেখা কাটাকুটি দাগের মত বিজবিজ করছে। অথচ চামড়ায় তেল চকচকে ভাবটুকু আছে পুরোমাত্রায়।

'আপনার কোট আর ব্রিফকেসটা আমাকে দিন,' বলল নোলার, পথ দেখিয়ে নোলটনকে নিয়ে গেল কোণের একটা দরজার দিকে। দরজা খুলে একটা অফিসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

মিনিট দুয়েক পরই আবার তারা কনফারেন্স রুমে বেরিয়ে এল। নোলার সম্ভবত প্রফেসর ওয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছে ডক্টর নোলটনকে। কিন্তু ডক্টরের চেহারা দেখে প্রতিক্রিয়া কিছু বোঝা গেল না।

রানার সাথে ডক্টর নোলটনের পরিচয় করিয়ে দিল নোলার। কোন রকম ভূমিকা না করে যা ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল রানা। যে-সব তথ্য যোগাড় হয়েছে সেগুলোও জানাল তাঁকে। প্রতিটি বাক্যে টাইম ম্যাগাজিন যে পরিমাণ তথ্য পরিবেশন করে, তার চেয়ে বেশি তথ্য ঠেসে দিল সে।

এরপর রানা জায়গা ছেড়ে দিতেই ডক্টর নোলটনের সামনে চলে এল নোলার। শুরু করল, 'ডক্টর নোলটন, সি. আই. এ-তে আমরা একটা সমস্যার ওপর কয়েকজন মিলে মাথা ঘামাই। বিভিন্ন কোণ থেকে সমস্যাটাকে দেখতে খুব সুবিধে হয় এতে। আমার ইচ্ছে, আপনাকে আমি কিছু প্রশ্ন করব, আপনি সেগুলোর উত্তর দেবেন, এবং উপস্থিত সবাই তা শুনবে তারপর কেউ যদি কোন প্রশ্ন করতে চায়, করবে। ও. কে.?'

সরু ঠোঁট মুড়ে সবজান্তার ভঙ্গিতে হাসলেন বৃদ্ধ নোলটন। 'বুঝেছি! আমার যত জ্ঞান সব তোমরা কেড়ে নিতে চাও।'

'ঠিক কেড়ে নিতে নয়,' হাসতে হাসতে বলল রানা, 'আসলে ভাগ বসাতে চাই।'

'সত্যি? ওয়েল অ্যান্ড গুড! তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। নাও, শুরু করো হে।'

'আপনি সেসলভকে চেনেন?' প্রথম প্রশ্ন নোলারের।

'চিনতাম,' ভুল ধরিয়ে দেবার সুরে বললেন বৃদ্ধ। 'দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, এ-বছরের প্রথম দিকে মারা গেছে সে।'

'কিন্তু আমাদেরও সন্দেহ করার কারণ আছে যে তিনি হয়তো মারা যাননি, ডক্টর,' মৃদু স্বরে বলল নোলার।

'তাই?' কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো না ডক্টর নোলটন অবাক হয়েছেন। 'তার মৃত্যু সংবাদটা যদি মিথ্যে হয়, আপনাদের সবাইকে আমি ডিনার খাওয়াব।'

'আপনি জানেন, ডক্টর, কি নিয়ে কাজ করছিলেন তিনি?'

'এক কথায় এর জবাব দেয়া সম্ভব নয়,' বললেন নোলটন। চেহারায় একটা

সতর্ক ভাব, একটা গাম্ভীর্য ফুটে উঠল। যেন অত্যন্ত জটিল এবং তাঁরও প্রায় নাগালের বাইরে একটা বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন তিনি। 'সেসলভের কাজ সম্পর্কে কিছু বলতে হলে প্রথমে তার ব্রেনের কথা বলে নিতে হবে। যদি বলি সে ছিল একটা প্রতিভা, তা থেকে পরিষ্কার কিছুই বোঝা যাবে না। আশ্চর্য একটা বস্তু ছিল তার এই ব্রেন। সাধারণত দেখা যায় একজন বিজ্ঞানী একটা, দুটো বা খুব বেশি হলে তিনটে বিষয়ে আগ্রহী হন, এবং মাত্র একটা বিষয়েই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। কিন্তু সেসলভের ব্যাপারটা তা ছিল না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উপশাখা সম্পর্কে কৌতূহল ছিল তার, এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের অমূল্য অবদান রেখে গেছে সে। কিন্তু তার এই অবদানগুলো একটু অন্য রকম। তাকে আমরা তাত্ত্বিক বলতে পারি। অবাক কাণ্ড হলো, তার নিজের বেশিরভাগ মতবাদ বা ধারণাগুলো এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রমাণ করেনি সে, কিন্তু অন্যেরা করেছে। এক্সপেরিমেন্ট করতে প্রচুর সময় দরকার হয়, অত সময় তার ছিল না। কারণ তার মাথার ভেতর গিজ গিজ করত হাজারো আইডিয়া। এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে আইডিয়াগুলো চাপা পড়ে যাবে, আর প্রকাশ করা হবে না, এই ছিল তার ভয়। যেমন ধরুন উত্তরে ইউরো-এশিয়ায় মিনারাল ডেভেলপমেন্টের কথা। ওখানে কিভাবে কি করলে কি পাওয়া যাবে, সেটা একটা ধারণার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে সে। ওখানে কি আছে না আছে তাও তত্ত্বের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করে। পরে দেখা যায়, তার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বিভিন্ন ধরনের ওশেনোগ্রাফিক স্টাডিজেও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম আছে তার।' একটু অসহায় ভাবে হাসলেন নোলটন। 'বোধহয় পরিষ্কার কোন ছবি দিতে পারছি না, তাই না? আসলে তোমরা যদি জিজ্ঞেস করতে প্রফেসর ডরোথির অবদান সম্পর্কে বলুন, গড় গড় করে বলে যেতে পারতাম। অপেনহেইমার সম্পর্কেও সেই একই কথা। কিন্তু সেসলভ আলাদা। ব্যাপারটা এইভাবে কল্পনা করতে চেষ্টা করো: মনে করো, সত্তর বছর আগে তোমরা সাধারণ একজন অঙ্কবিদকে জিজ্ঞেস করলে, আইনস্টাইন কি করছে? কি জবাব দেবে সে? মোট কথা, সংক্ষেপে বলতে পারি, সেসলভ তার নিজের ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রসমূহ কনসেপ্টের জন্ম দিত।'

'আরও দু'একটা উদাহরণ?' জানতে চাইল রানা। মৃদু হাসি লেগে আছে ঠোঁটে।

এমন ভাবে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী খুব যেন মজা পেয়েছেন। 'বিশদভাবে যদি উদাহরণ পেতে চাও, স্পেসিফিক একটা এরিয়ার কথা আমাকে জানাতে হবে। পঞ্চাশজন বিজ্ঞানী যা ভাবতে হিমশিম খেয়ে যাবে তারচেয়ে অনেক বেশি একাই ভেবেছে সেসলভ। তার এক্সপেরিমেন্টের সংখ্যাও তার যুগের সব বিজ্ঞানীর চেয়ে বেশি। সাবমেরিন সাউন্ড ট্র্যান্সমিশনের ওপর তার এক্সপেরিমেন্ট ছিল। আবার সামুদ্রিক স্রোতের ইন্টারপ্লে, এবং মিনারাল ডিপোজিট আবিষ্কারের জন্যে ইন্টারপ্রিটেশন অভ স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফির ওপরও ছিল তার এক্সপেরিমেন্ট।' একটু থামলেন তিনি, তারপর বললেন, 'সেসলভ বিরাট লম্বা একটা ব্যাপার।'

'তারচেয়ে আপনি বরং মানুষ সেসলভ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন, ডক্টর,' অনুরোধ করল নোলার।

'মানুষ সেসলভ সম্পর্কে জানতে চাও? বেশ, ঠিক আছে···প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে চিনতাম তাকে আমি। অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছিল সে। জানো তো?'

'জ্বী।'

মৃদু হাসলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। 'তা তো জানবেই! তার সাথে পরিচয় হলো, বুঝলাম, অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। কিন্তু মার্ক্সবাদ তার ভেতর একেবারে শিকড় গেড়ে বসে গেছে। তাকে দেখে মনে হতে পারত, লোকজন একেবারেই পছন্দ করে না একা, নিঃসঙ্গ থাকতে ভালবাসত। খুব কম কথা বলত, আড্ডাবাজী বা অলস সময় কাটানো ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ। হয় আগ্রহ আছে এমন কিছুতে গভীর মনোযোগের সাথে লেগে থাকত, না হয় একটা বই পড়ত। তাকে আমরা একজন স্বাপ্নিকও বলতে পারি। জুল ভার্ন এবং এইচ. জি. ওয়েলসের কোন লেখা পড়তে বাদ রাখেনি। প্রকৃতিটা ছিল ধীর-স্থির, হঠাৎ উত্তেজিত হতে দেখিনি কখনও।'

'তার চিঠি লেখার ভাষা, ভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভাল ধারণা আছে আপনার?' বলল রানা। 'আপনাদের মধ্যে চিঠি পত্র বিনিময় হত?'

'হ্যাঁ। আমার চিঠি ভেতরে ঢুকতে দিতে বা তার চিঠি বাইরে বেরুতে দিতে আপত্তি তোলেনি ওরা। স্ট্যালিনের যুগেও নয়। হ্যাঁ, তার চিঠি লেখার স্টাইলটা আমার জানা আছে।'

ডক্টর নোলটনের হাতে সেসলভের লেখা চিঠি দুটো ধরিয়ে দিল রানা। পড়তে শুরু করলেন ডক্টর। শেষ চিঠিটা পর পর তিনবার পড়লেন। চশমার ভেতর দিয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল চোখ দুটো। তারপর তিনি মুখ তুলে তাকালেন। 'দ্বিতীয় চিঠিটা একটু অদ্ভুতই বলব আমি। চিঠিতে অসুস্থতার কথা উল্লেখ করা···' মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, '···উঁহুঁ, এ-ধরনের একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যার কথা চিঠিতে লেখা তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সে ডায়াবেটিক, এই কথাটা শুধু একবার একটি মাত্র শব্দে জানিয়েছিল আমাকে। তারপরই অন্য প্রসঙ্গে সরে গিয়েছিল। সেই একই লোক নিজের শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে এত কথা লিখেছে, আশ্চর্য!'

'অস্বাভাবিক আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি না মানে!' রানার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন নোলটন। 'অতি-খাটুনির কথা উল্লেখ করেছে। বলেছে, ক্ষতিকর। বিশ্বাস করো, হাতের লেখা চিনতে না পারলে বলতাম এ চিঠি সেসলভের লেখা নয়। খাটুনির ব্যাপারে 'অতি' বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে তাই জানা ছিল না তার। কাজ পাগল লোক ছিল, কাজই ছিল তার ধ্যান, তার সাধনা! তোমরা বুঝতে পারছ না? এ-ধরনের একটা শব্দ অন্তত তার পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। আরও আছে। ভ্রমণের ব্যাপারে সাংঘাতিক লোভ ছিল তার। অথচ লিখেছে অসুস্থতার জন্যে ভ্রমণ করতে অত্যন্ত কষ্ট হবে। অবাক কাণ্ড!'

'আপনি তাঁকে পছন্দ করতেন?' নোলারের প্রশ্ন।

'খুবই। যাকে বলে খাঁটি ভাল মানুষ, সেসলভ ছিল তাই। আদর্শ ছিল মার্ক্সবাদ, কিন্তু সেই সাথে একজন হিউম্যানিস্টও ছিল। গরীবকে ঘৃণা করা এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চাওয়া সম্পর্কে বার্নার্ড শ-র যে কথাটা আছে সেটা প্রায়ই আওড়াত।'

'প্রিন্সিপল্?' নোলার।

'সরকারের সাথে তার মতের মিল ছিল না, এটুকু পরিষ্কার। কিন্তু কতটুকু অমিল, আমার জানার সুযোগ হয়নি। স্ট্যালিনের যুগে কিভাবে যে টিকে গেল ও, ভাবতে আশ্চর্য লাগে।' একটু থেমে অপ্রতিভ ভঙ্গিতে একটু হাসলেন বৃদ্ধ। 'ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি কি আসলে কোন উপকারে লাগছি?'

'কি উপকার হচ্ছে তা এই মুহূর্তে বোঝা না গেলেও উপকার যে হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, ডক্টর নোলটন,' বলল নোলার। 'আপনি বলে যান, প্লীজ।'

'আরও? আচ্ছা, বেশ। সেসলভ···সেসলভ সুবিচারের পূজারী ছিল। একটু অবাকই লাগত আমার। নিঃশর্ত অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা দাবি করত সে। অবশ্য আমরা সবাই সেটা দাবি করতাম। আরেকটা ব্যাপার, বিজ্ঞানীদের নৈতিকতা বোধ সম্পর্কে প্রায়ই তাকে মাথা ঘামাতে দেখতাম। রুজভেল্টকে ইকুয়েশন দিয়েছিল বলে আইনস্টাইনের সমালোচনা করত সে—অ্যাটমিক বোমার ওটাই তো ভিত্তি। বলত, তত্ত্বটা নিজের কাছে রাখা উচিত ছিল আইনস্টাইনের। এবং ওটা গোপন রাখার প্রয়োজনে দরকার হলে উচিত ছিল আত্মহত্যা করা। ডি.ডি.টি.সম্পর্কেও এই ধরনের মতামত দিত সে। যে-কোন বস্তু, ধারণা বা আবিষ্কার ভালমত টেস্ট না করে, অথবা ওগুলোর ভবিষ্যৎ প্রয়োগ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হয়ে প্রকাশ করার ঘোর বিরোধী ছিল সে।'

সেসলভের শেষ চিঠিটা আবার পড়ছিল রানা, মুখ তুলে জানতে চাইল, 'আচ্ছা সে-ধরনের কোন ধারণা বা আবিষ্কার তাঁর নিজের ছিল না তো?'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবলেন বৃদ্ধ নোলটন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'না···মনে হয় না।' জোর দিয়েই বলার চেষ্টা করলেন কথাটা, কিন্তু তেমন জোরাল শোনাল না 'থাকলে তো জানতাম···'

'সম্ভাবনাটাকে বোধহয় একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, কি বলেন, ডক্টর?' জানতে চাইল রানা

মাথাটা একদিকে কাত করে চিন্তায় ডুবে গেলেন নোলটন। মাড়ি দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। খানিক পর বললেন, 'সে-ধরনের কোন ধারণা বাস্তবে প্রয়োগ করবে সেসলভ, এ আমি ভাবতে পারছি না। অন্তত নিজের ইচ্ছেয় নয়।'

নোলার বলল, 'হয় তিনি মারা গেছেন, নয়তো গ্রেফতার বা নজরবন্দী হয়েছেন।'

'বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছ!' বললেন নোলটন। 'কিন্তু জোর করেও তাকে দিয়ে এ-ধরনের কিছু করানো যাবে বলে আমি মনে করি না। তার আগে আত্মহত্যা করবে সে।'

'কিন্তু কেউ যদি তাকে আত্মহত্যা করতেও বাধা দেয়?'

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। তারপর নোলটনই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। বললেন, 'সেসলভ বলত, যদি কখনও ঘটেই, দু'হাজার এক সালের আগে সেটা ঘটবে না।'

নোলার অত্যন্ত নরম সুরে জানতে চাইল, 'দু'হাজার এক সালের পর কি ঘটবে?'

বারো

সবাই তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধ নোলটনের মুখের দিকে। পোলার আইস-প্যাক গলতে শুরু করলে কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে সে সম্পর্কে অনেক কথা আজ সাধারণ মানুষ জানে।

প্রথম কথা বলল নোলার, 'কিভাবে, কেন? ব্যাখ্যা করতে পারেন?'

'চেষ্টা করতে পারি। সত্যি বলতে কি, সমুদ্র আমার এলাকা নয়। তোমাদের গ্রেট ওশেনোগ্রাফার কলম্বাস ইজেলিনকে জিজ্ঞেস করো। উডস হোল ইন্সটিটিউটে পাবে তাঁকে। পোলার কেন গলবে, কিভাবে গলবে তার পরিণতি কি হবে···আমার চেয়ে তিনিই ভাল বলতে পারবেন।'

'ইজেলিনকে আমরা পরে জিজ্ঞেস করব,' বলল নোলার। 'আমরা আপনার মুখ থেকে আগে শুনতে চাই।'

'ভেরি ওয়েল। প্রিন্সিপলটা খুব সহজ। আর্কটিক সমুদ্র বিশাল একটা ব্যাপার। দুনিয়ার বিরাট একটা ভূখণ্ড ঘিরে রেখেছে সেটাকে। গোটা নর্দার্ন কানাডা, নর্দার্ন আলাস্কা, এবং নর্থ কেপ থেকে বেরিং স্ট্রেইট পর্যন্ত এশিয়ার বিশাল অংশ। এই ভূখণ্ডের বেশির ভাগই বলতে গেলে একরকম কোন কাজে লাগে না। ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টিজের অভাবে, তা নয়। কাজে লাগে না চিরকাল ওটা বরফে ঢাকা থাকে বলে।

'আর্কটিক সমুদ্র গভীর এবং জাহাজ চলাচলের জন্যে নিরাপদও বটে। উনিশশো আটান্ন সালে পোলার আইস অভিযানে বেরিয়ে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন নটিলাস এবং স্কেট সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

'ব্যাপক ভাবে বিশ্বাস করা হয়···না, ভুল হলো···এখন সবাই জানে, আর্কটিক সমুদ্র চিরকাল এই রকম বরফে ঢাকা ছিল না। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে আরেক উৎস থেকে নেমে এসে বরফের একটা স্তর তৈরি হয়ে যায়। তোমরা জানো, পানি যখন বরফে পরিণত হয়, তখন সেটা পরিমাণে বেড়ে ওঠে। ঠিক উল্টোভাবে, বরফ যখন গলে পানি হয়ে যায়, তখন তার পরিমাণ কমে যায়। কাজেই পরিষ্কার হয়ে গেল, পোলার প্যাক গলে গেলেও তার ফলে পানির ভলিউম সাংঘাতিক রকম বাড়বে না। কিন্তু···বাইরে থেকে এসে বরফের স্তর যেটা তৈরি হয় সেটাই সমস্যার সৃষ্টি করে। হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমশ বরফে পরিণত হচ্ছে পানি। এই বরফ যদি গলে যায়, তাহলে সমস্ত সমুদ্রের লেভেল ইঞ্চি কয়েক, অথবা এক ফুট বা ফুট দুয়েক বেড়ে যাবে। এতে করে গোটা উত্তর রাশিয়া জাহাজ চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠবে। এমনকি সম্ভবত চাষাবাদ করাও তখন আর সমস্যা হয়ে দেখা দেবে না।'

বিরতি নিয়ে জানতে চাইলেন তিনি, 'সব পরিষ্কার?'

'বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না,' বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করল নোলার।

'ঠিক আছে। মনে রেখো, বড় আর সব দেশের তুলনায় ভাল পোর্ট খুব কমই আছে রাশিয়ায়। পশ্চিম দিকে একমাত্র মারমানস্কই শুধু সারা বছর আইস-ফ্রী থাকে, সেজন্যে গালফ স্ট্রীমের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ওদের। এছাড়া···এমনকি বাল্টিক পোর্টগুলোও জমাট বরফের দরুন নৌ-চলাচলের অনুপযোগী হয়ে ওঠে। পুব দিকে অবশ্য ভ্লাদিভোস্টক ছাড়া দু'একটা বন্দর সারা বছর নাব্য থাকে, কিন্তু ওখান থেকে ইউরোপিয়ান রাশিয়া অনেক অনেক দূর। ওদিকে চীনারা ওদের জন্যে কখন হুমকি হয়ে দেখা দেয় কেউ তা বলতে পারে না। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে ওই বিশাল নর্দার্ন কোস্টলাইন যদি সারা বছরের জন্যে জাহাজ চলাচলের জন্যে উপযোগী হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের কল্পনাকে হার মানিয়ে দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া দ্রুত উন্নতির মগডালে উঠে যেতে পারবে।'

আরও একটু পরিষ্কার করার জন্যে জানতে চাইল রানা, 'এর তাৎপর্য, ডক্টর নোল্‌টন? পরিণতি?'

'পরিণতি রাশিয়ার জন্যে ভাল। অনেকগুলো নতুন বন্দর পাবে তারা, তাছাড়া সবগুলো বন্দর সারা বছরের জন্যে খুলে যাবে। তবে কিছুটা ত্যাগও স্বীকার করতে হবে ওদের। বেশ খানিকটা জমি হারাবে ওরা। ঠিক কতটা তা নির্ভর করবে গ্লোবাল ওয়াটার লেভেল কি পরিমাণ বাড়বে তার ওপর। তবে, তাতে ওদের শঙ্কিত হবার কিছু নেই, কারণ আর সবার চেয়ে অনেক বেশি জমির মালিক তারা। আরেকটা তাৎপর্য হলো, দুনিয়ার মানচিত্রে বড় ধরনের একটা পরিবর্তন দেখা দেবে। প্রচুর জায়গা পানির নিচে তলিয়ে যাবে, বিশেষ করে নিচু জায়গাগুলোর আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল। বাংলাদেশ আর ফার ঈস্টের বহু জায়গা মুছে যাবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। অন্যান্য দেশেও এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হবে। উদাহরণ হিসেবে হল্যান্ডের কথা তুলতে পারি আমরা। প্রায় গোটা হল্যান্ডই বিপদের মুখে পড়তে পারে। অপরদিকে কানাডা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে।'

একটু থেমে কি যেন ভাবলেন নোলটন, ভুরু কুঁচকে সিলিঙের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'মুশকিল হলো, এ-ব্যাপারে হিসেব করে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। আসলে যে কি ঘটবে তা আমরা কেউই কিছু জানি না। গ্রীনল্যান্ড রয়েছে, তাই না?'

'গ্রীনল্যান্ড রয়েছে,' বলল রানা। 'তাতে কি?'

সরাসরি ওর দিকে তাকালেন নোলটন। 'পনেরোশো মাইল লম্বা, ছ'শো মাইল চওড়া। প্রায় এক মাইল উঁচু। সব মিলিয়ে অনেক, অনেক বরফ। শুধু বরফ নয়, জমাট বাঁধা নিরেট বরফ। ধরো, উষ্ণতর একটা আর্কটিক সমুদ্র গ্রীনল্যান্ড আইস-ক্যাপ গলিয়ে দিতে শুরু করল। তা সে পারে হে, তা সে পারে!—এবং তারপর? দুনিয়ার বড় একটা অংশ ডুবে যেতে পারে পানির নিচে। নর্থ আটলান্টিকের পানির লেভেল কতটা বাড়বে জানি না, ধরি তিন কি চার ফিট বাড়বে, আসলে হয়তো বাড়বে এর ছয় বা দশ গুণ, কিন্তু ওই তিন কি চার ফিট বাড়লেই লন্ডন, প্যারিস এবং নিউ ইয়র্ক চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে পানির নিচে। ইউরোপের প্রধান প্রধান বন্দর সহ বিশাল এলাকা, ইস্টার্ন ইউনাইটেড

স্টেটস এবং কানাডা স্রেফ কর্পূরের মত গায়েব হয়ে যাবে।'

'গায়েব হয়ে যাবে?' ফিসফিস করে বলল নোলার।

'সম্পূর্ণ। আরও কি কি ঘটবে,' সিলিঙের দিকে তাকালেন বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞানী, 'তা একমাত্র ওপরওয়ালাই বলতে পারে। কেউ জানি না এই অতিরিক্ত পানি কিভাবে বয়ে নিয়ে যাবে স্রোত, জানি না কোথায় কিভাবে বিলি করবে সেই পানি। এই যে নিজেকে কেন্দ্র করে ঘুরছে পৃথিবী, কেউ জানি না এই ঘোরাটা তখন কি রকম হবে। দুনিয়ার ভারসাম্য যে নষ্ট হবে সে তো বুঝতেই পারছ।' আতঙ্ক বা নাটকীয়তার কোন ছোঁয়া নেই বৃদ্ধ নোলটনের বলার সুরে। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। যেন লেকচার দিচ্ছেন ক্লাসে।

শান্ত অবশ্যই সবাইকেই দেখাল। কিন্তু প্রত্যেকে তাকিয়ে আছে ডক্টর নোলটনের দিকে। সেই সাথে কল্পনার চোখে ভয়াবহ-একটা দুনিয়ার ছবি আঁকার চেষ্টা করছে ওরা, শহরগুলো ফুলে ওঠা সমুদ্রের তলায় দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র পরিসরে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে মানুষ, যারা বেঁচে থাকছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'কিছু মনে করবেন না, ডক্টর নোলটন—এ-ব্যাপারে সেসলভ বা ইজেলিন কি আপনার চেয়েও বেশি জানেন?'

'অবশ্যই। এটা তো তাদেরই মাঠ, আমার নয়।' একটু থেমে আরেকটু বললেন বৃদ্ধ, 'তবে কি ঘটবে না ঘটবে সে-ব্যাপারে ওদেরও অনুমান ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

'আই সী,' ধীরে ধীরে বলল নোলার। 'ব্যাপারটা কি রাশিয়া ঘটাতে পারে?'

'এটা একটা বিরাট স্কেলের ইঞ্জিনিয়ারিং ধাঁধা। সেসলভের বিশ্বাস ছিল কাজটা সম্ভব, এবং কঠিন বাস্তব সত্য এই যে, সমুদ্র সম্পর্কে বাকি সবার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান রাখে রাশিয়া।'

'কি রকম?' জানতে চাইল নোলার।

'আমাদের সবার চেয়ে বেশি সময় আর টাকা খরচ করে সমুদ্রকে স্টাডি করেছে ওরা। ফান্ডামেন্টাল ইমপর্ট্যান্স অভ সী পাওয়ার-এর ওপর বরাবর গভীর বিশ্বাস রেখে এসেছে ওরা।'

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন নোলটন, তাঁকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'সেসলভ!'

'ঠিক। সী পাওয়ারের পক্ষ নিয়ে একটানা অনেক বছর ওকালতি করেছে সেসলভ। সী পাওয়ারের ওপর গোটা রাশিয়ার অগাধ বিশ্বাস। ত্রিশ বছরের ওপর হলো এই সী পাওয়ারকে কাজে লাগাবার জন্যে কি না করছে তারা। ট্রলার ফ্লিট, সাবমেরিন, জাহাজ চলাচলের ওপর গবেষণা, সাগরের সার্ভে, স্রোতের ম্যাপ তৈরি। স্রোতের গতিবিধি, সমুদ্র তলদেশের টপোগ্রাফী সম্পর্কে আর সব দেশের চেয়ে কম করেও বিশ গুণ জ্ঞানের অধিকারী রাশিয়া। তোমরা, আমেরিকানরা পিছিয়ে পড়ছ—সেজন্যে তোমাদের মধ্যে উদ্বেগ আর ক্ষোভেরও অন্ত নেই। বেশ কয়েক বছর আগে সিনেটর ম্যাগনুসন কি বলেছেন, পরিষ্কার মনে আছে আমার। "সংখ্যায় বেশি এবং আকারে বড় জাহাজ নিয়ে রাশিয়া ওয়েট ওয়রে জিতে যাচ্ছে। আমাদের চেয়ে ভাল যদি নাও হয়, তাদের বিজ্ঞানীরা সংখ্যায় বেশি। কিন্তু

ইকুইপমেন্টের দিক থেকে সংখ্যা এবং মানে আমাদের অনেক পিছিয়ে রেখে এগিয়ে গেছে তারা। ওদের সরকার চাপ সৃষ্টি করতে পারে, ফলে দশ দিনের কাজ একদিনে সারতেও কোন অসুবিধে হয় না। আমাদের পিছিয়ে পড়ার অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ''। তিনি আরও বলেছেন, মানবজাতির ভাগ্য হয়তো ওয়েট ওয়রের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে। ইউ. এস. নেভীর অ্যাডমিরাল হেওয়ার্ড কি বলেছেন? বলেছেন, সোভিয়েত ওশেনোগ্রাফীর মূল লক্ষ্যই হলো দুনিয়াটাকে নিজেরদের মুঠোয় ভরা। ইউ সী?'

'ইয়েস, ডক্টর, আই সী ইট ভেরি ক্লিয়ারলি,' বলল নোলার। 'কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খুব বেশি আতঙ্কিত হয়ে ওঠার আগে একটা প্রশ্ন। কি ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করবে ওরা সে-সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কি?'

'খানিকটা। অবভিয়াসলি, বরফ বিধ্বস্ত করার জন্যে থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাবার সম্ভাবনা আছে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং আইডিয়া, রাশিয়া আর আলাস্কার মাঝখানে বেরিং স্ট্রেইটে একটা বাঁধ তৈরি করা। তোমরা জানো, ওটা খুব বেশি চওড়া নয়। তারপর প্রকাণ্ড সব পাম্প মেশিন বসিয়ে প্যাসিফিকের গরম পানি আর্কটিক সমুদ্রে ফেলা হবে, আর আর্কটিকের ঠাণ্ডা পানি প্যাসিফিক সমুদ্রে ফেলা হবে। বিশাল একটা অপারেশন, সন্দেহ নেই, অবিশ্বাস্য রকম খরচও পড়বে। বাঁধ তৈরি করতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যও দরকার হবে ওদের। তাই, এই সম্ভাবনাটা নিয়ে আমরা বোধহয় মাথা না ঘামালেও পারি। কিন্তু শুধু এই একটা নয়, সেসলভের মাথায় এ-ধরনের অসংখ্য আইডিয়া গিজগিজ করত। তার মধ্যে থেকে একটার কথা বলি। কল্প-কাহিনীর মত শোনাতে পারে, কিন্তু আর সবগুলোর চেয়ে এটা প্রয়োগ করা সহজ বলে মনে হয়। এই আইডিয়াটা কার্বন পাউডার ব্যবহার করতে বলে।'

'কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'খুবই সহজ পদ্ধতি। রোদ লাগলেও বরফ গলে না—কেন? সহজ কারণ, উত্তাপ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে বরফের। বরফ যে রিফ্লেক্ট করে সে তো আমরা তাকালেই দেখতে পাই। গ্রীষ্মকালে আর্কটিকের দিনগুলোকে আক্ষরিক অর্থেই সীমাহীন লম্বা বলে মনে হয়। সারাক্ষণ রোদ লাগে, কিন্তু তবু বরফ খুব একটা গলে না। কারণ রোদের প্রায় সবটুকু উত্তাপ প্রতিফলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয় বরফ। কিন্তু কার্বন জিনিসটা কালো, আর কালো রঙ কখনও রিফ্লেক্ট করে না। কাজেই, বরফের ওপর তোমরা যদি পাউডার কার্বন ছড়িয়ে দিতে পারো, সূর্যের উত্তাপ বরফের ওপর থেকে আর ফিরে যেতে পারছে না। পানির মত সহজ, নয় কি?'

সবাই স্থির হয়ে আছে। কারও মুখে কথা নেই। চোখ পিট পিট করে সবার দিকে একবার করে তাকালেন ডক্টর নোলটন। চেহারা দেখে মনে হলো, তাঁর কথার এই রকম একটা প্রতিক্রিয়া হবে তা যেন তিনি অনুমান করতে পারেননি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা, শান্তভাবে এগিয়ে গিয়ে বড় ওয়াল ম্যাপটার সামনে থামল। ম্যাপের গায়ে একটা আঙুল রাখল ও। বলল, 'এখানে কিছু ছায়া ছায়া দাগ দেখছেন, ডক্টর নোলটন?'

'হ্যাঁ। কিসের দাগ ওগুলো?'

'স্যাটেলাইট থেকে ইনফ্রা-রেডের সাহায্যে তোলা ফটোগুলো এই ম্যাপে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে,' বলল রানা।

'রিয়েলি? কত আগে তোলা?'

'কয়েক হপ্তা।'

'এতক্ষণ যে বিষয়ে কথা বললাম, ওগুলো তা হতে পারে। আবার, নাও হতে পারে। চট করে উপসংহার আওড়ানো আমার পক্ষে সহজ কাজ নয়। তবে, দাগগুলো খুব বড় বড় জায়গা দখল করে নেই। ওসব জায়গায় পাউডার কার্বন যদি ছড়ানো হয়েও থাকে, তার প্রতিক্রিয়া হবে সামান্য। তবু দিনের আলো ওখানে নিঃশেষ হয়ে যাবার পর দাগগুলো ফুটেছে দেখে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং লাগছে। মোস্ট ইন্টারেস্টিং!'

টেবিলের একজন এজেন্ট উঠে দাঁড়াল। 'এক্সকিউজ মি, নোলার। একটা ব্যাপার চেক-করে দেখতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে।'

বৃদ্ধ নোলটন বলে চললেন, 'আগেই বলেছি, সেসলভের মাথায় আইডিয়ার কোন অভাব ছিল না। তোমরা কেউ পাইক্রিট সম্পর্কে জানো?'

সবাই চুপ করে থাকল।

'মার্ভেলাস স্টাফ!' বৃদ্ধ বললেন। 'এক্সট্রা-অর্ডিনারি প্রপার্টিজ।'

'বলুন, ডক্টর,' নড়েচড়ে বসল নোলার।

'মজার ব্যাপার হলো, জিনিসটা ডেভেলপ করা হয়েছে লন্ডনের একটা বাজারে—সম্ভবত স্মিথফিল্ডে—যেখানে মাংসের আড়ত আছে, কেনাবেচা হয়। পাইক নামে এক লোকের টীম এই কৃতিত্বের অধিকারী। আইডিয়াটা হলো: অন্য কিছু জিনিস মিশিয়ে বরফকে তুমি অনেক শক্ত করতে পারো এমনিতে, আমরা জানি, বরফ স্বচ্ছ এবং ভঙ্গুর। কিন্তু পাইকের মিশ্রণ বরফকে শুধু যে লোহার মত শক্ত করেছে তাই নয়, বরফের উত্তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বিস্ময়কর ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। শুনে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবে, এই নতুন ধরনের বরফ দিয়ে জাহাজ তৈরির প্ল্যানও করা হয়েছিল। যুদ্ধের সময়। যতদূর মনে পড়ে, কুইবেক কনফারেন্সে গিয়ে রুজভেল্টের কামরায় এই বরফের তৈরি একটা গামলা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন চার্চিল। রুজভেল্টকে বললেন, এর মধ্যে গরম এক কেটলী পানি ঢালো, দেখো আমাদের নতুন বরফ গলাতে পারো কিনা। বরফ গলেনি, গরম পানি ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।' সবার দিকে একবার করে তাকালেন বৃদ্ধ। 'ঘটনাটার কথা মনে আছে তোমাদের কারও? মানে, শুনেছ কি?'

'আবছাভাবে মনে পড়ছে বটে,' বলল রানা। 'হাববাকুক···বা ওই ধরনের কি যেন!'

'হাববাকুক, ঠিক! নতুন বরফের কোড নেম!' হাসতে গিয়ে মাড়ি বেরিয়ে পড়ল বৃদ্ধ নোলটনের। 'জিনিসটা খুব একটা কেরামতি দেখতে পারেনি বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা দিয়ে সত্যি সত্যি একটা জাহাজ তৈরি করা হয়েছিল। সম্ভবত কানাডায়। কোন একটা লেকে পুরো গ্রীষ্মকাল ভেসে ছিল সেটা। গলেনি বললেই

চলে।'

'কিন্তু,' নরম সুরে বলল রানা, 'আমাদের সমস্যা বোধহয় বরফ গলা নিয়ে, জমাট বাঁধা বা শক্ত হওয়া নিয়ে নয়।'

'দুঃখিত। আবার আমি প্রসঙ্গ ছেড়ে দূরে সরে গেছি।' চেহারা দেখে মনে হলো ডক্টর নোলটন হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন। 'কিন্তু, সেসলভ তো ওই জিনিস দিয়েই বাঁধ তৈরি করার কথা ভাবত।'

'কোথায়?'

'কোথায়? বড় কঠিন প্রশ্ন। সামুদ্রিক স্রোত সম্পর্কে আমাদের চেয়ে এত বেশি জানে ওরা! কিন্তু ফাঁস করে না কিছু। গত ত্রিশ বছরে ওশন স্ট্রীম সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, তার বেশিরভাগই ওদের আবিষ্কার। একটা উদাহরণ দিই। ক্রমওয়েল স্ট্রীম। সম্ভবত গিলবার্ট আইল্যান্ডের কাছে এর উৎপত্তি, এবং আট হাজার মাইল পর্যন্ত দৌড়, সেই গালাপাগোস পর্যন্ত। প্রায় একশো মাইল চওড়া একটা স্রোত এটা, গালফ স্ট্রীমের তিনগুণ পানি বহন করে, সারফেস থেকে পাঁচশো ফিট নিচে দিয়ে বয়ে যায়, বিষুব রেখা বরাবর। বোধগম্য কারণেই রাশিয়ানরা এর ভারী ভক্ত। এই স্রোত ধরে এগোতে পারলে ওদের সাবমেরিনগুলো যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে আরও অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছুবে।

'আরও একটা কারেন্ট রয়েছে, যেটার দৌড় গালফ স্ট্রীমের মোটামুটি উল্টোদিকে, কিন্তু তার নিচে দিয়ে। একই জায়গায় এই পরস্পর বিরোধী জোড়া স্রোতের নির্দিষ্ট একটা আঙ্গিকগত প্যাটার্ন আছে, তাতে করে চরম অনুকূল ক্লাইমেটিক কনডিশন ক্রিয়েট করা সম্ভব। ইচ্ছে করলে একে তোমরা ক্লাইমেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে পারো। কিন্তু জোর দিয়ে বলতে পারি আমি, কারও কোন ক্ষতি হবে না জেনে নিয়েই এই ধরনের একটা কাজে হাত দেবার কথা ভাবতে পারত সে। কিন্তু তোমরা বলছ তাকে যদি জোর করা হয়...' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।

তারপর সবার দিকে একবার করে তাকালেন তিনি। 'দুঃখিত। গোটা ব্যাপারটাই অত্যন্ত জটিল এবং আনপ্রেডিক্টেবল। মনে হয়েছিল, প্রকাণ্ড আকারের অসংখ্য পাইক্রিট ভেলা তৈরির প্ল্যান ছিল তার। নিশ্চয়ই জানো যে একটা আইসবার্গের বেশির ভাগটাই পানির নিচে ডুবে থাকে? একটা ভেলার ওপরে স্রেফ সুপারকুলড ওয়াটার আর স'ডাস্ট স্প্রে করে ক্রমশ সেটাকে একেবারে তলায় না ঠেকা পর্যন্ত নামিয়ে দেয়া যায়। এইভাবে তৈরি হয়ে গেল একটা বাঁধ। এই রকম একটা বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল—সাইবেরিয়া আর রাশিয়ান দ্বীপ স্যাকলিনের মাঝখানে। দক্ষিণ জাপান আর ঈস্ট সাইবেরিয়ান কোস্টের মাঝখানে রয়েছে দ্বীপটা। বাঁধটা হওয়ার কথা ছিল তাতার স্ট্রেটের ওপর, শীতকালে ওটা জমাট বরফ হয়ে থাকে। স্বভাবতই, কথাটা কানে যেতে জাপানীরা তো খেপে আগুন। কারণ এই বাঁধ তাদের জন্যে আবহাওয়াগত বিপর্যয় ডেকে আনবে।

'সেটা এইভাবে। দক্ষিণ স্যাকলিন ছুঁয়ে আছে জাপান সাগরের গরম পানি, উত্তর স্যাকলিনকে ঘিরে রেখেছে ওকহোটস্ক সাগরের ঠাণ্ডা পানি। প্রতিটি উঁচু জোয়ারের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ গরম পানি দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে পড়ে। এবং

তারপরই উল্টোদিকের জোয়ারের সাথে উত্তর থেকে দক্ষিণে ফিরে আসে সেই পানি। রাশিয়ানরা বাঁধ তৈরি করলে, তাতে বিরাট একটা ওয়ান-ওয়ে গেট থাকবে. কাজেই জোয়ারের সাথে গরম পানি উত্তরে ঠিকই আসবে, কিন্তু যে উল্টোদিকের জোয়ারের সাথে পানি ফিরে আসতে শুরু করবে অমনি বন্ধ হয়ে যাবে গেট, ফলে পানির আর ফেরত আসা হবে না। পরবর্তী আরেকটা উঁচু জোয়ার, আরও গরম পানি।'

'পানির মতই সহজ,' ম্যাপের দিকে চোখ রেখে বলল নোলার। 'জাপানীদের খেপে আগুন হবার কারণটা বোঝা গেল।'

'কিন্তু ধারণাটা রাশিয়ানদের খুব পছন্দ,' বললেন নোলটন। 'প্রতিটি জোয়ারের সাথে গরম পানি প্রবাহের পরিমাণ ভোলগা, ডন এবং নাইপার এই তিন নদীর দৈনিক মোট প্রবাহের সমান। বাঁধ দেয়া হলে এই গরম পানি দ্বীপের নর্দার্ন কোস্ট এবং মেইনল্যান্ড সাইবেরিয়া কোস্টে পৌঁছুবে। হিসেব করে দেখা গেছে, এতে করে ইস্টার্ন সাইবেরিয়ার টেমপারেচার বিশ ডিগ্রী পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, তখন আর ওখানে বরফ বলেও কিছু থাকবে না। কিন্তু বেচারী জাপানীরা দেখবে, তারা যার কাছ থেকে উপকার পেয়ে আসছে সেই কুরোশিয়ো স্ট্রীম আরও উত্তরে সরে গেছে, কারণ ওকহোটস্ক সাগর গরম হয়ে উঠেছে। রাশিয়ানরা বাঁধটা তৈরি করবেই, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। প্ল্যানও ঘোষণা করেছিল তারা। সেজন্যেই সেসলভ পাইক্রিট নিয়ে খেলছিল।'

'আপনি একে খেলা বলবেন?' নোলার।

ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে একটু হাসলেন নোলটন। 'জাস্ট এ ফিগার অভ স্পীচ।'

'আসলে কি এই রকম একটা বাঁধ তৈরি করা সম্ভব?' রানা।

'বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হবে। কিন্তু সে-কথা জেনেই তো প্ল্যানে হাত দিয়েছিল ওরা। ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিকেরও অভাব নেই। আসল প্রশ্ন হলো, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা কতটা আছে তোমার, এবং কতটা তুমি খরচ করতে তৈরি আছ। অথবা, কতটা ঝুঁকি নিতে রাজি আছ। কাজটা করতে গিয়ে সহজেই বরফ-যুগের সূচনা ঘটিয়ে দিতে পারো তুমি।'

হাতের তালুতে মুখ রেখে গোগ্রাসে বৃদ্ধের কথা গিলছিল ড. এডওয়ার্ডস, চোখ দুটো বিস্ফারিত। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, বলল, 'জেসাস!'

টেবিলের চারধারে বসা পাথরের মূর্তিগুলো এই প্রথম অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে উঠল।

নিঃশব্দে হাসলেন নোলটন। 'দুঃখিত, জেন্টলমেন। কিন্তু আমাদের গাড়ি আর ফ্যাক্টরিগুলোর কারণে এই ঘটনা হয়তো এরই মধ্যে ঘটতে শুরু করেছে। জানোই তো, বাতাসে আমরা বিপুল পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ছি। এ-থেকেই তথাকথিত গ্রীন হাউজ এফেক্টের উৎপত্তি হচ্ছে। সূর্য থেকে ওয়ার্মিং র‍্যাডিয়েশন আসার পথ সুগম করছে এটা. কিন্তু উত্তাপকে মহাশূন্যে ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছে। এভাবে, তাপ জমাচ্ছি আমরা। প্যারাডকসিক্যালি, এটাই নতুন একটা বরফ-যুগের সূচনা ঘটাতে পারে। আর্কটিক সমুদ্র যদি গলে যায়, অবশ্যই বাষ্প হয়ে কর্পূরের

মত উবে যেতে পারে সেটা। এর ফলে মেইনল্যান্ড গ্লেসিয়ারে ভারী তুষারপাত দেখতে পাবে। একটা গ্লেসিয়ারকে তুমি ভিজে ময়দার প্রকাণ্ড একটা তাল ভাবতে পারো। প্রতিটি তুষারপাতে গ্লেসিয়ারের ওজন যাবে বেড়ে, তাতে এর ওপরে, এর ভেতরে চাপও বাড়বে, এবং যেদিকে রেজিস্ট্যান্স কম সেদিকে মুভ করবে সেটা। মানে, গ্লেসিয়ারগুলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে আইস-এজ, তাই না?'

'গ্রীনল্যান্ডের বরফ গলে যাওয়ার সাথে আপনার এই পয়েন্টের কোন বিরোধ আছে কি?' জানতে চাইল রানা।

'আছে, আবার নেইও। হঠাৎ করে বরফ গলতে শুরু করলে তার প্রতিক্রিয়াও হবে আকস্মিক। বরফ-যুগ শুরু হতে লম্বা সময়ের দরকার পড়ে। এই সব কারণেই সেসলভ বলত, মানুষ আসলে এখনও সাংঘাতিক অজ্ঞ, তাই কাজ শুরু করার কথা এখন ভাবাও যায় না।'

প্রায় দড়াম করেই খুলে গেল দরজা। 'নোলার!' একটা ব্যাপার চেক করে দেখতে চাই বলে বেরিয়ে গিয়েছিল একজন এজেন্ট, হন হন করে ভেতরে ঢুকে নোলারের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'ছায়া ছায়া কালো দাগগুলো!'

'কি?' জানতে চাইল নোলার।

'কিছু একটা মনে পড়তে চাইছিল অনুভব করে চেক করতে গিয়েছিলাম,' বলল এজেন্ট। 'নর্দার্ন গ্রীনল্যান্ডে একটা রাশিয়ান প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছিল, মনে আছে তোমার? মাস দুয়েক আগে?'

'আবছাভাবে,' বলল নোলার। 'পোলার রিকনিস্যান্সে, তাই না?'

'রাইট। ক্রুরা মারা পড়েছিল সবাই। আইস-ক্যাপে আমাদের পোলার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্প, ক্যাম্প জিরোর একদল আর্মি ইঞ্জিনিয়ার লাশগুলো উদ্ধার করে। কর্নেল রডহেম ছিল কমান্ডার। তার রিপোর্টে বলা হয়েছিল, তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়ে বিধ্বস্ত প্লেনটা দ্রুত চাপা পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু ধ্বংস স্তূপের কাছে ছোট্ট একটা যন্ত্র দেখতে পায় সে, দেখতে অনেকটা শস্য-ঝাড়াই ইকুইপমেন্টের মত। ক্যাম্পে ফিরে আসার পর সে তার জুতোয় কালো রঙের পাউডার আবিষ্কার করে।'

'কার্বন!' বলল রানা।

'রডহেমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফাইন ব্ল্যাক পাউডার অভ এ কার্বনিফেরাস নেচার। কোন ধরনের আগুন থেকে সৃষ্টি হতে পারে জিনিসটা, কিন্তু প্লেনে আগুন লেগেছিল তার কোন প্রমাণ তারা পায়নি। ভাঙা ফিউজিলাজের ভেতর বড় আকারের কিছু ড্রামও ছিল।'

'তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই,' বলল নোলার। 'ছায়া ছায়া কালো দাগগুলো কার্বন না হয়েই যায় না।'

'যদি মনে করি,' অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বলল রানা, 'রাশান ওই প্লেনটাকে সেসলভই পাঠিয়েছিলেন? যুক্তরাষ্ট্রকে সাবধান করে দেবার জন্যে? অথবা, ওই একই উদ্দেশ্যে, প্লেনটা যাতে মার্কিন আর্কটিক ক্যাম্পের নাগালের মধ্যে বিধ্বস্ত হয় সে-ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন?'

রানার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকল। শক্ত নার্ভের মানুষগুলো কেমন যেন

বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কেউই প্রতিবাদ বা আপত্তি তুলল না

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ডক্টর নোলটন। 'সেসলভ আরও খানিক দূর এগোবার চেষ্টা করেছে বলে মনে করি আমি।'

'ঠিক কি বলতে চান, ডক্টর নোলটন?' নোলার জানতে চাইল

'দু'নম্বর চিঠিটা। অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি ওটার কথা। যতই ভাবছি ততই ধাঁধা লাগছে।'

'কি রকম?'

'আর একবার দেখতে পারি?'

বৃদ্ধের হাতে একটা কপি ধরিয়ে দিল রানা। মন দিয়ে আরও দু'বার পড়লেন তিনি। 'দেখো না, কি লিখেছে—অতি ভোজন ব্যাপারটা অতি-খাটুনির মতই ক্ষতিকর, বদহজমের পরিণতি সম্পর্কে সবারই সতর্ক থাকা উচিত। হুম।' একে একে সবার দিকে তাকালেন তিনি, চোখে প্রশ্ন। 'তারপর লিখেছে—মাঝেমধ্যে চাপ প্রতিহত করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে, পিছিয়ে দাঁড়াতে হয়, এবং খুব বেশি সরে যাবার আগে চিন্তা করতে হয়। মানেটা কি?'

'তিনি গ্রেফতার হতে পারেন, ওখানে কি সেই আভাসই দেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'তারিখ দেয়া আছে—চোদ্দই মার্চ। তার অদৃশ্য বা মৃত্যু হওয়ার খুব বেশি আগে নয়। তাকে চাপের মধ্যে রাখা হয়ে থাকলে গ্রেফতারের সম্ভাবনা তার মনে স্বভাবতই উঁকি দেবার কথা।'

'তারপর লিখেছেন,' এডওয়ার্ডস বলল, 'বর্তমান দুনিয়া যতটুকু অনুমতি দেয় তার চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আমরা যদি কাজ করতে পারতাম, নিশ্চিতভাবে জানি তার ফল সবার জন্যেই আরও ভাল হত।'

'এবং তারপর,' বলল রানা, 'আশা করি আবার হয়তো আমাদের মধ্যে দেখা হবে। ডক্টর, গোটা চিঠিটা এইভাবে অর্থ বের করে পড়লে এর ভেতর থেকে স্পষ্ট একটা মেসেজ পেয়ে যাব আমরা। পরের বাক্যটা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, তিনি তার গ্রেফতার সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন—বর্তমানে আমার যা শারীরিক অবস্থা তাতে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

'হুঁ।'

'চোদ্দই মার্চের পর তাঁর কাছ থেকে কোন খবরাখবর পেয়েছেন আপনি?'

'না। শেষ চিঠি পেয়েছি নিউ ইয়ারে। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরা কোন আভাসই ছিল না এসবের।'

'দেখুন, বুকলেট রহস্য আমার কাছে এখনও পরিষ্কার নয়,' তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলেও চুপ করে বসে থাকতে পারল না এডওয়ার্ডস। 'ধরা যাক, প্রফেসর সেসলভকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে তাঁকে দিয়ে জায়গান্টিক কোন প্রজেক্টে কাজ করানো হচ্ছে—হয়তো পোলার আইস সংক্রান্ত কোন প্রজেক্টই হবে সেটা। যাই হোক, তিনি গায়েব হয়ে গেলেন কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ব্রিটেনে ডক্টর নোলটনকে নিয়মিত এবং আমেরিকায় প্রফেসর

ওয়ার্ডকে মাঝে মধ্যে চিঠি লিখতেন তিনি। শেষ যে চিঠিটা তিনি ওয়ার্ডকে লিখলেন, ধরি, সেটা একটা ওয়ার্নিং। এই চিঠিটাও বরাবরের মত প্রিন্সটনে পাঠালেন তিনি।'

'বলে যান,' বলল নোলার।

'কিন্তু পরেরটা প্রিন্সটনে এল না। এল আমার কাছে। কেন? কারণ ওটা প্রফেসরের নামে কিন্তু আমার ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। প্রশ্ন হলো, কোন কারণ না থাকলে এই রকম একটা বিদঘুটে কাজ প্রফেসর সেসলভ কেন করবেন?'

'আপনি থাকেন কোথায়?' জানতে চাইল নোলার।

'নিউ ইয়র্ক অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক।'

'প্রফেসর ওয়ার্ড ওখানে ছিলেন কখনও?'

এডওয়ার্ডস বলল, 'যতদূর জানি, ছিলেন না।'

'বরং খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার,' বলল রানা। ঠিক পরিষ্কার নয়, কিন্তু মনের গভীর থেকে কি একটা সম্ভাবনা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সেটা কি বুঝতে চেষ্টা করলেই ঝপ করে নেমে যাচ্ছে আরও গভীরে।

নোলারের দিকে তাকাল এডওয়ার্ডস। 'ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'হেলপ ইওরসেলফ।'

ডায়াল করল এডওয়ার্ডস।

'সি.আই.এ-র কথা বলুন, তাড়াতাড়ি কাজ হবে,' বলল নোলার।

'মুনলিট ডেভেলপমেন্টস। গুড মর্নিং।'

'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী থেকে বলছি,' বলল এডওয়ার্ডস। 'আপনাদের কোন অ্যাপার্টমেন্টে এডউইন ওয়ার্ড নামে কোন ভদ্রলোক কখনও ছিলেন কিনা জানতে চাই। প্রফেসর এডউইন ওয়ার্ড।'

'এক মিনিট, প্লীজ।'

তিন মিনিট পর লাইনে ফিরে এল মেয়েটা। 'উইলিয়াম ওয়ার্ড নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। আর একজন ছিলেন, হেনরী ওয়ার্ড। এবং মিসেস এগনেস ওয়ার্ড।'

'পেশা?'

'উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন লইয়ার। হেনরী ওয়ার্ড থিয়েটার প্রযোজক। মিসেস এগনেস ওয়ার্ড একজন বিধবা।'

'আর কেউ ছিলেন না?'

'না, স্যার।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল এডওয়ার্ডস। এবার ফোন করল প্রফেসর ওয়ার্ডের সেক্রেটারি মেরীকে। 'ড. এডওয়ার্ডস। প্রফেসর ওয়ার্ড কি কখনও নিউ ইয়র্কে ছিলেন?'

'না তো!'

'ঠিক জানেন?'

'জানি। নিউ ইয়র্ক তিনি পছন্দ করতেন না।'

রিসিভার রেখে দিল এডওয়ার্ডস। 'না।'

'মেসেজটা সেসলভই পাঠিয়েছেন কিনা তা আমরা জানি না,' বলল নোলার।

'হয়তো তাঁর পক্ষ থেকে অন্য কেউ পাঠিয়েছে। জিনিসটা কি? একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পেপার, সেলসিয়াসের টেমপ্যারেচার ভ্যারিয়েশন টেকনিক সংক্রান্ত।'

'কিন্তু ডক্টর এডওয়ার্ডসের কাছে কেন?' বলল রানা। 'কে.জি.বি.-ই বা কেন চুরি করে নিয়ে গেল এনভেলাপটা?' এডওয়ার্ডসের দিকে দ্রুত তাকাল ও 'কি লেখা ছিল এনভেলাপে?'

'এক মিনিট,' বলল এডওয়ার্ডস। মনে পড়ল, তিনটে ভুল দেখেছিল সে। বুক পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে ঠিকানাটা লিখল। তার হাত থেকে নিয়ে থ্রী-এম প্রজেক্টরে ঢুকিয়ে দিল নোলার কাগজটা। সবাই যাতে দেখতে পায়।

PROFESSOR EDWARD, FAGS
60 E 75th ST, NEW YORK, USA

রানা বলল, 'দেখো, ঠিকানাটা সামান্য একটু বদলে যদি এভাবে লেখা হত—'একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে নোলারের হাতে দিল ও, নোলার মেশিনে ঢুকিয়ে দিল সেটা।

Professor Ed Ward, FAGS
60 E 75th New York, USA

'—তাহলে পিয়ন এটা ড. এডওয়ার্ডসকে ডেলিভারি দিত না

সবাই তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'পিয়ন চিঠিটা ফেরত নিয়ে যেত, পোস্টাপিসে ওটার গায়ে সীল মারা হত, "এই ঠিকানায় প্রাপককে পাওয়া যায়নি।" এরপর কি ঘটত, নোলার?'

'নিয়ম অনুসারে প্রফেসর ওয়ার্ড, ফ্যাগসকে খুঁজে বের করত পোস্টাপিস,' বলল নোলার। 'খুঁজে বের করতে তেমন কোন অসুবিধে হত না ওদের, জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সাইনপোস্টটা সাহায্য করত ওদের।'

'কে.জি.বি. এনভেলাপটা চুরি করেছে,' বলল রানা। 'কেন? দাঁড়াও...' মনের গভীর থেকে উঠি উঠি করেও রহস্যের সমাধানটা উঠছে না। '...এনভেলাপের ভেতর থেকে আমরা একটা তথ্যই বলো আর মেসেজই বলো, পেয়েছি। তার কারণ, বুকলেটটার ওপরই বেশি মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এনভেলাপের বাইরেও কি কোন মেসেজ বা তথ্য দেয়া আছে? সুন্দরভাবে টাইপ করা, ছোট্ট একটা ঠিকানা...'

স্ক্রীনের দিকে সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ঠিকানার প্রতিটি হরফ, প্রতিটি সংখ্যা খুঁটিয়ে দেখছে ওরা।

অনেকক্ষণ পর চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা কাউকে কিছু বলতে হলো না, রানার মুখে অদ্ভুত একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠতে দেখে বসে থাকতে পারল না কেউ। রানার পিছু পিছু সবাই বড় ওয়াল ম্যাপটার সামনে এসে দাঁড়াল।

'দেখা যাক,' বিড় বিড় করে বলল রানা, 'সিক্সটি ডিগ্রী ঈস্ট, এবং সেভেনটি ফাইভ...না, দক্ষিণ হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, কাজেই সেভেনটি ফাইভ ডিগ্রী উত্তর—এখানে...' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল রানা। '...এখানে নিয়ে আসছে আমাদের।'

সোভিয়েত আর্কটিকে ওটা নোভাইয়া জেমলাইয়া দ্বীপ. ল্যাটিচ্যুড আর লঙ্গিচ্যুড রেখা পরস্পরকে ভেদ করেছে ওই দ্বীপে

তেরো

'নোভাইয়া জেমলাইয়া?' রানার পিছন থেকে বললেন ডক্টর নোলটন 'নিষিদ্ধকরণ চুক্তির আগে ওটা ওদের নিউক্লিয়ার প্রুভিং গ্রাউন্ড ছিল—ওখানে অ্যাটমিক আর হাইড্রোজেন বোমা টেস্ট করত ওরা।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভাবে বলল নোলার।

'সব মিলিয়ে কি দাঁড়াল তাহলে?' বলল রানা। 'সেসলভ, যিনি মারা গেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে, মনে হচ্ছে খুব সম্ভব তিনি মারা যাননি। সাহায্যের জন্যে বা সতর্ক করার জন্যে একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন তিনি। আমরা জানি সোভিয়েত সরকার তাঁকে নাগরিকত্ব দিলেও, সেটা গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেসলভকে তাঁর নিজের দেশে ফিরতে বাধা দেয়া হয়েছে। নানা উপলক্ষে কয়েকবারই রাশিয়ার বাইরে তাঁকে আসতে দেয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু স্ত্রীকে সাথে করে আনতে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ একটা পিছুটান ছিলই। অনিচ্ছা থাকলেও আবার তাঁকে রাশিয়ায় ফিরে যেতে হয়েছিল।'

'তাঁর স্ত্রী মারা যাবার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এটারও তাৎপর্য আছে।'

'আমরা দেখতে পাচ্ছি,' বলে চলল রানা। 'এ-ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগেছে কে.জি.বি.। সম্ভবত বুকলেটটা তাদের হাত ফস্কে বেরিয়ে এসেছে বলেই আলোচনা করে আমরা বুঝতে পেরেছি, পোলার-আইস নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়া সম্ভব, টেকনিকাল জ্ঞান থাকায় ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিয়ে বসার যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি রাখে রাশিয়া। আরও পেলাম, ছায়া ছায়া কালো কিছু দাগ এবং নিউক্লিয়ার টেস্ট গ্রাউন্ড। দাগগুলো সম্ভবত কার্বন ডাস্ট। একমাত্র প্রশ্ন হলো, এসবের অর্থ কি?'

'এবং অর্থটা জানার সাথে সাথে দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন দেখা দেবে,' বলল নোলার, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা জগৎ এ ব্যাপারে কি করতে পারে?'

'অর্থটা জানাই আসল এবং আগের কথা,' বললেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। 'সেটা জানা গেলে হয়তো সব ধরনের আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করা যাবে।'

'সেটা যে কি ভয়ঙ্কর চাপ হবে, ভাবতে গিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার,' বলল নোলার। 'আমরা ওদের চোখের জলে নাকের জলে করে ছাড়ব।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'ব্যাপারটা এখান থেকে সরাসরি সি.আই.এ. ডিরেক্টরের কাছে যাবে, সেখান থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে।'

ধীর পায়ে টেবিলের কাছে ফিরে এল রানা সেসলভের চিঠিটা আরেকবার পড়তে চায় অনেক কথাই বলা হচ্ছে, কিন্তু সবই আন্দাজ করে। ওর মনের

গভীরে কিসের একটা ইঙ্গিত ছটফট করছে উঠে আসার জন্যে। চেয়ারে বসে মনটাকে ওদের কথাবার্তা থেকে সরিয়ে আনল ও বুঝতে চেষ্টা করল আসলে কি বলতে চেয়েছেন সেসলভ। যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় প্রফেসর ওয়ার্ডের সাথে কথাবার্তা হয়েছিল সেসলভের। প্রথম চিঠিতে সে-কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এরপর আরেকটা চিঠি। এতে তিনি আভাসে কিছু বলতে চেয়েছেন। তারপর এল বুকলেটটা। ওতে টেমপারেচার ভ্যারিয়েশনের কথা আছে সেসলভের প্রিয় সাবজেক্ট, রিসার্চের সাবজেক্ট। টেমপারেচার ভ্যারিয়েশন নিয়ে কাজ শুরু করেছে রাশিয়া, সম্ভবত সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। কোথায় শুরু হয়েছে কাজ? এর উত্তর দিচ্ছে এনভেলাপটা এইটুকুই কি সব? নাকি আরও কিছু বলতে চেয়েছেন সেসলভ?

চিঠিটা আবার পড়ল রানা। তারপর একটা কাগজে কপি করল সেটা, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় বাদ দিল কিছু কিছু শব্দ। কপি করা চিঠিটার চেহারা এই রকম দাঁড়াল···

'আমার অবস্থা এখন একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে থেমে আছে···অতি-খাটুনির মতই ক্ষতিকর—বদহজমের পরিণতি সম্পর্কে সবারই সতর্ক থাকা উচিত···চাপ প্রতিহত করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে···সরে যাওয়া···আমাদের মধ্যে যে আলাপ হয়েছিল···আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে আমরা যদি কাজ করতে পারতাম···তার ফল সবার জন্যেই ভাল হত···দেখা হবে···যা শারীরিক অবস্থা···ভ্রমণ···কষ্টকর।'

চিঠির তারিখ, চোদ্দই মার্চ। পরের মাসে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করল, সেসলভ মারা গেছেন। মে মাসে কর্নেল ওসিপভ জানাল, সেসলভ মারা যাননি, তাঁকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরের মাসে এল এনভেলাপ আর বুকলেট। এসব থেকে অর্থ বের করা হচ্ছে—'অ্যাকাডেমিশিয়ান সেসলভ টেমপারেচার ভ্যারিয়েশনের ওপর কাজ করছেন··· নোভাইয়া জেমলাইয়ায়'।

ডক্টর নোলটন বলছেন, অসুস্থতা সম্পর্কে বেশি কথা বলার মানুষ নন সেসলভ। অথচ শারীরিক অসুস্থতার কথা দিয়েই তিনি শুরু করেছেন চিঠিটা। ভ্রমণে তাঁর অরুচি হবার কথা নয়, অথচ বলেছেন, ভ্রমণ তাঁর জন্যে কষ্টকর হবে। ভ্রমণ কষ্টকর কেন? দুর্গম বলে? তারপর বলছেন, আমরা যদি আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেতাম। এর মানে কি? হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত সমাধানটা মনের গভীর থেকে উঠে এল। ধীর পায়ে ডক্টর নোলটনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কপি করা চিঠিটা ধরিয়ে দিল তাঁর হাতে। সংক্ষিপ্ত চিঠিটা পড়লেন তিনি, তাঁর বড় বড় চোখ জোড়া ফেরালেন রানার দিকে, তারপর ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালেন একবার। রানা এবং ডক্টর নোলটন দু'জন একসাথে নোলারের সামনে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধের বাড়ানো হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ল নোলার। মুখ তুলে তাকাল। 'কি ব্যাপার?'

'সেসলভ চাইছেন তোমরা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসো,' বলল রানা।

নোলার দ্বিমত পোষণ বা প্রতিবাদ করে ওঠার আগেই ডক্টর নোলটন শুরু

করলেন. 'চিঠিতে ফালতু কথা লেখার মানুষ সেসলভ নয়. তার মেসেজে আমরা শুধু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই আশা করব। নিজের শরীর সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছে; সেটাই আমার সন্দেহের কারণ। কি বলছে দেখো—এক. সে চাপ প্রতিহত করছে দুই. তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিন. নোভাইয়া জেমলাইয়ায় আছে সে। চার. তার ইচ্ছে প্রফেসর ওয়ার্ডের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করবে। পাঁচ. ওয়ার্ডের সাথে আবার দেখা হবে বলে আশা রাখে। ছয়. ভ্রমণ করা কষ্টকর। সব মিলিয়ে কি দাঁড়াল? সেসলভ পরিষ্কার বলতে চাইছে, আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল নোলার। 'কিন্তু এসবই আন্দাজ করে ধরে নেয়া হচ্ছে।'

অবাক হয়ে নোলারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডক্টর নোলটন, তারপর শ্রাগ করে বললেন, 'আমি তা মনে করি না।'

নোলারের দিকে এক পা এগোল এডওয়ার্ডস। তার কথা কেউ গুরুত্ব দিয়ে শুনবে কিনা তা না ভেবেই যা সত্যি বলে মনে হলো, গড় গড় করে আউড়ে গেল সে। 'চিঠিটা থেকে অন্য কোন অর্থ বের করার চেষ্টা করে দেখুন, কোন অর্থই বের হবে না। রাশিয়ানরা কিছু একটা করতে যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক কি, সেটা আমরা কেউ জানি না। এক বা দু'ডজন প্রজেক্টের যে-কোন একটা হতে পারে। প্রফেসর ওয়ার্ড বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো নিশ্চয় করে বলতে পারতেন। চিঠিটা লেখাও হয়েছে তাঁর কাছে। কিন্তু প্রফেসর ওয়ার্ড মারা যাবার পর এখন শুধু একজনই জানেন। প্রফেসর সেসলভ। তিনি আমাদের জানাতে চাইছেন। সেজন্যেই বেরিয়ে আসতে চাইছেন তিনি।'

'তা না হলে ঠিক কোথায় তিনি আছেন সে-কথা তোমাদেরকে জানাবার আর কি কারণ থাকতে পারে?' বলল রানা। 'এনভেলাপে যে ঠিকানা দিয়েছেন তিনি. সেটার কোন দরকার ছিল না। রাশিয়ানরা কি করতে যাচ্ছে শুধু এই খবরটাই যদি দেবার ইচ্ছে থাকত চিঠিটা তাহলে প্রিন্সটনে পাঠালেই পারতেন।'

'যুক্তরাষ্ট্রের মেইল সার্ভিসের দক্ষতা নিয়ে একটা জুয়া খেলেছেন সেসলভ.' বলল এডওয়ার্ডস। 'কোথায় আছেন তিনি তা আপনাদেরকে জানাবার ওটাই তাঁর সামনে একমাত্র পথ ছিল। তিনি ধরে নিয়েছেন প্রফেসর ওয়ার্ড ঠিকানাটা দেখে অবাক হবেন. এবং দুই আর দুই যোগ করে রহস্যটা উদঘাটন করতে পারবেন।'

সাথে সাথে কিছু বলল না নোলার, কিন্তু তার দ্বিধা কাটল না। তবে সবার যুক্তি মনে রেখে সন্দেহ মুক্ত হবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল সে। অফিসের বিভিন্ন সেকশনের সাথে যোগাযোগ করল। সোভিয়েত আর্কটিকে গত এক বছরে যা যা ঘটছে তার লিখিত বিবরণ সামনে নিয়ে বসল বিশেষজ্ঞরা. শুরু হলো অ্যানালিসিস নোভাইয়া জেমলাইয়ার ওপর বিশেষ নজর রাখা হলো। আরেক দল বসল ট্র্যান্সমিটারের সামনে। দুনিয়ার হাজারো শহর থেকে খবর চেয়ে পাঠাল তারা। তৃতীয় একটা দল স্যাটেলাইট থেকে তোলা হাজার হাজার ফটো নিয়ে বসল, চুল চেরা বিশ্লেষণ শুরু হলো সেগুলোর। বাকি সবাই অধীর আগ্রহের সাথে কনফারেন্স রুমে অপেক্ষা করছে। ইতোমধ্যে আরও তিনজন কর্মকর্তার আবির্ভাব হয়েছে

এখানে। ডক্টর নোলটন, এডওয়ার্ডস এবং রানা তাদের দু'জনকে এরই মধ্যে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। বাকি একজন এখনও পুরোপুরি দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

অবশেষে উত্তর এল। সম্প্রতি তোলা স্যাটেলাইট ফটো বিশ্লেষণ করে প্রমাণিত হয়েছে, সোভিয়েত আর্কটিকে ওরা একটা বিল্ডিং তৈরি করেছে। দোতলা। ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মে তাড়াহুড়ো করে পাহাড় চূড়ায় তৈরি করা হয়েছে ওটা শুধু তাই নয়, আরও দু'একটা জায়গার মত নোভাইয়া জেমলাইয়াতেও রেডিও ট্রাফিকের আকস্মিক বাড়াবাড়ি লক্ষ করা গেছে। যদিও বাড়াবাড়ির হারটা অস্বাভাবিক নয়, তবু বাড়াবাড়ি তো বটে। তাছাড়া, ব্যাপারটার গুরুত্ব বেড়ে গেল আরেকটা তথ্য থেকে। তা হলো, মেসেজগুলো আসা-যাওয়া করেছে হাই-গ্রেড মেকানিক্যালী জেনারেটেড সাইফারের সাহায্যে, যার কোন অর্থই বের করতে পারেনি কমপিউটার। তবে ওই রেডিও সিগন্যালের ডি/এফ বিয়ারিং থেকে জানা গেছে মেসেজ পাঠানো এবং গ্রহণ করার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে ওই বিল্ডিংটা।

এরপর নোলারের মনেও সন্দেহের অবকাশ খুব কমই থাকল। গোটা ব্যাপারটা সাথে নিয়ে সি.আই.এ.-র ডিরেক্টরের সাথে দেখা করতে গেল সে। যাবার আগে ডক্টর নোলটন, রানা এবং এডওয়ার্ডসের দিকে তাকাল, বলল, 'তোমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে চীফকে আমি কোন যুক্তিই দেব না, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।' তিনজন কর্মকর্তাও গেল তার সাথে।

আবার শুরু হলো অপেক্ষার পালা। যদিও মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল নোলার। মুখে হাসি হাসি ভাব। বলল, 'আপনারা বরং ভেবে-চিন্তে দেখুন কিভাবে তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব। বিশ মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করছেন আমাদের ডিরেক্টর।'

আবার অপেক্ষা। সামনে কফির কাপ নিয়ে বসে থাকল সবাই। মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা চলছে, হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে এই মুহূর্তে ঠিক কি ঘটছে। সবার মনেই একটা প্রশ্ন, কি সিদ্ধান্ত হয়! চেহারা দেখে কিছু বোঝা না গেলেও, হরদম পায়চারি করতে দেখে নোলারের মনের অবস্থা টের পেতে অসুবিধে হয় না। হাত দুটো পিছনে বাঁধা, এক হাতের আঙুলে ধরা রয়েছে একটা ফটো. স্যাটেলাইট থেকে তোলা। মাঝে মধ্যে ডক্টর নোলটন আর রানার দিকে তাকাচ্ছে।

রানার পাশের চেয়ারে বসে আছে এডওয়ার্ডস। কেমন যেন বিমূঢ় আর হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। প্রথম থেকে গোটা ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে অবিশ্বাস্য, দুঃস্বপ্নের মত লাগছে তার কাছে। এই তো সেদিন তার একমাত্র সমস্যা ছিল বৃষ্টি আর তুষার মাথায় করে কিভাবে বাড়ি ফিরবে তারপরই তার নিরুপদ্রব জীবনে একের পর এক অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে শুরু করল। তাড়া করা হলো তাকে, ছুরি মারা হলো, মিথ্যে খুনের দায় তার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করা হলো। তারপর কিভাবে যেন খোদ সি. আই. এ. বিল্ডিঙের কনফারেন্স রূমে এসে পড়ল সে। আর এখন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কি সিদ্ধান্ত নেন, তার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। অবাক হয়ে ভাবল এডওয়ার্ডস, আমাকে এরা আলোচনার মধ্যে রাখল কেন? কথা বলতে দিল

কেন? ব্যাপারটা স্বপ্ন কিনা জানার জন্যে উরুতে চিমটি কাটতে কাটতে ঘা হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে, তবু আরেকবার কাটল। উঁহুঁ. স্বপ্ন নয়, ব্যথা লাগছে!

সময় বয়ে চলেছে। অনেকক্ষণ হলো, কেউ আর কারও দিকে তাকাচ্ছে না ঘড়ি দেখতেও ভুলে গেছে সবাই। পায়চারি থামিয়ে টেবিলের কোণে বসে পড়েছে নোলার। সবাই স্থির। তারপর এক সময় ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিল এডওয়ার্ডস। দ্রুত হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল নোলার আর কেউ নড়ল না। প্রায় সাথে সাথে রিসিভার রেখে দিয়ে লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নামল নোলার, ছুটে চলে এল দরজার সামনে। দরজা খুলে ছোঁ মেরে কারও হাত থেকে একটা কাগজ নিল সে, সেটা পড়তে পড়তে দ্রুত ফিরে এল টেবিলের কাছে। তারপর সবার দিকে একবার করে তাকাল সে। আবার চোখ রাখল কাগজের ওপর।

'প্রেসিডেন্টের একটা অর্ডার। আমি পড়ছি…

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের মিত্ররা আজ যে একটা নতুন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই হুমকির সাধারণ প্রকৃতি কি সেটা জানাই যথেষ্ট নয়। কাজেই আমরা আমাদের সম্ভাব্য সমস্ত যোগ্যতা এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে জানতে চাইব এই হুমকির সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি। দেশের অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট এবং স্টেটস এজেন্সীর কাজ এটা। তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হবে।

'এখানে আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীকে নির্দেশ দিচ্ছি, প্রফেসর আইজ্যাক সেসলভকে তাঁর বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করা হোক, এবং তাঁকে সসম্মানে ও নিরাপদে আমাদের দেশে নিয়ে আসা হোক।

'এ প্রসঙ্গে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, এ-ধরনের একটা মিশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্ভিস পার্সোনেলরা সরাসরি অংশগ্রহণ করলে সেটা সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল হবে। কাজেই সে অনুমতি দেয়া হলো না। আমি আবার বলছি, সে অনুমতি দেয়া হলো না।

'ভিন দেশের লোকজন নিয়ে একটা অভিযাত্রীদল গঠন করার নির্দেশ দেয়া হলো মিত্রদের সাথে এ-ব্যাপারে এখুনি আমি আলোচনা শুরু করব

'এই একটি মাত্র শর্ত সাপেক্ষে যা ভাল মনে করবে তাই করার পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হলে সি.আই.এ-কে। প্রস্তুতি পর্ব দ্রুত সেরে ফেলার জন্যেও নির্দেশ দিচ্ছি আমি। প্রয়োজনীয় রিসোর্স সমস্তই যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করবে।'

'আজকের তারিখ দেয়া আছে অর্ডারে,' বলল নোলার। 'আজ বিকেলে, এই কনফারেন্স রুমে একটা মীটিং বসবে। কিভাবে কি করা হবে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা। মীটিঙে উপস্থিত থাকবে সবগুলো ইকুইপমেন্ট ব্রাঞ্চের প্রতিনিধিরা।'

লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কাজেই সবাই তাড়াহুড়ো করে কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল। সবার সাথে নোলারও বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ছুটল এডওয়ার্ডস। নোলারের পথ রোধ করে দাঁড়াল সে

'কি ব্যাপার?' ভুরু কুঁচকে উঠল নোলারের

'আপনি যদি একটা কাগজে একটু লিখে দেন, আমি তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার একজন ডাক্তারের ভূমিকায় নামতে পারি।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল নোলার। মিটি মিটি হাসছে এর আগে নোলারকে হাসতে দেখেনি এডওয়ার্ডস। তার মনে হলো, হাসিটার মধ্যেও কেমন যেন একটা কাঠিন্য আছে।

'আপনি কোথাও যাচ্ছেন না, ড. এডওয়ার্ডস,' বলল নোলার

'সে কি! কেন? কত কাজ পড়ে রয়েছে আমার…'

'এই ব্যাপারটা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমরা ছাড়তে পারি না এই বিল্ডিঙেই আপনাকে থাকতে হবে।'

এডওয়ার্ডসের চেহারায় রাগের ভাব ফুটে উঠল 'আপনাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমি কারও কাছে মুখ খুলব না।'

'বিশ্বাস করি না, ড. এডওয়ার্ডস। হয়তো সত্যি আপনি মুখ খুলবেন না। কিন্তু যদি খোলেন বা খোলানো হয়? নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই আমার কাজেই ঝুঁকিটা আমি নিতে পারি না।'

'কি আশ্চর্য!' অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাল এডওয়ার্ডস। পিছনে রানাকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরল সে। 'মি. রানা! শুনুন, মি. নোলার কি বলছেন! ব্যাপারটা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত আমি নাকি ওঁদের হাতে বন্দী! আপনিই বলুন তো, এর কোন মানে আছে? নিউ ইয়র্কে কত কাজ আমার…'

মুচকি একটু হাসল রানা। 'নোলার আপনার ভালর জন্যেই বলছে। আপনার কে.জি.বি.-বন্ধুদের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেছেন, ডক্টর এডওয়ার্ডস? এখনও তারা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে নিউ ইয়র্কে।'

হঠাৎ যেন চোখ খুলে গেল এডওয়ার্ডসের। মনে মনে বলল, তাই তো! কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্যে এই বিল্ডিঙে আটকা পড়ে থাকতে হবে ভাবতে গেলেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইল মনটা।

'কিন্তু তাই বলে…'

এডওয়ার্ডসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবছিল নোলার, হঠাৎ সে জানতে চাইল, 'ডক্টর এডওয়ার্ডস, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তার আগে প্রফেসর সেসলভের চিঠিটা আরেকবার পড়ুন।'

'পড়তে হবে না,' গম্ভীর সুরে বলল এডওয়ার্ডস। 'আমার মনে আছে সব

'চিঠিতে সেসলভ পথ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আর ডক্টর নোলটনের কাছ থেকে আমরা জেনেছি, তিনি একজন ডায়াবেটিসের রোগী। ঠিক?'

'তাতে কি?'

'সেসলভের একজন ডাক্তার দরকার হবে।'

নোলারের কথার অর্থ হঠাৎ উপলব্ধি করতে পেরে প্রায় চিৎকার করে উঠল এডওয়ার্ডস। 'না!'

মুচকি একটু হাসি দেখা গেল নোলারের ঠোঁটে। 'আপনিও জানেন, ইচ্ছে করলে বছরের পর বছর ধরে এখানে আপনাকে আটকে রাখতে পারি আমরা। তাজা বাতাস নাকে টানার জন্যে আপনার সামনে এখন একটাই মাত্র পথ খোলা

আছে।'

আবার বলল এডওয়ার্ডস, 'না!' কিন্তু এবার ফিসফিস করে। বুঝতে পেরেছে, আপত্তি করে কোন লাভ হবে না।

'প্রয়োজনীয় রিসোর্স যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করবে,' বলল নোলার 'আপনিই হলেন প্রয়োজনীয় রিসোর্স, ডক্টর এডওয়ার্ডস।'

'কিন্তু...'

'প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আপনাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন,' ঘুরে দাঁড়াল নোলার।

নির্জন লবিতে অপেক্ষা করছে নোলার। এই মাত্র এডওয়ার্ডসকে তার কামরায় পাঠিয়ে দিয়েছে সে। আবার রিস্টওয়াচ দেখল নোলার। তারপর মুখ তুলতেই দেখল একজন কর্মকর্তা এবং ডক্টর নোলটনের সাথে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে আসছে রানা। হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে।

কর্মকর্তার সাথে অন্যদিকে চলে গেলেন ডক্টর নোলটন, নোলারের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে ও, বাধা দিল নোলার।

বলল, 'জানি, বিদায় চাইবে। কিন্তু যাবার আগে আমাদের চীফের সাথে একবার দেখা করে যেতে হবে। সোজা ছয়তলায় উঠে যাও, ওখানে লোক আছে, চীফের চেম্বারে পৌঁছে দেবে তোমাকে। নক করারও দরকার হবে না, তিনি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

নোলারের দিকে ভাল করে তাকাল রানা। 'ব্যাপারটা কি, নোলার?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল নোলার। কিন্তু রানার মনে হলো, হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে সে।

'কিসের ব্যাপার?'

'তোমাদের চীফ আমার সাথে দেখা করতে চাইছেন কেন?'

'তার আমি কি জানি?' বোকা সাজার ভান করল নোলার। 'গেলেই জানতে পারবে।'

নোলারের কাছ থেকে কথা আদায় করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়াল রানা, সোজা এগোল এলিভেটরের দিকে। পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পেত, হাসিটা এখন আর চেপে রাখার চেষ্টা করছে না নোলার।

নক না করেই সি.আই.এ. চীফের চেম্বারে ঢুকল রানা। বড়সড় একটা কামরা। দেয়াল জোড়া ম্যাপ। মস্ত ডেস্ক, তার ওপর নানা রঙের অনেক টেলিফোন, ইন্টারকম, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। শেষবার যেমন দেখেছিল কামরাটা ঠিক তেমনই আছে, লক্ষ করল রানা। দরজার দিকে পিছন ফিরে একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সি.আই.এ. চীফ, ঠোঁটের কোণে টোবাকো পাইপ। দরজার ক্লিক আওয়াজ শুনেও ফিরলেন না, কিন্তু মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'বসো, মি. রানা।'

একটা চেয়ার টেনে ডেস্কের সামনে বসল রানা। পিছন থেকে দেখে মনে হলো সি. আই. এ. চীফ আগের চেয়ে একটু যেন মুটিয়ে গেছেন। ধবধবে সাদা চুল

মাথায়। কিন্তু শক্ত-সমর্থ দীর্ঘ শরীর, পেশীর কোথাও ঢিলেঢালা ভাব নেই। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। কথা বললেন না, বা নিজের চেয়ারের দিকে এগিয়েও এলেন না, সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন রানাকে।

'একটুও বদলাওনি তুমি,' প্রশংসা নয়, বিবৃতির মত শোনাল কথাটা। 'আশা করি টপ ফর্মেই আছ?'

এর কোন উত্তর হয় না, কাজেই চুপ করে থাকল রানা।

নিজের চেয়ারের দিকে পা বাড়ালেন সি.আই.এ-চীফ। 'প্রেসিডেন্টের অর্ডারটা তো শুনেছ।'

এবারও কথা বলার প্রয়োজন দেখল না রানা। কিন্তু একটা ব্যাপারে ভারী অবাক হলো ও। এর আগে সি. আই. এ. চীফের সাথে যতবার দেখা হয়েছে তার, সব কিছুর আগে মেজর জেনারেল রাহাত খানের কুশলাদি জানতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু আজ অন্য রকম ঘটছে কেন?

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন চীফ। 'অর্ডারটা আমাদেরকে একটু বিপদে ফেলে দিয়েছে, রানা। এই মিশনে মার্কিন সার্ভিস পার্সোনেলদের কাউকে আমরা পাঠাতে পারছি না। বেসামরিক লোকের খুব যে অভাব তা নয়, কিন্তু হঠাৎ করে যোগ্য লোক পাওয়াও সহজ নয়। যদি বা পাই, নেতৃত্ব দেবার মত কাউকে পাব বলে আশা কম। হাতের কাছে তুমি রয়েছ, ভাগ্যচক্রে জড়িয়েও পড়েছ এর সাথে, তাই তোমার কথা ভাবছি আমরা।'

'আমার কথা ভাবছেন?' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

এমনভাবে কথা বলে চললেন, সি.আই.এ. চীফ, যেন রানার কথা তিনি শুনতেই পাননি। 'এ-ধরনের মিশনে আগেও তুমি গেছ, তোমার সেই অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগতে পারে। ভাবছি...'

বাধা দিয়ে বলল রানা, 'আমি দুঃখিত আমার ছুটি শেষ হয়ে গেছে, দেশে ফিরতে হবে আমাকে।'

'খানিক আগে কথা হলো জেনারেল রাহাতের সাথে বললেন, ছুটি বাড়িয়ে দেয়া সম্ভব।'

ঝাড়া বিশ সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল রানা, 'তিনি কি আমাকে লিখিত কোন নির্দেশ পাঠাচ্ছেন?'

'না। সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বটা সম্পূর্ণ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন,' বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'বাংলাদেশ তার নিজের স্বার্থেই আন্তর্জাতিক ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চায় না, রাহাত খানের এই বক্তব্য আমি মেনে নিয়েছি বললেন, তুমি যদি এই মিশনের দায়িত্ব নিতে রাজি হও, তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার জড়িয়ে পড়াটা হবে আনঅফিশিয়াল।'

চুপ করে থাকল রানা। কিন্তু ওর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন সি.আই.এ.চীফ।

'আমি অপেক্ষা করছি, মি. রানা।'

চেহারাটা গম্ভীর করে রেখেই বলল রানা, 'কিসের জন্যে, তা কিন্তু এখনও আমি জানার সুযোগ পাইনি, মি. কলভিন।'

মুচকি হাসলেন চীফ তাঁর ভাব দেখে মনে হলো, রানা যে এই রকম একটা কিছু বলবে তা যেন তিনি আগেই অনুমান করেছিলেন। বললেন, 'বেশ প্রস্তাবটা তাহলে আনুষ্ঠানিক ভাবেই দেয়া যাক। মি. রানা, এই গুরুত্বপূর্ণ মিশনে আমরা কি তোমার সাহায্য ও নেতৃত্ব আশা করতে পারি?'

'এক শর্তে,' বলল রানা

চীফের মুচকি হাসিটা মুখ থেকে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল 'শর্ত? কি শর্ত?'

'মিশনে যারা যাবে তাদের মধ্যে অন্তত একজন লোক থাকবে আমার নিজের বাছাই করা,' বলল রানা।

ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন চীফ। তারপর বললেন, 'শুধু এই একটা শর্ত?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমার এই শর্তের কারণ, মি. রানা?'

'দলে অন্তত নিজের একজন লোক না থাকলে নিরাপদ বোধ করি না আমি,' বলল রানা। 'তারমানে এই নয় যে দলে আর যারা থাকবে তাদেরকে আমি বিশ্বাস করতে পারব না। আসলে নিজের বাছাই করা লোক না থাকলে আমি ঠিক সন্তুষ্ট বা সহজ হতে পারি না।'

'ঠিক আছে। তাই হবে একটা ফাইল টেনে নিয়ে সেটা খুললেন সি.আই.এ. চীফ। 'নোলারের সাথে দেখা করো।'

বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, এই সময় পিছু ডাক শুনল।

'মি. রানা!'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'বলুন।'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ মিশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক?'

'পেরেছি।'

'তোমরা সবাই মারাও যেতে পারো।'

'জানি। আমার জন্যে আমার দেশকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিলেই চলবে

'ঠিক আছে,' বলে ফাইলে মুখ ঢাকলেন সি.আই.এ. চীফ এ. পি. কলভিন

চোদ্দ

যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্সের কাছ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য পাবার অধিকার দেয়া হলো ওদেরকে। কিছু কিছু মিত্র দেশের সাহায্যও প্রয়োজনে চাইতে পারবে ওরা। খবরটা শোনার পর রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল ঝাঁক ঝাঁক ফাইটার প্লেন, সাবমেরিন, ট্যাংক, আর কামানের ছবি।

কিন্তু আলোচনা টেবিলে বসে কথা বলার সময় যতই মিশনের ধরনটা পরিষ্কার হয়ে এল ততই এক এক করে বাদ পড়তে লাগল ভারী ইকুইপমেন্ট।

প্রথম কাজ, ভেতরে ঢুকতে হবে, এবং দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে ওদের প্রকৃতির দিক থেকে এটা হবে একটা ঝটিকা অভিযান। আইজ্যাক সেসলভের বয়স ষাটেরও বেশি, তার ওপর ডায়াবেটিসের রোগী, উন্মুক্ত আর্কটিক আবহাওয়ায় কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবেন তিনি সেটা একটা ভাবনার বিষয় জমাট বরফে পরিণত হওয়া সেসলভ কারও কাজে লাগবেন না।

তারপর আসছে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারটা। ওরা যাচ্ছে, সেটা যেন কোন ভাবেই রাশিয়ানরা টের না পায়। তাহলেই সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। অবশ্য এখন পর্যন্ত জানার মধ্যে তারা শুধু এইটুকু জানে যে সেসলভ বুকলেটের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছেন—রাশিয়া টেমপারেচার ভ্যারিয়েশন নিয়ে কাজ শুরু করেছে। 'তোমরা এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও' সেসলভের এই অনুরোধ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। তাছাড়া, রাশিয়ান এলাকায় অনুপ্রবেশ করে কাউকে ছিনতাই করে নিয়ে আসার অভ্যেস যুক্তরাষ্ট্রের নেই। রাশানদের আভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি সিস্টেম অত্যন্ত কড়া, গলে বেরিয়ে আসার উপায়ও নেই। তাই, যুক্তরাষ্ট্র হানা দেবে সে রকম কিছু আশঙ্কা করছে না তারা, বিশেষ করে আর্কটিকে। ইতিহাস থেকে পরিষ্কার জানা যায়, নোভাইয়া জেমলাইয়ায় হেভী গার্ডের ব্যবস্থা কোন কালেই ছিল না, এখনও নেই। প্রকৃতি নিজেই যেখানে তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখে সেখানে নিজেকে তুমি পাহারা না দিলেও পারো, বোধহয় এই রকম কোন বিশ্বাসের বশে গার্ডের ব্যবস্থা নামমাত্র রেখেছে তারা ট্র্যান্সপোর্টেশনের জন্যে প্রথমে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের কথা ভাবল ওরা। কিন্তু একাধিক কারণে ধারণাটা বাতিল করে দেয়া হলো। এক, ওটা একটা মার্কিন যুদ্ধজাহাজ। দুই, আন্ডার-ওয়াটার ডিফেন্স সিস্টেমের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারে ওটা, তাহলে সাথে সাথে বরফের নিচে ওটার ওপর হামলা চালিয়ে বসবে রাশিয়ান হান্টারকিলার সাবমেরিন। তিন, প্রকৃতির সাথে দাবা খেলার একটা ঝুঁকি নিতে হবে ওদের মিশনকে। ওদের পথে একের পর এক বাধা হয়ে দেখা দেবে সে, কিন্তু সেই বাধা থেকে কিছু সুযোগ সুবিধে পেয়ে গেলে সেটা ওরা হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

বিমানযোগে হানা দেয়ার ধারণাটাও বাতিল করে দেয়া হলো। হানাদার প্লেন সোভিয়েত উপকূলের দিকে এগোচ্ছে দেখলে রাশিয়ানদের মাথা খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। নাইট ফাইটার থেকে শুরু করে গ্রাউন্ড টু-এয়ার মিসাইল বা এয়ার টু-এয়ার মিসাইল ছুঁড়ে সেটাকে ঘায়েল করে দিতে বেশিক্ষণ লাগবে না তাদের এরপর বাকি থাকল শুধু সারফেস অ্যাপ্রোচ। এবং বরফ ছুঁয়ে এগোতে হলে সময়টা হতে হবে অবশ্যই রাত রাতের অন্ধকার ছাড়া এ-কাজ সম্ভব নয়।

আর্কটিকে দিনের আলো কখন কি পরিমাণে পাওয়া যায় তার একটা হিসেব নেয়া হলো। দেখা গেল, অভিযান শুরুর তারিখ অনেকটা পিছিয়ে না দিলে রাতের অন্ধকার পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুটা দেরি করা এমনিতেও দরকার, কারণ মিশনের সদস্যদের ট্রেনিং পিরিয়ডে থাকতে হবে কিছুদিন। মোটামুটি স্থির করা হলো একটা তারিখ, যদিও আর্কটিকে ওই সময় রাত থাকবে, কিন্তু অন্ধকার ততটা থাকবে না ম্লান গোধূলির মত একটা অবস্থা বিরাজ করবে সেখানে এক থেকে তিন ঘণ্টা স্থায়ী

হবে এই টোয়াইলাইট। সে-সময়ে চাঁদও থাকবে আকাশে। মাসের ছ'তারিখ থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত চাঁদের আকার থাকবে সুতোর মত থেকে শুরু করে পূর্ণচন্দ্রের এক চতুর্থাংশ।

'বাকি থাকল শুধু আবহাওয়া,' বলল রানা। 'ওই সময় তার মতিগতি কি রকম হবে আগে থেকে তা বোঝার কোন উপায় নেই।'

'কতটা ভাল আবহাওয়া দরকার হবে আমাদের?' চেহারায় নিরীহ একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে জানতে চাইল এডওয়ার্ডস।

'উইন্ডচিলকেই বেশি ভয়,' বলল রানা

'উইন্ডচিল...মানে, ঠিক...'

'সহজ। ঠাণ্ডা হাওয়াকে বলে উইন্ডচিল। শুধু ঠাণ্ডা তেমন ভয়ঙ্কর নয় আর্কটিকে, কিন্তু তার সাথে বাতাস থাকলে সেটাই মারাত্মক। উইন্ডচিল টেবল্ দেখলে বোঝা যায় উন্মুক্ত শরীর কত তাড়াতাড়ি জমাট বরফ হয়ে যেতে পারে। মাইনাস ফরটি ডিগ্রী ঠাণ্ডা, আর ফরটি নট বাতাস, এর নাম উইন্ডচিল—জমাট বরফে পরিণত হতে দেড় মিনিটের বেশি লাগে না।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল এডওয়ার্ডসের। বেশ কিছুক্ষণ তলিয়ে দেখল গোটা ব্যাপারটা। ভেবে চিন্তে জানতে চাইল, 'তাহলে আমাদের সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

টেবিলের ওপর পেনসিল ঠুকতে ঠুকতে কি যেন ভাবছিল রানা, এডওয়ার্ডসের কথায় সংবিৎ ফিরল। বলল, 'আমি কি ভেবেছি সেটা বলি। গোটা অভিযানটা, আসা এবং যাওয়া, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সারতে হবে। টোয়াইলাইটের কারণে কিছুটা সময় হয়তো কমে যেতে পারে, ধরা যাক একুশ বা বাইশ ঘন্টা সময় পাব আমরা, আবার টোয়াইলাইট শুরু হবার আগে। এই সময়ের মধ্যে ওখানে পৌঁছুতে হবে আমাদের, ওদের ক্যাম্পের ভেতর ঢুকতে হবে, সেসলভকে উদ্ধার করতে হবে, তারপর আবার ফিরে আসতে হবে পিক-আপ পয়েন্টে। সেই পিক-আপ পয়েন্টটা কোথায় হতে পারে সেটাই এখন প্রশ্ন।'

'খানিক আগে চেক করে এসেছি,' বলল নোলার। 'ডিফেন্স প্যাটার্নের মোটামুটি পরিষ্কার একটা ছবি পাওয়া গেছে।'

'কি রকম?' জানতে চাইল রানা।

'গোটা রাশিয়ার নর্দার্ন উপকূল বরাবর রাডার চেন রয়েছে, ঠিক আমাদের ডিসট্যান্ট আর্লি ওয়ার্নিং এবং ব্যালিস্টিক মিসাইল আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের মতই। তাছাড়া গোটা একটা অ্যান্টি-মিসাইল মিসাইল-কমপ্লেক্স তো আছেই। তবে, আমার ধারণা, আমাদের দিকে ওরা তাকিয়ে থাকবে না।'

'কিন্তু আমরা যদি ওদিকে কোন প্লেন নিয়ে যাই তাহলে তাকাবে।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল নোলার। 'ঠিক কি ঘটে তা আমাদের জানা আছে। অনেকবার টেস্ট করা হয়েছে। পোল এলাকার চারদিকে এয়ার ট্রাফিকের কোন কমতি নেই। উপকূলের দুশো মাইলের মধ্যে কোন প্লেন না গেলে রাশিয়ানরা তা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না।'

'আমরা তাহলে দুশো মাইল দূর থেকে রওনা হব?'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে।'

'সর্বনাশ!' বড় ম্যাপটার দিকে ঘুরে তাকাল ও।

নোলার বলল, 'ওখানে পৌঁছে যদি তিন ঘণ্টা থাকতে হয় তোমাদের, মনে রেখো, বিল্ডিঙে ঢোকার আগে পাহাড়ে চড়তে হবে তোমাদেরকে···যেতে দুশো মাইল আসতে দুশো মাইল···তারমানে প্রতিটি ট্রিপের জন্যে তোমরা নয় ঘণ্টা করে পাবে।'

'নয় ঘণ্টা!' নোলারের দিকে ফিরল রানা। 'বরফের ওপর দিয়ে খুব জোরে ছুটতে পারে এমন কিছু পাচ্ছি না আমরা···'

'পোলক্যাট আছে।'

'সারফেস যদি ভাল হয়, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল যেতে পারবে পোলক্যাট,' বলল রানা। 'কিন্তু···' ম্যাপের গায়ে বরফ ঢাকা এলাকাটা দেখল ও। '···ওখানকার অবস্থা কি রকম হবে কে জানে!'

'সাত ঘণ্টা বেরিয়ে যাবে পৌঁছুতে,' মৃদু কণ্ঠে বলল নোলার। 'হাতে খুব বেশি সময় থাকবে না।'

'কে বলল তোমাকে, হাতে সময় থাকবে?' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'প্যাক আইস কিরকম সে তুমিও জানো। বেশিরভাগ সময় সমতল থাকে বটে, কিন্তু যেখানে ভাঁজ খেয়ে বা ডেবে গেছে? পথে প্রায়ই দশ-পনেরো ফিট উঁচু ঢাল পড়বে। দু'এক ফিট হলে উতরে যাবে পোলক্যাট, কিন্তু দশ-পনেরো ফিট তার সাধ্যের বাইরে—আমরা সেটাকে বয়েও ওপারে নিয়ে যেতে পারব না। দুশো মাইল অনেক বেশি দূরত্ব হয়ে যাচ্ছে, নোলার। আরও কাছাকাছি থেকে অভিযান শুরু করতে হবে আমাদের। তা না হলে ওখানে পৌঁছুবার আশা করা বৃথা।'

'এর চেয়ে কাছাকাছি প্লেন নিয়ে গেলে ঝাঁক বেঁধে চলে আসবে রাশিয়ানরা ইনভেস্টিগেট করার জন্যে।'

'তাহলে বরং মিশনটা ড্রপ করো।' রেগে উঠল রানা 'যা সম্ভব নয় তা করতে বলার মানে কি?'

দু'জনের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল।

ওরা তর্ক করছে, আর এডওয়ার্ডস গভীর মনোযোগের সাথে গত শীতটা কি রকম মজা করে কাটিয়েছে কলোরাডোয় তার স্মৃতিচারণ করছে আপনমনে। বরফের ওপর স্কি-ডু নিয়ে ছুটে বেড়ানোর সেই স্মৃতি চিরকাল মনে থাকবে তার।

হঠাৎ ওদের তর্কের একটা সমাধান দেখতে পেল সে। খানিক ইতস্তত করে বলেই ফেলল, 'আমার একটা পরামর্শ ছিল।'

রানা এবং নোলার, দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এডওয়ার্ডসের দিকে।

'স্কি-ডু ব্যবহার করলে কেমন হয়?' মৃদু কণ্ঠে বলল এডওয়ার্ডস।

সাথে সাথে পরামর্শটা নাকচ করে দিল নোলার। 'ওগুলো খেলনা!'

'কিন্তু পোলক্যাটের চেয়ে অনেক জোরে ছুটতে পারে। হালকাও,' যুক্তি দেখাবার সুরে বলল এডওয়ার্ডস। 'প্রয়োজনে আমরা খানিক দূর পর্যন্ত বয়েও নিয়ে যেতে পারব।'

এবার রানাও আপত্তি তুলল, তবে নোলারের মত প্রস্তাবটাকে একেবারে

বাতিল করে দিল না বলল, 'কিন্তু স্কি-ডু ব্যবহার করলে খোলা আকাশের নিচে থাকতে হবে আমাদের, গায়ে বাতাস লাগবে উইন্ডচিল সম্পর্কে কি বললাম তখন, মনে নেই? ওখানে যদি গায়ে বাতাস লাগে, যতই পারকা পরে থাকুন, বিশ মিনিটের বেশি বাঁচার কোন আশা নেই।'

কিন্তু এডওয়ার্ডসও নাছোড়বান্দা। সাথে সাথে বলল, 'প্রতিটা স্কি-ডুতে কেবিন ফিট করে নিলেই হবে। ভেতরে হিটার বসিয়ে নেয়াও সম্ভব।'

রানা আর নোলার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল নোলার। 'বললাম তো, ওগুলো খেলনা মেয়েরা চড়ে খুব আনন্দ পায়।'

'এডওয়ার্ডসের কথায় কিন্তু যুক্তি আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা 'কেবিন আর হিটারের ব্যবস্থা করা গেলে স্কি-ডু মন্দ কি?'

এবার কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়েও কি ভেবে চুপ করে থাকল নোলার। এরপর তার আচরণ একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠল। গলার সুরে অফিশিয়াল ভাব টেনে বলল, 'আমি বলি কি, ট্রান্সপোর্টেশনের গোটা ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেশনের জন্যে এখানে রেখে বেরিয়ে পড়ো তোমরা, ওখানে গিয়ে ইতিমধ্যে তোমার ক্রু বাছাইয়ের কাজটা সেরে ফেলো।'

'মিশনেই যদি যেতে না পারি, ক্রু দিয়ে কি হবে?'

'মিশন যদি বাতিলই করা হয়,' ঠাণ্ডা গলায় বলল নোলার, 'সিদ্ধান্তটা নেয়া হবে সমস্ত সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখার পর। এখনই নয়।'

অগত্যা সমস্যাটাকে জিইয়ে রেখেই টীমের সাথে যোগ দেবার জন্যে আলাস্কার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে হলো ওদের। সিলেকশন, ট্রেনিং এবং নতুন আবহাওয়ার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার মহড়া ওখানেই অনুষ্ঠিত হবে। পরিত্যক্ত একটা ক্যাম্প ওদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ক্যাম্পের একশো মাইলের মধ্যে আর কোন ক্যাম্প বা লোকজন নেই। নোমে বি.এম.ই. ডব্লিউ এস-এর ইন্সটলেশন স্থাপনের সময় ক্রুদের থাকা-খাওয়া হত এই ক্যাম্পে।

এডওয়ার্ডসকে নিয়ে রওনা হলো রানা। এয়ার.বেস থেকে পোলক্যাটে চড়ে পৌঁছল ক্যাম্পে। পোলক্যাট নিয়ে আইস-প্যাকে যেতে রানা কেন আপত্তি তুলেছিল সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেল এডওয়ার্ডস। অনেক অসুবিধের মধ্যে পোলক্যাটের আরেকটা অসুবিধে হলো বড় বেশি ঝাঁকি খায়। অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই এডওয়ার্ডসের মনে সন্দেহ দেখা দিল, ক্যাম্পে তারা পৌঁছুতে পারবে তো? অবশ্য পথে তেমন কোন বিপদ ঘটল না। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে পৌঁছে গেল ওরা। সবাই ওদের জন্যে উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিল ক্যাম্পে।

পাঁড় কম্যুনিস্ট দেশ বাদে এমন কোন দেশ নেই যেখান থেকে নির্বাচিত হবার জন্যে আসেনি তারা। সত্তর জনের একটা দল—লাল, হলুদ, সাদা, তামাটে, এক একজনের গায়ের রঙ এক এক রকম। ট্রেনিং এদের সবাইকে দিতে হবে, তারপর সবার মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজনকে বাছাই করা হবে। অবশ্য দু'জনকে আগেই নির্বাচিত করা হয়েছে। একজন এডওয়ার্ডস। অপরজনও ট্রেনিং নেবার জন্যে সবার সাথে পৌঁচেছে ক্যাম্পে। এই তরুণ রানার নিজস্ব নির্বাচন। নাম পেরী কংকর,

ফ্রান্সের নাগরিক, জন্মস্থান: সেসলভের দেশ যুগোস্লাভিয়া।

ট্রেনিঙের ব্যাপারে, নেতৃত্ব দিল রানা। সঙ্গী হিসেবে ভদ্র, মাটির মানুষ রানা, কিন্তু ট্রেনার হিসেবে ও যে কতখানি দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর এক লোক সেটা এডওয়ার্ডস বাদে সবাই হাড়ে হাড়ে টের পেল। ট্রেনিংটা কি ধরনের হতে যাচ্ছে আগে ভাগে টের পেয়ে গেল এডওয়ার্ডস, সেই থেকে অনুনয় বিনয় শুরু করল সে। 'মি. রানা, আমি নেহাত গোবেচারা মানুষ, স্ট্যামিনা অতটা নেই, ওদের মত আমাকেও যদি সব পরীক্ষা দিতে হয়, আমার ওপর সেটা জুলুম হয়ে যাবে। ভয় পাই, ঠিক তা নয়। কিন্তু ধরুন, ট্রেনিং পিরিয়ডেই যদি মারা যাই, তাহলে আর আপনাদের সাথে আমার যাওয়া হয় কিভাবে?'

হাসি পেলেও সেটা চেপে রাখল রানা। তখুনি কিছু না বলে ডাক্তারকে উদ্বেগের মধ্যে রাখল। ট্রেনিঙের সময় দেখা গেল, মাত্র পঁচিশ মাইল স্কি বান, আর কয়েক রাত আর্কটিক সারভাইভাল সেন্টারে থাকতে হলো তাকে। কিন্তু বাকি সবাইকে নরকের স্বাদ পাইয়ে দিল রানা। আর্কটিক অঞ্চলের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা আছে রানার, জানা আছে কি রকম ভয়ঙ্কর শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে এটা অবস্থা বিশেষে। ও চাইল ওর মত আর সবাইও ব্যাপারটা জানুক। গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত হয়ে কেউই তার পা হারাল না বটে, কিন্তু সবাই অন্তত ফ্রস্টবাইটের প্রথম অসাড় বোধটা অনুভব করল। টের পেল, ঠাণ্ডা মাংস গরম হয়ে ওঠার সময় কি অসহ্য যন্ত্রণা হয়। সুঠাম দেহী তরুণদের অনেককেই হাউ মাউ করে কাঁদতে দেখল এডওয়ার্ডস। মনে মনে নিজেকে এতদিন ডানপিটে ভেবে এসেছে সে, কিন্তু ওদের অবস্থা দেখে নিউ ইয়র্কের সেই নিরাপদ অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাবার ব্যাকুলতা অনুভব করল। ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল তরুণের সংখ্যা। সেই সাথে কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকল ট্রেনিঙের পর্যায়গুলো। একটা মাত্র স্কি দিয়ে তরুণদের একাকী পাঠিয়ে দেয়া হলো ক্যাম্প থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, সাথে থাকল একটা কম্পাস আর একবেলার খাবার। কে ফিরে আসতে পারে এটা তারই পরীক্ষা। এদের মধ্যে একজন পড়ল ক্ষুধার্ত একটা টিম্বার নেকড়ের সামনে। সাথে কোন রকম অস্ত্র নেই, আত্মরক্ষার জন্যে স্কি স্টিকটা ব্যবহার করতে হলো তাকে। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পে ফিরল বটে, কিন্তু দেখা গেল নেকড়ে তার একটা হাতের এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে, সাদা হাড় দেখা যাচ্ছে ক্ষতের ভেতর। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকায় মিশনের সদস্য হবার যোগ্যতা হারাল সে।

শেষ পর্যন্ত ছয়জনের একটা দল অবশিষ্ট থাকল। নোমের সেই ক্যাম্পে ওরা যখন জড়ো হলো, দেখে মনে হলো জাতিসংঘের একটা কোরাম। একজন বাংলাদেশী, একজন ইংরেজ, একজন ফ্রান্সবাসী যুগোস্লাভিয়ান, একজন ক্যানাডিয়ান ইন্ডিয়ান, একজন নরওয়েজিয়ান এবং প্রকাণ্ডদেহী একজন জাপানী।

ট্রেনিং পিরিয়ড থেকেই যুগোস্লাভিয়ান পেরী কংকরকে নিয়ে একটু গোলমাল দেখা দিল। রানার নির্বাচিত সদস্য, অথচ রানার সাথেই তার বিরোধ। ব্যক্তিগতভাবে রানাকে পছন্দ করে না কংকর, ব্যাপারটা তা নয়। আসলে তার স্বভাব এবং প্রকৃতির মধ্যেই নেতৃত্ব মেনে চলার প্রবণতা একেবারেই নেই।

যুগোস্লাভিয়ার মানুষ হলেও, অনেক দিন থেকে ফ্রান্সে বাস করছে। পেশাদার রেসিং মটরিস্ট। দুনিয়ার সব ভাল মটরিস্টকে একই সাথে ভাল মেকানিকও হতে হয়. কিন্তু কংকর শুধু ভাল নয়, তার মত দক্ষ মেকানিক গোটা ইউরোপে আর একজন আছে কিনা সন্দেহ। ইঞ্জিন তার ধ্যান, ইঞ্জিন তার সাধনা। রানার কথাবার্তা থেকে এডওয়ার্ডস বুঝল, এই গুণটার জন্যেই কংকরকে বাছাই করেছে রানা। তাছাড়া, শিকারী বিড়ালের মত ক্ষিপ্র সে। ছোটখাট শরীর, একহারা চেহারা, সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে, কথা বলে খুব কম।

এরপর ধরা যাক নরওয়েজিয়ান মিলটন স্টেনারের কথা। স্বদেশের সামরিক বাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাকে। ঘটনাটা কৃত্রিম, মার্কিনীদের অনুরোধে পরিকল্পিত একটা নাটক। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যখন জানতে পারল মিলটন, ধারণাটা পছন্দ হয়নি তার। পছন্দ না হলেও প্রয়োজনীয়তাটুকু উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয়নি তার, তাই শান্তভাবেই মেনে নিয়েছে। দলের সবার চেয়ে লম্বা সে, কিন্তু গায়ে মাংস কম। তবে এও কংকরের মত প্রয়োজনে ক্ষিপ্র হয়ে উঠতে পারে। স্কি প্রতিযোগিতায় বছর কয়েক ধরে ফি বার প্রথম হয়ে আসছে সে। স্কি-তে চড়ে এক নাগাড়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারে, কাঁধে থাকবে রাইফেল, সেটা দিয়ে ছুটন্ত অবস্থায়ও একশো গজ দূরের দাঁড়ানো কোন টার্গেট ভেদ করতে পারে। নারভিক থেকে এসেছে সে, আর্কটিক সার্কেলের মধ্যেই পড়ে জায়গাটা। হোয়েলার-স্কিপার বাবার সাথে অ্যানটার্কটিকে ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতাও আছে তার। সাউদার্ন আইস-প্যাকের কিনারা বরাবর শিকার খুঁজে বেড়িয়েছে সে। পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারেও সে একজন ওস্তাদ।

এরপর কারজো বুতেরা। শরীরে ক্যানাডিয়ান ইন্ডিয়ানদের রক্ত বইছে। সুদূর উত্তরে কেটেছে তার সারাটা জীবন। চোখ দুটো হালকা খয়েরী, কোন মানুষ বা জিনিসের দিকে যখন তাকিয়ে থাকে মনে হয় তাকে বা সেটাকে ভেদ করে আরও সামনে চলে গেছে তার দৃষ্টি। রানার মনে পড়ল, এই ধরনের চোখকে হরাইজন আইজ বলা হয়। কথা কম বলার ব্যাপারে কংকরকেও শোচনীয়ভাবে হার মানাল সে। তার সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্থির এবং নিঃশব্দ ভাব আছে—কেমন যেন ভৌতিক বলে মনে হয়। আর্কটিক পরিস্থিতিতে টিকে থাকা তার বৈশিষ্ট্য। সেটা ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক গুণের অধিকারী সে। গা ঢাকা দেবার ব্যাপারে সে একটা প্রতিভা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে রানা। সবাই তাকে খুঁজছে, সে-ও দাঁড়িয়ে রয়েছে মাত্র বারো গজের মধ্যে, অথচ কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না—কয়েকবারই ঘটেছে এই রকম ঘটনা। কিভাবে এটা সম্ভব, রানাকে জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পায়নি এডওয়ার্ডস। দেখেশুনে তার মনে হয়েছে, কেউ যদি মিলটন স্টেনারকে দায়িত্ব দিয়ে বলে কারজো বুতেরাকে খুঁজে বের করে গুলি করে মারো, তাহলে ওদের দু'জনের সেই প্রতিযোগিতা পুরো একটা বছর কেটে গেলেও শেষ হবে না। কারণ মিলটন তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না, আর বুতেরা তার চোখে ধরা দেবে না।

সবশেষে নিতাইয়ের কথা। হিরোমিচি নিতাই, বিশালদেহী জাপানী। জাপানীরা সাধারণত যেমন হয়, নিতাই ঠিক তার উল্টো। ছোটখাট একটা পাহাড়

বলা যেতে পারে তাকে, প্রকৃতিটা সাগরের মতই উদার, মোটেও আনুষ্ঠানিকতার ধার ধারে না। দলের মধ্যে একেই সবচেয়ে ভয় পায় এডওয়ার্ডস। নিতাইকে নিষ্ঠুর বা গোঁয়ার মনে করার কোন কারণই নেই, কিন্তু তার ওই বিশাল শরীর দেখে কাছে ঘেঁষতে সাংঘাতিক ভয় করে তার। তার ধারণা মোহাম্মদ আলী যখন ফর্মে ছিল তখনও যদি তার সামনে নিতাই পড়ে যেত, এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসত তাকে, লড়তে রাজি হবার আগে বন্ধু-বান্ধব আর শুভানুধ্যায়ীদের সাথে পরামর্শ না করে সেটা গ্রহণ করতে পারত না মোহাম্মদ আলী। নিতাইকে মাঠে দেখলে গোটা একটা ফুটবল টীমও বোধহয় বল নিয়ে এগোতে সাহস পাবে না। নিতাইয়ের বৈশিষ্ট্য হলো সে কারাতে আর কেনডো চ্যাম্পিয়ন। জাপানীরা কারাতে রফতানী করলেও কেনডো এখনও শুধু নিজেদের দেশেই চর্চা করে। লম্বা পোল নিয়ে লড়াই করার নাম কেনডো। অত্যন্ত ঝুঁকি থাকে এই প্রতিযোগিতায়। অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বী মারাও যায়। কারাতেতে ব্ল্যাক বেল্টের মালিক নিতাই। কিন্তু তার কেনডো রেটিং সম্পর্কে কাউকে কিছু জানায়নি সে। পাথুরে পাহাড় চড়ার ব্যাপারেও সে একজন ওস্তাদ। লেখাপড়া করেছে টোকিও বে-র ওশন ইন্সটিটিউটে, সাবজেক্ট ছিল ওশনোগ্রাফি। সদস্যদের মধ্যে তার বয়সই সবচেয়ে বেশি। বত্রিশ।

ইংরেজ এক ডাক্তার, যুগোস্লাভ মোটর গাড়ি বিশারদ, নরওয়েজিয়ান বন্দুকবাজ স্কি চ্যাম্পিয়ান, ক্যানাডিয়ান ক্যামোফ্লেজ আর্টিস্ট, আর জাপানী কারাতে ও কেনডো চ্যাম্পিয়ান দৈত্য চলেছে দীর্ঘ হিমতুষার যাত্রায়— নেতৃত্বে রয়েছে বাংলাদেশের এক তীক্ষ্ণধী যুবক।

সবাই প্রস্তুত।

উদ্ধার-২

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৮২

এক

ট্রেনিং দিয়ে সবাইকে গড়ে-পিটে নিতে বেশ কিছুদিন সময় নিল রানা।

চীফটেন ওয়েলের নর্থ স্লোপ ড্রিলিং লোকেশনে ওদেরকে যেতে দেবার জন্যে ওয়াশিংটনে বসে কোম্পানীর অনুমতি আদায় করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেছে নোলার। লোকেশনের চারদিকে সিকিউরিটি কর্ডনের কাঠিন্য লক্ষ করে তাজ্জব হয়ে গেল সে। ট্রেনিং দেয়ার কাজ শেষ করেছে রানা, এই রিপোর্ট পেয়ে সে আর দেরি করেনি, দুটো পরিবর্তিত সংস্করণের স্কি-ডু নিয়ে চলে এসেছে আলাস্কায়।

ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের ঢালু র‍্যাম্প ধরে পিছিয়ে নেমে আসতে শুরু করল ওগুলো। স্কি-ডু ব্যবহার করার ঘোর বিরোধী ছিল নোলার, ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কারণটা উপলব্ধি করতে পারল রানা। আলাস্কায় মাত্র কিছুদিন কাটিয়েই ভারী ডিজেলের গর্জনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও, মাত্র চারশো সিসি টু স্ট্রোকের পুট পুট আওয়াজটাকে কেমন যেন রুগ্ন, দুর্বল শোনাল কানে। অনেক আগে দেখেছে বলে স্নোমোবাইলের চেহারাটা পরিষ্কার মনে ছিল না ওর। দেখল, প্রায় সাত ফিট লম্বা ওটা, চেহারার দিক থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি মিল আছে স্কুটার বা বেবী ট্যাক্সির। মেটাল ফ্রেমের ওপর বসানো আছে মটর, ছেদহীন একটা বেল্ট ঘুরতে থাকে, সেই বেল্টই চালিয়ে নিয়ে যায় ওটাকে। ট্যাংকের মত লোহা বা ইস্পাতের নয়, বেল্টটা রাবার আর নাইলন দিয়ে তৈরি। স্টিয়ারিঙের জন্যে সামনের দিকে বেরিয়ে আছে ছোট দুটো স্কি স্টিক। মটর সাইক্লিস্টদের মত আরোহীরা একজনের পিছনে বসে আরেকজন। স্কি-ডু বা স্নোমোবাইল উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু নমুনা হিসেবে ওদের জন্যে যে-দুটো নিয়ে এসেছে নোলার সেগুলোয় আর্মার্ড গ্লাসের জানালা সহ অ্যালুমিনিয়াম শীটের কেবিন ফিট করা হয়েছে। হিটারও বসানো হয়েছে, ইঞ্জিনের ওপর এবং কেবিনের ভেতর গরম বাতাস সরবরাহ করে সেটা।

কেবিন আর হিটারের পরামর্শ দিয়েছিল এডওয়ার্ডস, সেটা সমর্থন করেছিল রানা। কিন্তু চারপাশের ধূসর আর সাদা রঙের মাঝখানে উজ্জ্বল খুদে ছারপোকা আকৃতির স্নোবোমাইল দুটোকে দেখে খেলনা ছাড়া আর কিছু মনে হলো না ওর। এই খেলনা নিয়ে প্যাক আইস পাড়ি দিতে হবে ভাবতে গিয়ে ওর বুক কেঁপে উঠল।

ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে আছে রানার। চোখ দুটো কঠিন। আর কারও চেহারাতেও উৎসাহ বা খুশির কোন ভাব নেই। শুধু একজন ছাড়া।

কম কথা বলিয়ে কংকর স্কি-ডু জোড়া দেখেই শিস দিয়ে উঠল। চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে দ্রুত এগোল। ইতোমধ্যে প্লেন থেকে নামানো হয়েছে ওগুলো।

একটা স্কি-ডুর পাশে থামল সে। আলতো ভাবে সেটার গায়ে চাপড় দিল, যেন বাছুরকে আদর করছে। ফাঁপা আওয়াজ শুনে নিঃশব্দে হাসল একগাল। তারপর অ্যাকসিলারেটরে বুড়ো আঙুল রেখে চাপ দিল। ইঞ্জিনটাকে আধ মিনিট চালু রাখল সে। দস্তানা পরা আঙুলের ডগায় চুমো খেল। তারপর আবার একবার মৃদু চাপড় দিল স্কি-ডুর গায়ে।

'এ থেকে কি বুঝব আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'ডয়েচ টু স্ট্রোক, লাভলি!' পেরী কংকরের চেহারা থেকে প্রশংসা ঝরে পড়ল। স্কি-ডুর ছাদে হাত রেখে সেটাকে এদিক ওদিক দোলাল খানিক। 'বয়ে নিয়ে যেতে হলে দু'জনের বেশি লাগবে না।'

'দুশো মাইল, মনে আছে?' বলল রানা। 'যেতে আসতে চারশো। কিছু দূর গিয়ে অচল হয়ে পড়লে মারা পড়ব আমরা।'

'ঠিক!' বলল নরওয়েজিয়ান মিলটন স্টেনার।

'না, না,' দ্রুত বলল কংকর। 'ফার্স্ট ক্লাস মেশিনারি। বাইরের চেহারা দেখিয়ে আসলে বোকা বানাতে চাইছে।'

'কিন্তু অসম্ভব হালকা যে? শক্তও নয়। প্রফেশন্যালরা এই জিনিস ব্যবহার করবে, ভাবাই যায় না!' বলল স্টেনার।

বিষয়টা কংকরের এক্তিয়ারে বলেই, এর বেশি কিছু বলল না স্টেনার। ওর অভিযোগ শুনে ঠোঁট বাঁকা করে একটু হাসল কংকর। এমনিতেও স্কি-ডু চালানো কঠিন কিছু নয়, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেটাকে হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলল সে। গোটা এয়ারফিল্ডটা পর পর দু'বার চক্কর দিল, কখনও স্পীড কমিয়ে হঠাৎ বাড়াল, কখনও ফুল স্পীডের মধ্যে আচমকা ব্রেক করে একেবারে দাঁড় করিয়ে ফেলল। সবশেষে ফিরে এল ওদের সামনে। একগাল হাসি নিয়ে বেরিয়ে এল সে। 'এমন মজা আর কি আছে!' রানার দিকে চোখ রেখে বলল। 'যে কোন ইডিয়েটও চালাতে পারবে। আপনি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখুন না!'

'থাক, তার দরকার নেই,' বলে হাসল রানা। বলল, 'ইডিয়েট যে পারবে তা তো দেখতেই পেলাম। বুদ্ধিমান কেউ ট্রাই করতে চাও? স্টেনার···তুমি?'

হাসিমুখে এগিয়ে এল স্টেনার, চড়ে বসল স্কি-ডুতে। এয়ারফিল্ডটা চক্কর দিতে ওরও খুব বেশি সময় লাগল না। প্রতিটি বাঁকে তুষার ছড়িয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরে এল স্কি-ডু। রানার পাশে নামল গাড়ি থামিয়ে।

'কি, ঠিক বলিনি?' জানতে চাইল কংকর।

'মজা তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল স্টেনার। 'কিন্তু বরফের ওপর সত্যিই কি কাজের জিনিস এগুলো? লোকে পাগল বলবে না তো?'

হাসি চেপে নিরীহ ভঙ্গিতে বলল কংকর, 'টেস্ট করে দেখলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী···রওনা হয়ে যাও দু'জনেই। দেখা যাক ফলাফল।'

ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিল নোলার, সবাই মিলে নর্থ স্লোপে পৌঁছল ওরা। ওখানে অনুষ্ঠিত হবে পেরী কংকর আর মিলটন স্টেনারের মধ্যে প্রতিযোগিতা।

জমাট বাঁধা সাগরের ওপর দিয়ে ছুটল ওদের স্কি-ডু।

আগেই দশ মাইল পর পর ব্যাটারি চালিত ল্যাম্প ফেলা হয়েছে হেলিকপ্টার থেকে। প্রথম আলোটা লক্ষ্য করে ছুটে চলল জোড়া স্কি-ডু, দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। সত্যিকার যাত্রায় বরফ পরিস্থিতি এরচেয়ে খারাপ হতে পারে, কিন্তু এখানেও খুব সুবিধের নয়। প্রথম দশ মাইলের মধ্যেই বেশ কয়েক জায়গায় ডেবে আছে বরফ, সে সব গর্তে পানিও জমে আছে। তাছাড়া ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া ঢাল তো আছেই। দু'তিনটে ঝাড়া আট-দশ ফিট উঁচু।

খানিক অপেক্ষা করে গরম শেডের ভেতর সবাইকে নিয়ে ফিরে এল রানা। স্কি-ডুর ট্যাংকে পেট্রল আর মোবিল তেল ভরাই ছিল, জ্বালানি প্রায় শেষ করে শেডের সামনে ফিরে এল ওরা। গোটা প্রতিযোগিতায় একবারও পিছনে ফেলতে পারেনি স্টেনার কংকরকে, বরং বার কয়েক মাইল খানেক এগিয়ে যাবার পর অপেক্ষা করেছে কংকর ওর জন্যে থেমে দাঁড়িয়ে। চোদ্দ ঘণ্টায় ছয়শো মাইল পেরিয়েছে ওরা। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে স্টেনারের, কিন্তু কংকর আগের মতই সতেজ আর প্রাণবন্ত।

স্কি-ডু থেকে নেমে পরাজিত কণ্ঠে বলল স্টেনার, 'মানলাম তোমার কথাই ঠিক। এখন আমি শুতে যাচ্ছি।'

'ভেরি গুড,' বলল রানা। 'ওয়েল ডান কংকর। তুমিও যাও, বিশ্রাম নাও গিয়ে। জিতেছ তুমিই।'

'এক মিনিট, ওস্তাদ,' তাড়াতাড়ি বলল কংকর। 'সত্যিই কি জিতেছি আমি? জানতে হলে ইঞ্জিন খুলে দেখতে হবে সবকিছু ঠিক আছে কিনা।'

খোলা হলো ইঞ্জিন। কোথাও কোন গোলমাল নেই। মটর দুটো খুলে অসংখ্য খুদে পার্টসের স্তূপ তৈরি করল কংকর, নতুনের মত চকচক করছে সব। প্রতিটি পার্টস খুঁটিয়ে দেখল সে, নতুন করে তেল মাখাল। তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন, ওস্তাদ। প্যাক আইসে এরা আমাদের সাথে বেঈমানী করবে না।'

ওর কথা শুনল সবাই, কিন্তু কারও চেহারায় উৎসাহের কোন চিহ্ন ফুটল না।

প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত করা এবং ফাইন্যাল ব্রিফিঙের জন্য পরদিন সকালে ওয়াশিংটনে ফিরে এল ওরা। দেয়ালে ম্যাপ আর চার্ট লাগানো সেই আগের কনফারেন্স রুমে বসল ওরা, ব্রিফিঙের দায়িত্বে আছে নোলার। বরফ, ঠাণ্ডা আর রাশিয়ানদের কথা ভুলে থাকতে পারলে কামরার উষ্ণ পরিবেশ আর আরাম করে বসার আয়োজনটা উপভোগ্যই বলা যায়। ভেতরে ঢোকার পর অপরিচিত, নতুন একজন লোককে দেখতে পেল ওরা। তার চোখ জোড়া প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানার। কারজো বুতেরার মত, সবকিছু ভেদ করে সামনে চলে যায়, হরাইজন আইজ। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও পলক পড়তে দেখল না রানা ওর চোখে। সবাইকেই দেখল সে, কিন্তু রানা ছাড়া আর কারও ওপর দু'সেকেন্ডের বেশি স্থির হলো না তার দৃষ্টি। ঘাড় ফেরানো ছাড়া নড়াচড়াও খুব কম। গাঢ় ব্লু রঙের একটা স্যুট পরে আছে, দেখে মনে হয় আর কারও জন্যে বানানো হয়েছে সেটা। মাঝে

মধ্যে হাত তুলে কলার ধরে সেটা সিধে করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে, যেন কলার পরা তার অভ্যেস নয়।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে সবাই সবার দিকে তাকাল বটে, কিন্তু তখুনি কেউ ওদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিল না। গোল টেবিলের চারধারে যে-যার আসনে বসল সবাই। এরপর নোলার বলল, 'স্কিপার ব্রেল ফাইজারের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইংল্যান্ড থেকে এসেছে ও। হাল ট্রলার ফ্লিটের ক্যাপ্টেন।'

ফাইজারের নাকের দু'পাশে ভাঁজ খেয়ে গেল চামড়া, বুঝতে হলো এটাই তার হাসি। ঠোঁট জোড়া সামান্য একটু ফাঁক হলো কি হলো না, কিন্তু ভেতর থেকে গম গমে ভারী একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'আমি তোমাদেরই লোক।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন কুকের মত ব্রেল ফাইজারও হুইটবি থেকে এসেছে, তাকে আমরা ক্যাপ্টেন কুকের বংশধর বলতে পারি।' ঠাট্টা করে কেউ হেসে ফেলতে পারে আশঙ্কা করেই বোধহয় খুক খুক করে কেশে পরিবেশটাকে ভাব-গম্ভীর করে তোলার চেষ্টা করল নোলার। তারপর আবার বলল, 'ডিসট্যান্ট ওয়াটার ফিশারম্যান বলতে যা বুঝি আমরা, ও তাই। ট্রলারের স্কিপার হিসেবে আইসল্যান্ড, স্পীটসবার্জেন, এবং হোয়াইট সী-তে ত্রিশ বছর কাটিয়েছে ও। পর পর সাতবার মউশুমের টপ ক্যাচের জন্যে সিলভার কড পেয়েছে, এর কাছাকাছি কেউ আসতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কেউ আসতে পারবে বলে মনে হয় না। বরফ এবং আর্কটিক সী সম্পর্কে জানতে কিছু বাকি নেই ওর। যুদ্ধের ট্রেনিংও নেয়া আছে, ডেস্ট্রয়ার কমান্ডার হিসেবেও কয়েক বছর কাজ করেছিল।'

নোলার চুপ করল। ফাইজার অনুভব করল, তার কিছু বলা দরকার। মাথা তুলে সবার দিকে তাকাল সে। ঘুরে ফিরে আবার স্থির হলো চোখ জোড়া রানার মুখের ওপর। 'তোমাদের সাথে কাজ করতে পারলে আমি খুশি হব।' সবাই বুঝল, কম কথা বলিয়ে আরেকজনকে পাওয়া গেল দলে।

'এখন তাহলে প্ল্যানের কথায় আসি,' বলল নোলার। 'তোমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হবে থিউল এয়ারবেস, গ্রীনল্যান্ড।'

'সাথে কোন এসকর্ট থাকবে না?' তিক্ত সুরে জানতে চাইল রানা।

বলে চলল নোলার, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি, 'ওখানে স্কি-ডুগুলো বাফেলো এয়ারক্রাফটে তোলা হবে। মেজর রানা বাফেলো এয়ারক্রাফট সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন।'

'কানাডার হাভিল্যান্ড কোম্পানীর তৈরি,' বলল রানা। 'ক্যারিবো থেকে ডেভেলপ করা হয়েছে টারবো প্রপ। হুইল আর স্কি। চমৎকার এয়ারক্রাফট।'

'রাইট,' বলল নোলার। 'স্কি-ডু নিয়ে তোমরা সবাই বাফেলোতে চড়ে স্পিটসবার্জেনে যাবে, ওখানে রিফুয়েলের জন্যে নামবে বাফেলো, তারপর ল্যান্ড করবে...'

বাধা দিল ড. এডওয়ার্ডস, 'কোথাও না থামলেই কি ভাল হত না?'

'হত,' বলল নোলার। 'কিন্তু বরফে ল্যান্ড করতে পারে যে-সব প্লেন তাদের ফুয়েল ক্যাপাসিটি এত বেশি নয় যে কোথাও না থেমে অতদূর যেতে পারবে। প্লেনটাকে ফিরেও তো আসতে হবে। কাজেই, স্পিটসবার্জেনে রিফুয়েলের জন্যে

থামতে হবে বাফেলোকে, এরপর সেটা ল্যান্ড করবে বরফে…' ম্যাপের গায়ে ছোট্ট একটা ক্রসের ওপর আঙুল রাখল সে। '…এখানে। এখান থেকে নোভাইয়া জেমলাইয়া দুশো মাইল, স্পিটসবার্জেন থেকে চারশো মাইল। তোমরা নেমে যাবার পর আবার টেক অফ করবে বাফেলো, ফিরে আসবে থিউলে। ভাগ্য যদি বিরূপ না হয়, রাশিয়ানরা শুধু তাদের রাডারে দেখতে পাবে, একটা এয়ারক্রাফট দুশো মাইলের মধ্যে এসেছিল, তারপর আবার ফিরে গেছে। আশা করা যায়, ব্যাপারটা তাদেরকে উদ্বিগ্ন করবে না।'

'বাফেলো থিউলে ফিরে এলে আমরা ফিরব কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'পরে,' বলল নোলার। 'রওনা হবার জন্যে তোমাদের হাতে ঘণ্টাখানেকের মত টোয়াইলাইট থাকবে, তারপর অবশ্য চাঁদের আলো পাবে। অন্ধকারে এগোনোটা কঠিন হবে, জানি…'

'জানো তাহলে?' বলল রানা।

'শোনো…'

'মুহূর্তটা আমাদের জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে,' বলল রানা। 'সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকব আমরা, হাঁ করে তাকিয়ে দেখব প্লেনটা আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছে। টেমপারেচার…ষাটের নিচে, কিন্তু তাতে কি! তাছাড়া…'

'তাছাড়া, সময় নষ্ট না করে তখুনি রওনাও হতে হবে তোমাদের,' ঠাণ্ডা গলায় বলল নোলার। 'তোমার উদ্বেগের কারণটা আমি বুঝি, রানা, এবং অ্যাপ্রিশিয়েটও করি। জানি, সবার নিরাপত্তার কথা ভাবছ তুমি। কিন্তু একথাও সত্যি যে শুধু নিরাপত্তার দিকটা দেখতে গেলে মিশনটা ব্যর্থ হবে, এবং সে-ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'বলে যাও।'

'যে সুযোগটা দরকার, আবহাওয়া সেটা তোমাদের দেবে বলে ধরে নিচ্ছি আমি,' শুরু করল নোলার। 'এই পয়েন্ট থেকে পরবর্তী টোয়াইলাইট পর্যন্ত তোমরা সময় পাবে তেইশ ঘণ্টা—যেদিন তোমরা রওনা হবে বলে ঠিক করা হয়েছে এটা সেদিনের হিসেব। তোমাদের ছয়জনের জন্যে থাকছে ছয়টা স্কি-ডু। একটা স্নোমোবাইল দু'জনের বেশি আরোহী নিতে পারবে না, পথে দুটো ভেঙে বা অচল হয়ে পড়তে পারে বলে ছয়টা দেয়া হচ্ছে। এই মার্জিনটা শতকরা তেত্রিশ ভাগ বা এক তৃতীয়াংশ—এবং আমাকে জানানো হয়েছে চারশো মাইলের মধ্যে এরচেয়ে বেশি রেটে ব্রেক ডাউনের আশঙ্কা নেই প্রতিটি ডুর সাথে অতিরিক্ত ফুয়েল ট্যাংক আছে, কমবেশি ত্রিশ ঘণ্টা চলতে পারবে। ব্রেক ডাউনের ঘটনা যদি ঘটে, ফুয়েল আরেকটা ডুতে সরিয়ে নিতে হবে। কোন প্রশ্ন?'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল সবাই নোলারের দিকে। কেউ মাথাও নাড়ল না, মুখও খুলল না।

'গুড,' আবার শুরু করল নোলার। 'ধরে নিচ্ছি, ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল করে এগোবে তোমরা, খাওয়াদাওয়ার জন্যে একবার থামবে। এইট কিংবা নাইন পি. এম-এ নোভাইয়া জেমলাইয়ায় পৌঁছুবে তোমরা পৌঁছুনোটা একটু তাড়াতাড়িই হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা জায়গাটাকে ভাল করে ঘুরে দেখার একটা সুযোগও

এনে দেবে তোমাদের। সম্ভবত দশ এবং এগারোটার মধ্যে ভেতরে ঢুকবে তোমরা। একবার ভেতরে ঢুকতে পারলে কাজ সারতে বেশি সময় লাগা উচিত নয়। তারমানে, সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে, তবেই।'

কল্পনার চোখে রাইফেল আর রিভলভার দেখতে পেল এডওয়ার্ডস। ফটাফট গুলি ছুঁড়ছে লোকজন, ওরা বিল্ডিংটায় ঢোকার আগেই মিশনের বেশির ভাগ সদস্য মরে ভূত হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে আর সবার দিকে তাকাল সে। গ্র্যানিট পাথরের মূর্তি এক একটা। মনে মনে কে কি ভাবছে বোঝা না গেলেও বাইরে থেকে দেখে কাউকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে ধরার উপায় নেই। নিঃসঙ্গ বোধ করল সে তবে আর সবার চেয়ে এক কাঠি বাড়া মনে হলো কংকরকে। তার চেহারায় ভাবনার লেশমাত্র আভাসও নেই, বরাবরের মত সহজ, সাবলীল, প্রশান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

বলল, 'আমরা তো আর ঢাক-ঢোল পেটাতে পেটাতে ভেতরে ঢুকব না। পা টিপে টিপে ঢুকব। গিয়ে দেখব সবাই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।'

'সেটা ধরে নেয়া উচিত হবে না,' বলল নোলার। 'যে-কোন ধরনের বিপদের জন্যে তৈরি থাকতে হবে তোমাদের। যদি মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছ, একটু দেরি করে ভেতরে ঢুকবে। কিন্তু প্রথম দিকেই যদি দেরি করে ফেলো বা দেরি হয়ে যায়, সময়টা কাভার করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।'

'আমারও ধারণা রাশানরা তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়বে,' বলল রানা। 'ওটা যদি তোমাদের ক্যাম্প জিরোর মত একটা ক্যাম্প হয়ে থাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল কংকর।

'ভেতরে ঢোকা আর বেরিয়ে আসা,' বলে চলল নোলার, 'সবটাই তোমাদের ওপর নির্ভর করে। ফটো ইন্টারপ্রিটেশন সাজেস্ট করে পাহাড়টা দেড়শো ফিট উঁচু, ক্রমশ উঠে গেছে, কিন্তু ঠিক খাড়া নয়। চিমনির মত কি যেন সব দেখা যায়।'

'দেড়শো ফিট?' বলল হিরোমিচি নিতাই। 'বাচ্চা ছেলের কাজ। পাথরে পিটন ঠুকলে শুনতে পাবে ওরা?'

'পারলে এড়িয়ে যেয়ো,' সাবধান করে দিল নোলার। 'ওখানে যদি সিসমোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট থাকে, ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাবে। তবু, একান্ত যদি ব্যবহার করতেই হয়, মাথায় রাবার প্যাড লাগানো কিছু পিটন নিয়ে যাবে তোমরা, তাতে আওয়াজ অনেকটা কম হবে। কিন্তু মুশকিল হলো, আওয়াজের চেয়ে ভাইব্রেশনটাই বেশি বিপজ্জনক।'

'বুঝেছি,' বলল নিতাই।

দেড়শো ফিট উঁচু পাহাড় টপকানো নাকি বাচ্চা ছেলের কাজ! নিতাইয়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল এডওয়ার্ডস। পাহাড়টা নিয়ে এখুনি মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল তার। কিন্তু হঠাৎ উপলব্ধি করল, নিতাই একাই দু'জনকে কাঁধে তুলে পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যেতে পারবে। দুশ্চিন্তা থেকে জোর করে নিজেকে মুক্ত করে আবার ওদের কথায় মন দিল সে।

'ভেতরে ঢোকার সময় সেসলভের জন্যে প্রোটেকটিভ কাপড়চোপড় সাথে করে নিয়ে যাবে তোমরা,' বলে চলেছে নোলার। 'যত তাড়াতাড়ি পারো কাপড় পরাবে তাকে, তারপর বাইরে বের করে আনবে। রেসকিউ স্ট্রেচারে করে পাহাড়

থেকে নামাতে হবে, সাথে সাথে তুলে দেবে একটা স্কি-ড্রুতে। এরপর আর কোন কারণেই দেরি করা উচিত হবে না, রওনা হয়ে যেয়ো। মেজর রানার ড্রুতে থাকবেন সেসলভ।'

একটা কথা মনে জাগল, বুদ্ধি করে প্রশ্নটা করেও বসল এডওয়ার্ডস। 'আমরা ভুল করছি, তা বোধহয় নয়। কিন্তু যদি দেখা যায়, আমাদের ধারণাটা আগাগোড়াই ভুল ছিল? যদি সেসলভ আমাদের সাথে আসতে না চান?'

নোলারের চেহারায় অদ্ভুত একটা কাঠিন্য ফুটে উঠল। 'তাকে তোমরা নিয়ে আসতে যাচ্ছ, তিনি না আসতে চাইলেও তাকে তোমরা নিয়ে আসবে।'

'কোন বিকল্প নেই?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'না...' খানিক ইতস্তত করতে দেখা গেল নোলারকে। এবার শুধু কাঠিন্য নয়, তার চেহারায় নির্মম একটা ভাব ফুটে উঠল। 'তিনি যদি আসতে না চান, মানে, তোমরা যদি তাকে জোর করেও নিয়ে আসতে না পারো...ওয়েল, তোমরা জানো রাশিয়ানরা এমন একটা কিছু করতে যাচ্ছে যার ফলে গোটা দুনিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে...সেসলভের সাহায্য না পেলে কাজটা করতে পারবে না ওরা। আমরা চাই, সেসলভ আসতে চান বা না চান, তিনি যাতে রাশিয়াকে ওই কাজে সাহায্য করতে না পারেন সেদিকটা তোমরা অবশ্যই দেখবে।'

'তাকে খুন করে আসতে হবে?' প্রশ্নটা করতে গিয়েও করল না রানা। উত্তরটা কি দেবে নোলার, জানা আছে ওর।

কেউ কোন কথা বলল না দেখে আবার শুরু করল নোলার, 'এবার ফিরে আসা সম্পর্কে। নোভাইয়া জেমলাইয়া থেকে ফিরতি পথে এমন একটা কোর্স ধরবে তোমরা, যেটা অভিযান শুরুর পয়েন্ট থেকে বেশ খানিকটা দক্ষিণে নিয়ে যাবে তোমাদের।' ম্যাপের গায়ে একটা ক্রস চিহ্ন আঁকল সে। 'কোর্সটা এখানে নিয়ে আসবে তোমাদের। এ-ও দুশো মাইলের ধাক্কা, কিন্তু একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন সারফেস ভেঙে মাথা চাড়া না দিলে এই দূরত্ব কমাবার কোন উপায় নেই। তোমরা জানো, সেটা সম্ভব নয়।'

কেউ কথা বলল না।

স্কিপার ব্রেল ফাইজারকে ইঙ্গিতে দেখাল নোলার। 'এরপর ওকে কিছু কাজ দেখাতে হবে।'

সবাই ফাইজারের দিকে তাকাল।

'এই মীটিং শেষ করে আইসল্যান্ডের, কিফলাভিকে ফিরে যাচ্ছে ও,' বলল নোলার। 'ওর ট্রলার হোয়াইট স্টার সেখানে অপেক্ষা করছে। কাঠের বাক্সে ভরা দুটো জিনিস আছে ট্রলারে। একটা অটার এয়ারক্রাফট, আর একটা গ্লাস ফাইবারের তৈরি কুঁড়েঘর। ঘরটা হালকা, জোড়া লাগিয়ে খাড়া করতে বেশি সময় লাগবে না। হোয়াইট স্টার নিয়ে আইস-প্যাকের কিনারা পর্যন্ত যাবে স্কিপার ফাইজার, বাক্স নামিয়ে ঘরটা খাড়া করবে, তারপর নামানো হবে অটারের বাক্স, পাইলট এবং একজন মেকানিক সহ। হোয়াইট স্টারের ক্রুরা প্লেনটাকে অ্যাসেম্বল করতে সাহায্য করবে। এরপর ফিরে আসবে হোয়াইট স্টার পিছনে কুঁড়েঘরের ভেতর রেখে আসবে অ্যাসেম্বল করা প্লেন, আকাশে ওঠার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

ওখানে পৌঁছেই স্কি-ডু ছেড়ে তোমরা অটারে চড়বে। অটার তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে থিউলে। গ্রীনল্যান্ড কোস্টলাইন পেরিয়ে এলেই ফাইটার জেটের একটা স্কোয়াড্রন এসকর্ট করে নিয়ে আসবে তোমাদের। ও. কে?'

'বরফে থাকতেই একটা প্লেন যদি খুঁজে নিত আমাদের, সেটা কি ভাল হত না?' জানতে চাইল রানা।

'হত,' বলল নোলার। 'কিন্তু ওখানে কোন প্লেন পাঠালেই রাশিয়ানদের রাডারে সেটা ধরা পড়ে যাবে। তোমাদের তোলার জন্যে সেটা ল্যান্ড করলেই ঝাঁক ঝাঁক মিগে ঢাকা পড়ে যাবে আকাশ।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু অটারকে আমরা খুঁজে বের করব কিভাবে? ওখানে কম্পাস কি রকম নাচানাচি করে সে তো তুমি জানোই।'

'সেজন্যেই তোমাদের নেভিগেশন করতে নিষেধ করব আমি,' বলল নোলার। 'প্রতিটি স্কি-ডুর সাথে একটা করে রেডিও সেট দেয়া হয়েছে। তোমরা যখন ফিরতি পথে থাকবে, আমাদের ফিশিং ফ্লিটের একটা ট্রলার গভীর সমুদ্র থেকে পাঁচ মিনিট পর পর একটানা ত্রিশ সেকেন্ড সিগন্যাল পাঠাবে। সোজা সেই সিগন্যাল ধরে এগোবে তোমরা।'

'যদি কোথাও কোন গোলমাল দেখা দেয়?' জানতে চাইল রানা।

'নেভিগেট। স্টারস অ্যান্ড কম্পাস।'

'না, আমি বলছিলাম অটারে যদি কোন গোলমাল দেখা দেয়?'

'অটারের বিকল্প হোয়াইট স্টার। প্লেনটা যদি ব্যবহার করা না যায়, আইস-প্যাক থেকে পাঁচ মাইল দূরে ওটা তো থাকবেই। রেডিও সিগন্যাল পেলেই কিনারায় চলে আসবে সে, তোমাদের তুলে নিয়ে ফিরে আসবে ফিশিং ফ্লিটের মাঝখানে। আশিটা জাহাজের মাঝখানে নিরাপদেই থাকবে ওটা।'

থামল নোলার, সবার দিকে তাকাল। 'কোন প্রশ্ন?'

'স্কি দরকার হবে আমাদের,' বলল কারজো বুতেরা। 'দুটোর বেশি স্কি-ডু নষ্ট হয়ে গেলে অন্যগুলো স্কি-তে চড়া আরোহীদের টেনে আনতে পারবে।'

'স্নো বুটে মেটাল ক্লিপিং দরকার, পাহাড়ে চড়ার জন্যে,' বলল নিতাই। 'কিভাবে লাগাতে হবে দেখিয়ে দেব আমি।'

'সেসলভ একজন ডায়াবেটিক,' বলল এডওয়ার্ডস। 'তাঁর পথ্য ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি না। কি ধরনের ইনসুলিন লাগবে তাও...'

'তিনি ইংরেজী জানেন,' বলল নোলার, 'সেটা সাহায্য করবে। আর ইনসুলিন...আপনার কালো ব্যাগে সাতান্নটা ভ্যারাইটির সবগুলো ভরে নিন।'

খুঁটিনাটি আরও অনেক বিষয় নিয়ে কথা হলো ওদের মধ্যে। এক ফাঁকে উঠে দাঁড়াল ব্রেল ফাইজার, কিফলাভিক ফ্লাইট ধরতে হবে তাকে। দরজার কাছে পৌঁছে নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল সে। সবার দিকে তাকাল তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'লাক।'

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। শব্দটা ভীষণ ভাবে নাড়া দিল ওদেরকে। সবাই উপলব্ধি করল, এই মিশনে সফল হতে হলে, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হলে ওটাই সবচেয়ে বেশি দরকার হবে ওদের— ভাগ্য।

আবার শুরু হলো আলোচনা। কিন্তু একটু যেন চাপা গলায়।

দুই

গ্রীনল্যান্ডের থিউলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিরাট একটা বিমান ঘাঁটি রয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় অনবরত প্রকাণ্ড বোমারু বিমান যেখানে ওঠা-নামা করতে পারে সেখানে তো হাজার কয়েক লোকের বসবাসের আয়োজন থাকবেই। আর মানুষ থাকলে তাদের খাওয়া-দাওয়া, খেলা-ধুলো, আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থাও না থেকে পারে না। শুধু এস্কিমো আর ভালুক থাকার উপযোগী আবহাওয়া আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় সাধারণ মানুষের বাসোপযোগী করে নেয়া হয়েছে। অপেক্ষার দিন ক'টা অফিসার্স ক্লাবে কাটাল ওরা, যে-কোন পাঁচ তারা হোটেলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে ওটাকে। ভেতরে সিনেমা হল, বার, ফুটবল আর টেনিস খেলার মাঠ ইত্যাদি সবই আছে। টাটকা ফল, তরিতরকারিও পাওয়া যায়। বাইরে বেরোবার যে কোন দরজার সামনে উইন্ডচিল টেবিল্ আছে, তার সাথে আছে বড় বড় হরফে লেখা সতর্কবাণী—'বাইরে বেরোবার আগে জুতো বদলে ফেল্ট বুট পরে নিন'। হয়তো মাত্র দু'মিনিটের জন্যে বাইরে বেরিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবে কেউ, এক বা দুশো গজের বেশি যাবে না সে, তার মনে হতে পারে এইটুকুর জন্যে আর জুতো বদলাবার দরকার কি। কিন্তু এইটুকুর জন্যেও ফেল্ট বুট না পরলে মারাত্মক ভুল করবে সে। চামড়ার ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারে ঠাণ্ডা, দু'একশো গজ হেঁটে গেলেও জমে বরফ হয়ে যেতে পারে পা। এখানে দু'জন নবাগতের গল্প সবার মুখে মুখে ফেরে। ফেল্ট বুট না পরে বাইরে বেরিয়ে দু'জনেই তাদের পা হারিয়েছিল।

এই ক'টা দিন সবচেয়ে আনন্দে কাটল ড. এডওয়ার্ডসের। পায়ের ক্ষতটা ইতোমধ্যে শুকিয়ে গেছে, নতুন চামড়া গজিয়েছে ওখানে। কিন্তু ঠাণ্ডা জিনিসটা সব সময় দুর্বল জায়গা খুঁজে বেড়ায়, কোথাও কোন ক্ষত পেলেই নিষ্ঠুর হামলা চালায়। ভেতরে যতক্ষণ থাকে সে, ক্ষতটা অনুভব করে না, কিন্তু বাইরে বেরোলে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়।

চলতি মাসের বারো তারিখে খবর পেল রানা, ফাইজার আর তার ক্রুরা বরফের ওপর নিরাপদে নামাতে পেরেছে অটার প্লেন আর কুঁড়েঘর। ঘরটা খাড়া করার কাজও শেষ। ভেতরে অ্যাসেম্বল করা অটার অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। এক ঘণ্টা চালু রেখে পরীক্ষা করা হয়েছে ইঞ্জিন, কোথাও কোন ত্রুটি নেই। বরফের কিনারা থেকে হোয়াইট স্টারকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ফাইজার, অটারের সাথে রেখে এসেছে পাইলট আর নেভিগেটরকে, কুঁড়েঘরের ভেতর। ফাইবার গ্লাসের অত্যন্ত শক্ত পোক্ত দেয়াল, ওদের সাথে স্টোভও আছে, বাইরের আবহাওয়া যাই হোক না কেন, ভেতরে ওদের জন্যে কোনরকম বিপদ নেই। প্রকৃতির বদলে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের একটা দল যদি হানা দেয়, তাহলে

ওদের বিশেষ কিছু করার থাকবে না। যদিও ওই এলাকায় রাশিয়ানরা পা দিতে পারবে বলে সি.আই.এ. বিশ্বাস করে না।

পাইলট আর নেভিগেটরের কথা ভেবে দুঃখই বোধ করল রানা। কোন বিপদ যদি নাও ঘটে, বরফের একটা ছোট ঘরের ভেতর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করা, স্নায়ুর ওপর অত্যাচার নয় তো কি!

ঠিক সময়েই বরফের কাছ থেকে পিছিয়ে গেছে ফাইজার, ভাবল রানা। কারণ, এই খবর পাবার পরপরই গোটা আর্কটিকে নেমে এল তীব্র তুষার ঝড়। চোখের সামনে নিজের হাত তুললেও দেখতে পাওয়া যায় না, বাতাসের সাথে এত ঘন হয়ে ছুটে যাচ্ছে তুষার কণা। রেডিও মেসেজ পাঠানো বা রিসিভ করাও ঝামেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। দু'প্রান্তের অপারেটর কেউ কিছুই বুঝতে পারে না। ওদের জন্যে এলাকাটা মনিটর করছিল একটা রিকনিস্যান্স প্লেন, বরফ ছেড়ে ছত্রিশ ঘণ্টা উঠতেই পারল না সেটা।

নিজের কামরায় সারাটা সময় শুয়ে বসে কাটাল রানা। শুধু ওয়েদার রিপোর্ট এলে একটু যা চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল ওর মধ্যে। তুষার ঝড় থিউলকেও কম হেনস্তা করল না। এই পরিস্থিতিতেও এয়ারক্রাফটের ওঠা-নামায় বিরতি নেই, সেমি অটোমেটিক ল্যান্ডিং সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও প্রতিবার প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে হলো পাইলটদের। চোদ্দ তারিখে রওনা হওয়া যেত, ওরা যেখানে যাচ্ছে সেখানের আবহাওয়া মোটামুটি নিরাপদের কাছাকাছিই ছিল, কিন্তু এদিকে থিউলের আবহাওয়া আরও খারাপের দিকে মোড় নিল। ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে বইছে ঝড়, মাঝেমধ্যেই সেটা বেড়ে গিয়ে উঠে যাচ্ছে নব্বই পর্যন্ত। তবু হয়তো বাফেলো উঠতে পারত আকাশে, কিন্তু রানাকে জানানো হলো এতে নাকি দুর্ঘটনা ঘটার শতকরা আশি ভাগ সম্ভাবনা থেকে যায়। সে-রাতে যে যার নিজের কামরায় ঢোকার আগে পর্যন্ত বাইরে থেকে ভেসে আসা প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য অনুভব করল।

রাত একটায় ঘুম থেকে তোলা হলো ওদের।

ঘুম জড়ানো চোখ ডলতে ডলতে দরজা খুলে দিল রানা। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে থিউলের একজন অফিসার।

'কি ব্যাপার?' বিরক্তির সাথে জানতে চাইল রানা।

'আপনাদের সময় হয়েছে, মি. রানা।'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'কিসের সময়? মাত্র...'

'কান পাতুন, মি. রানা।'

প্রথমে কিছু টের পেল না রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই। পর মুহূর্তে এই নিস্তব্ধতার অর্থ বুঝতে পারল ও। জানালার সামনে এসে পর্দা সরিয়ে তাকাল বাইরে। ঝলমলে খ্রিস্টমাস কার্ডের মত একটা দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে। বরফ কোথাও স্তূপ হয়ে আছে, কোথাও ডেবে আছে, কোথাও ভাঁজ খেয়ে অনেক দূর পর্যন্ত অদ্ভুত নকশা তৈরি করেছে। ওভারহেড ফ্লাডলাইটের হলুদ আলোয় সোনার মত চকচকে রঙ হয়েছে চারদিকের। বাতাসে তুষার কণা তো দূরের কথা, বাতাসই নেই। সব কিছু আশ্চর্য শান্ত এবং স্থির।

তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে কাপড় পরে নিল রানা। বাইরে পোলক্যাট অপেক্ষা করছিল, পৌছে দেখল হিরোমিচি নিতাই আর কারজো বুতেরা এরই মধ্যে হাজির হয়েছে। রানার পিছু পিছু এল জন এডওয়ার্ডস। তারপর মিলটন স্টেনার। সবশেষে পেরী কংকর। সবাই উঠে বসতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল পোলক্যাট, সোজা এসে ঢুকল হ্যাঙ্গারের ভেতর, এখানেই ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে বাফেলো। পোলক্যাট থেকে নামতেই একজন অফিসার একটা ওয়েদার রিপোর্ট ধরিয়ে দিল রানার হাতে। দ্রুত একবার পড়ল রানা, তারপর ধীরে ধীরে আরেকবার।

'শোনো। এখনকার অবস্থা ভালই বলা চলে। টাচ-ডাউন পয়েন্টে হালকা তুষার ছুটছে—বিশ নট গতিতে। গ্রাউন্ড টেম্পারেচার দশ ফারেনহাইট। সারাটা পথ এই পরিস্থিতি থাকতেও পারে, নাও পারে। ওয়েদার ফোরকাস্ট বলছে, থাকবে। কিন্তু সাইবেরিয়ার কিচেনে কি রান্না হচ্ছে তা একমাত্র খোদাই বলতে পারে।' মুঠোর ভেতর কাগজটাকে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল রানা। 'চলো।'

ওপর দিকে খাড়া হয়ে থাকা লেজের নিচে লোডিং ডোরটা নামানো হয়েছে, সেটার ওপর দিয়ে ওদের সবার ইকুইপমেন্ট সহ প্লেনে চড়েছে স্কি-ডুগুলো। সেই একই পথে প্লেনে চড়ল ওরাও, বসল প্যারাট্রুপার টাইপের সীটে। ল্যাপ-স্ট্র্যাপ বেঁধে নিল সবাই। একটু পরই শোনা গেল জোড়া প্রাট এবং হুইটনি টারবো প্রপের গুঞ্জন। একটু ঝাঁকি খেল বাফেলো, সেই সাথে বেরিয়ে আসতে শুরু করল হ্যাঙ্গার থেকে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। সারি সারি আলোর পাশ দিয়ে পেরিমিটার ট্র্যাকের দিকে এগোল বাফেলো। খানিক পর আর কোন আলো দেখা গেল না। অন্ধকারে সাদা বরফের বিস্তার আবছাভাবে টের পাওয়া যায়। দাঁড়িয়ে পড়েছে বাফেলো, অপেক্ষা করছে অনুমতির জন্যে। ইঞ্জিনের অলস গুঞ্জন ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না, এইভাবে প্রায় মিনিটখানেক কাটল। তারপর গুঞ্জনটা বাড়তে শুরু করল। থ্রটল খুলে দেয়া হয়েছে। ফুল পাওয়ার দেয়া হলো ইঞ্জিনে, এয়ার ফ্রেমে কাঁপুনি উঠে গেল।

সামান্য একটু ঝাঁকি, তার মানে হুইল ঘুরতে শুরু করেছে। এরপর তীরবেগে ছুট দিল প্লেন। সবশেষে পিছিয়ে নিয়ে আসা হলো স্টিক, সেই সাথে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠল বাফেলো। বাতাসে ভর করে সাবলীল ভঙ্গিতে ছুটে চলল সে। এর একটু পরই বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠা পতন শুরু হলো, তার মানে থ্রটল পিছিয়ে নিয়ে এসেছে পাইলট। সেই সাথে বোতাম টিপে 'নো স্মোকিং' আর 'ফাস্‌ন্ ইয়োর সীট বেল্ট' সাইন নিভিয়ে দেয়া হলো। সিগারেট ধরাল না কেউ, তবে ওরা সবাই যে-যার ল্যাপ-স্ট্র্যাপ খুলে নড়েচড়ে আরাম করে বসল।

'দশ হাজার ফিট,' লাউডস্পীকার থেকে ভেসে এল পাইলটের গলা 'বারো হাজার অলটিচ্যুডে স্পীটসবার্জেনে যেতে চাই আমি। কেবিন প্রেশারাইজড নয়, কিন্তু ইচ্ছে করলে অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারবেন। আপনাদের মাথার ওপর লকারে আছে মাস্ক।'

সুইচ অফ করার ক্লিক আওয়াজটা অস্বাভাবিক জোরাল শোনাল কেবিনের

ভেতর। কেউ কথা বলল না। নিতাই আর কংকর এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুতেরা চোখ খুলে ঝিমুচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বোঝা গেল না। তার স্থির চোখ জোড়া কেবিনের দেয়ালে আটকে গেছে। সবচেয়ে বেশি নড়াচড়া করছে এডওয়ার্ডস, ঘাড় ফিরিয়ে, মাথা উঁচু করে বারবার এর তার দিকে তাকাচ্ছে সে। শুধু একজন নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছে—মিলটন। অ্যামুনিশন পাউচ থেকে বুলেট বের করে অল্প তেল মাখা ন্যাকড়া দিয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রতিটি ধূলিকণা পরিষ্কার করছে সে। কাজটা সেরে এবার রাইফেলে হাত দিল। বোল্ট সরিয়ে পরীক্ষা করল সেটা, পালিশ করল, তারপর চেক করে নিল ব্রীচ মেকানিজম। মাথার পিছনে হাত দুটো পরস্পরের সাথে বেঁধে, ঠোঁট জোড়া গোল করে মৃদু মৃদু শিস দিচ্ছে রানা, কেবিন ফ্লোরে সুরের তালে তালে পা ঠুকছে হালকা ভাবে। এডওয়ার্ডস ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখতে পেয়ে সম্ভবত অভয় দেবার জন্যেই একটা চোখ টিপে মৃদু হাসল।

জোর করে একটু হাসল এডওয়ার্ডসও। সামনের বিপদসঙ্কুল যাত্রার কথা মন থেকে কোনমতে তাড়াতে পারছে না সে। খাচ্ছিল চাষী তাঁত বুনে, কি করল চাষী এঁড়ে গরু কিনে!—ইংরেজীতেও এই ধরনের একটা প্রবাদ আছে, বার বার সেটার কথা মনে পড়ছে তার। মানুষের শরীর কাটাছেঁড়া করা যার পেশা, তার কি এসব সইবে? একজন শল্য চিকিৎসকের মজাটা হলো, হাজার হাজার মানুষের শরীর খোঁচালেও তার নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগার ভয় নেই। কে জানে, হয়তো সেজন্যেই এই লাইনে এসেছিল সে। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে পড়ে শেষ পর্যন্ত এখানে নয় সেখানে নয় যেতে হচ্ছে একেবারে সেই মেরুপ্রদেশে! তাও কি শুধু বেড়াতে? এলিতেলি নয়, একটা সুপার পাওয়ারের হয়ে আরেকটা সুপার পাওয়ারের একজন বিজ্ঞানীকে হাইজ্যাক করতে যাচ্ছে সে! এর চেয়ে মহা বিস্ময়কর ঘটনা আর কারও জীবনে ঘটেছে? কাজেই, আমি যদি ভয় পেয়ে থাকি, আমার যদি হাসি না পায়, ভাবল এডওয়ার্ডস, কেউ কি আমাকে দোষ দিতে পারে?

কিসের একটা আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এডওয়ার্ডস। নিজের সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, এগিয়ে এসে তার পাশের সীটে বসল। 'নরক, তাই না?'

চেহারার অবস্থা কি এতই খারাপ?—ভাবল এডওয়ার্ডস। বলল, 'বরফে নামার আগেই ঠিক হয়ে যাব আমি।'

'বিশ্বাস করুন, আমার অবস্থা আপনার চেয়েও খারাপ এই দেখুন,' এডওয়ার্ডসের চোখের সামনে নিজের বাঁ হাতটা তুলে ধরল রানা। এডওয়ার্ডস দেখল, সেটা কাঁপছে। 'সব সময় এই রকম কাঁপে।'

'অ্যাকশনে যাবার আগেও?' জানতে চাইল এডওয়ার্ডস।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এবং অ্যাকশন শেষ হবার পরেও।'

'কিন্তু অ্যাকশনের মধ্যে নিশ্চয়ই নয়?'

হেসে উঠল রানা। তারপর বলল, 'সেই কথা বলার জন্যেই তো এলাম। এখনও কিছু শুরু হয়নি, তাই ভয় ভয় করছে। সবারই এই এক অবস্থা। কিন্তু একবার যখন অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে, দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। আপনার

মনে তখন ঢোকার কোন সুযোগই পাবে না ভয়।'

'কি ভেবে এতটা জোর দিয়ে বলছেন কথাটা?'

'আপনার সাদা মুখ দেখে। আপনি যদি ভয় পান আর আপনার মুখের চেহারা যদি ফ্যাকাসে হয়, অ্যাকশনের সময় আপনি রীতিমত সব দিক সামলে বুঝেশুনে চলতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি ভয় পান আর আপনার মুখের চেহারা যদি লাল হয়, অ্যাকশনের সময় আপনি অচল হয়ে পড়বেন। অনেকবার এর প্রমাণ পেয়েছি আমি। আপনার চেহারা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে...'

লজ্জায় এবার লাল হয়ে উঠল এডওয়ার্ডসের চেহারা।

হেসে উঠল রানা। 'দিলেন তো সব মাটি করে!'

তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এডওয়ার্ডস। 'উঁহুঁ, এ লাল সে লাল নয়, মি. রানা।'

এডওয়ার্ডসের পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'শাবাশ!' তারপর চাপা গলায় বলল, 'আসলে কি জানেন, আপনার সাথে কথা বলে নিজের ভয়টা ভুলে থাকার চেষ্টা করলাম। কৌশলটা কিন্তু কাজে লেগেছে। এখন তাহলে ঘুমোবার চেষ্টা চালানো যাক, কি বলেন? ওটা না হলে চলবে না।'

'এখন আমার ঘুম আসবে,' বলে চোখ বুজল এডওয়ার্ডস।

নিজের সীটে ফিরে এল রানা। কিন্তু লক্ষ রাখল এডওয়ার্ডসের ওপর। যখন বুঝল, ঘুমিয়ে পড়েছে সে, প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল ও নিজেও।

কেবিনে প্রেশার বাড়ার সাথে সাথে ভোঁ ভোঁ একটা অনুভূতি হলো কানে, ঘুম ভেঙে গেল রানার। হাত-পা ভারী লাগল ওর। আড়মোড়া ভাঙার ফাঁকে একে একে তাকাল সবার দিকে। সবাই নড়াচড়া করছে। জানালা দিয়ে তাকাতেই প্লেনের নিচে স্পিটসবার্জেন দ্বীপমালা দেখতে পেল রানা, ওগুলোর উত্তরে আর্কটিক আইসের কিনারা—সাদা একটা রেখার মত লাগল দেখতে। দক্ষিণে নতুন চাঁদের আলোয় রুপোর মত ঝলমল করছে সাগর।

স্পিটসবার্জেন এয়ারফিল্ডে প্লেন থেকে ওদের কাউকে নামতে হলো না। গরম খাবারের একটা কনটেইনার তুলে দিল কেউ একজন, সেই সাথে সবশেষ আবহাওয়া বার্তার একটা চিরকুট।

সেটা পড়ে বলল রানা, 'বদলায়নি। ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে—অন্তত এখন পর্যন্ত।' এরপর কনটেইনার খুলে সবার হাতে একটা করে গোল প্লেট ধরিয়ে দিল সে, তাতে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে বীফ স্টু। এরপর এল কড়া মিষ্টি দেয়া পুডিং। কেউ কথা না বললেও এডওয়ার্ডস বলল, 'দুঃখিত, আমার পেটে আর জায়গা নেই।'

'উঁহুঁ, খেতে হবে!' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

কথা বাড়াতে সাহস হলো না এডওয়ার্ডসের। আধ সের ওজনের মস্ত পুডিংটা অনেক কষ্টে ভেতরে চালান করল সে। কিন্তু এরপর সবার সাথে তাকেও এক কাপ ভর্তি ঘন তরল পদার্থ দেয়া হলো।

'কি এটা?'

'কোকো।'

কোকো বা চকোলেট ড্রিঙ্ক চিরকালই অপছন্দ করে এসেছে এডওয়ার্ডস। বলল, 'ধন্যবাদ। কিন্তু এসব আমার সয় না।'

'ওস্তাদের নির্দেশ খেতেই হবে,' বলল কংকর। 'নিতাইকে অর্ডার দেয়া হয়েছে...'

'হ্যাঁ,' ভাবী, গম্ভীর সুরে বলল নিতাই। 'যে খেতে চাইবে না তার মুখ হাঁ করে ঢেলে দেয়া হবে ভেতরে।'

'ওর সাথে কেউ ঠাট্টা কোরো না তো,' বকুনি দিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দিল রানা। তাকাল এডওয়ার্ডসের দিকে। 'জিনিসটাকে সীম্যান'স কোকো বলা হয়। খেয়েই দেখুন না। ঠাণ্ডার হাত থেকে অনেকটা বেঁচে যাবেন।'

ধমক দিলে নির্ঘাত সেটা অমান্য করত এডওয়ার্ডস। কিন্তু রানার বোঝাবার ভঙ্গি, অনুরোধের সুর লক্ষ করে কথাটা ফেলতে পারল না সে। ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে জিনিসটা খেয়ে ফেলল। কড়া মিঠে দেয়া সিরাপের মত লাগল খেতে।

তখুনি নয়, খানিক পর এর উপকারিতা টের পেল এডওয়ার্ডস। নিজেকে বিশাল একটা পাইথন সাপ বলে মনে হলো, যে এইমাত্র আস্ত একটা গরু খেয়ে ফেলেছে। কারবোহাইড্রেট আর প্রোটিনের তৈরি একটা কামানের গোলা পেটে ঢুকলে সবারই এই রকম অনুভূতি হবে।

স্পিটসবার্জেন থেকে প্লেন টেক অফ করতেই নিজের সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ড্রেস পরো সবাই।'

বাফেলোর গতি ঘণ্টায় তিনশো মাইলের কিছু কম, তার মানে তৈরি হবার জন্যে নব্বই মিনিটের কাছাকাছি সময় আছে ওদের হাতে। নব্বই মিনিট প্রচুর সময়, কিন্তু মিশনের স্টার্টিং পয়েন্ট যতই কাছে এগিয়ে আসছে ততই কিছু একটা করার জন্যে ছটফট করছে ওদের প্রত্যেকের মন। আর সবার মত ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি আন্ডারপ্যান্ট আর ভেস্ট, উলেন ট্রাউজার আর ফিল্ড জ্যাকেট পরে আছে রানা। এবার গ্রেনফেল ক্লথের উইন্ডপ্রুফ ট্রাউজার আর জ্যাকেট, বড় সাদা ফেল্ট বুট আর ফার হ্যাট, এবং সবশেষে পারকা পড়ল। এগুলো সবই আর্কটিক আবহাওয়ার উপযোগী করে তৈরি। ফেল্ট বুট মানে আর্কটিক এলাকায় মানুষের পায়ের নিরাপদ বীমা। ফেল্ট যতটা ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারে আর কিছু তার কাছাকাছিও পারে না, এই ধারণার ওপর বিশ্বাস রেখে সিকি ইঞ্চি পুরু ফেল্ট দিয়ে তৈরি করা হয় এই বুট। সোলটা ইঞ্চিখানেক পুরু, তলায় পাতলা রাবারের আবরণ। শুধু একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ওদেরকে, বুট যেন কোনমতেই ভিজে না যায়। তা গেলে ঠাণ্ডায় জমে যাবে ওগুলো, সেই সাথে কিছু জানার আগেই পা-ও জমাট বরফ হয়ে যাবে। কাজেই গুঁড়ো বরফে বুট ঢাকা পড়ে গেল কিনা সেদিকে নজর রাখতে হবে, এবং গরম কোথাও যাবার আগে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে গুঁড়ো বরফ। এর সাথে ওরা অবশ্য সীলসস্কিন ওভারবুটও সাথে নিয়েছে। ফার হ্যাটটা উলভারিনের চামড়া দিয়ে তৈরি, পারকা হুডের চারদিকের কিনারাটাও তাই। সব মিলিয়ে আর্কটিকের উপযোগী এর চেয়ে ভাল পোশাক আর কিছু হতে পারে না।

সবার আগে কাজটা শেষ করল কংকর। বসে না থেকে স্কি-ডুগুলো চেক

করল সে। রঙ বদলে এখন এগুলোকে সাদা করা হয়েছে, বরফের সাথে যাতে মিশে যেতে পারে। বরফের রাজ্যে এগুলো খুঁজে বেড়ানোর মানে হবে এক লক্ষ বর্গ মাইল জুড়ে ছড়ানো খড়ের গাদায় সূচ খুঁজে বের করার মত। দল থেকে একটা যদি হারিয়ে যায়, ভাবল রানা, সেটাকে খুঁজে বের করার আশা ছেড়ে দেয়াই বোধহয় ভাল হবে।

কাপড়চোপড় পরে নিজের মেডিকেল কিটটা চেক করল এডওয়ার্ডস। ড্রেসিং, স্প্লিন্ট, ব্যান্ডেজ, মরফিন, বেনজিড্রিন আর সব ধরনের ইনসুলিন নিয়েছে সে। সেই সাথে কিছু ট্যাবলেটও নিয়েছে, শুধু বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিক রোগীকে দেয়া চলে। তাছাড়া ইমার্জেন্সীতে দরকার লাগতে পারে মনে করে আরও অনেক কিছু ব্যাগের ভেতর ভরে নিয়েছে এডওয়ার্ডস, শুধু ধাত্রীবিদ্যা ফলাবার জন্যে যা লাগে সেগুলো বাদ দিয়েছে ও। মেরু ভালুক বা সীলদের কারও যদি সন্তান প্রসব সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দেয়ও, সমাধান তারা নিজেরাই করতে পারবে ডাক্তারদের ব্যাগ চিরকালই কালো হয়ে থাকে, কিন্তু ফাইবার গ্লাসের তৈরি এডওয়ার্ডসের ব্যাগটাকে কালো মনে হলেও আসলে ওটা গাঢ় সবুজ রঙের।

পরিচ্ছদে, স্কি-ভুতে কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেল কিনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, এই সময় সবাই অনুভব করল কেবিন ফ্লোরের ঢাল ভাবটা বদলে আরেক রকম হয়ে গেছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে বাফেলো।

ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল রানা। তিন হাজার ফিট নিচে বরফ। খুব বেশি দূরে দেখতে পেল না ও, কিন্তু যতদূর দেখা গেল সেই দিগন্তরেখা পর্যন্ত, শুধু বরফ আর বরফ। সমতল বিস্তারের কোথাও দেখা গেল উঁচু হয়ে আছে বরফ, কোথাও আবার নিচু রিজ, কোথাও ডেবে যাওয়া বরফের কোলে পানি জমে আছে। রানার জানা আছে, বরফের এই সমতল বিস্তৃতি আসলে নিষ্প্রাণ নয়। দু'দিকের চাপে মাঝখানের বরফ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মাইলের পর মাইল। অনেক সময় বহু নিচের কোন আলোড়নে ওপরের সমতল মেঝে ডেবে যায়, তৈরি হয় গভীর খাদ, তাতে জমাট বরফে পরিণত হবার জন্যে অপেক্ষা করে গাঢ় রঙের পানি।

সীট বেল্ট সাইনটা জ্বলে উঠল। বেল্ট বেঁধে নিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। এয়ারস্পীড কমে আসার সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। ল্যান্ড করার সময় কোন বিপদ ঘটল না, সাবলীল ভাবে বরফের ওপর নেমে ছুটে গেল বাফেলো। মনে মনে পাইলটের প্রশংসা করল রানা। ওর দেখাদেখি বাকি সবাইও খুলে ফেলল সীট বেল্ট।

শোঁ শোঁ একটা আওয়াজের সাথে আচমকা ঠাণ্ডার ছ্যাঁকা খেয়ে ঘাড় ফেরাল সবাই। টেইল সেকশনের একটা অংশ র‍্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে নামানো হয়েছে, সেই সাথে প্লেনের ভেতর ঢুকে পড়েছে আর্কটিক রাতি। জোরে শ্বাস টেনে দ্রুত বাতাস ছাড়তে গিয়ে আবিষ্কার করল এডওয়ার্ডস প্রতিবার আরও জোরে শ্বাস টানতে না পারলে হাঁপ ধরে যাচ্ছে তার। বুঝল, বেশি করে বাতাস টানার এই প্রবণতাটা রোধ করতে হবে। তা নাহলে সারাক্ষণ হাঁপাতে হবে

তাকে।

এরই মধ্যে প্রথম স্কি-ডুর ইঞ্জিন চালু করেছে কংকর। ভেতরে তাড়াতাড়ি ঢুকল রানা, কেবিন ফ্লোরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেটা, তারপর দ্রুত গড়িয়ে নেমে গেল ঢালু র‍্যাম্প ধরে।

প্রত্যেকটা ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে নেমে এল কংকর, ওরা প্রত্যেকে একটা করে ডু নিয়ে প্লেনের পেট থেকে বেরিয়ে এল বরফে। বেরিয়ে এসে থ্রটল খুলে দিল সবাই, যাতে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে ইঞ্জিন। নিজের ডু ছেড়ে এয়ারক্রাফটে ফিরে এল রানা, ওদের পজিশনটা শেষবারের মত চেক করার জন্যে। বেরিয়ে এসে প্রতিটি ডু-র সামনে থামল ও। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল সবাইকে। এডওয়ার্ডসের কাছে পৌঁছে হাত তুলে তাকে একটা তারা দেখাল ও, দক্ষিণ আকাশে জ্বলজ্বল করছে সেটা।

'ওই দিকে যাব আমরা,' ইঞ্জিন আর বাতাসের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা। ডু-র দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল ও।

নিজের ডুতে ফিরে এল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল বাফেলোর দিকে। র‍্যাম্পটা উঠে গেছে। দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ঘুরতে শুরু করল প্রপেলার। ককপিট থেকে ওকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল পাইলট। তারপরই এগোতে শুরু করল প্লেন। আগের চেয়ে অনেক হালকা ওটা, তাড়াতাড়ি তোলা গেল গতি। কয়েক মুহূর্ত পর লেজের দিকটা একটু নিচু হলো, শূন্যে উঠে পড়ল স্কিগুলো। রাতের আকাশ ভেদ করে ফিরে চলল বাফেলো।

নিজের চারদিকে তাকাল রানা। বাফেলো এখন খুদে একটা আলোর বিন্দুমাত্র। ছোট ছোট সাদা স্তূপের মত লাগছে ডুগুলোকে। এগজস্ট থেকে ধূসর রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

পোলার সী-তে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা একা।

তিন

উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে সামনের দৃশ্যটা ভাল-করে-না-ফোটা ফটোগ্রাফিক প্রিন্টের মত লাগল রানার। বিশাল সব সাদা এলাকার মাঝখানে কয়লার মত কালো ছায়া শিশু চাঁদ স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে, সেই আলো মাখা ছুটন্ত তুষারকণাগুলোকে আকাশের গায়ে রুপোলী জোনাকির মত দেখাচ্ছে।

সবার আগে থাকবে রানা। কারণ অভিযানের প্রতিটি গজ সম্পূর্ণ অচেনা বলে, আর যে গতিতে এগোবে ওরা সেটা নিরাপত্তার জন্যে বিরাট একটা হুমকি বলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এবং সেই সাথে চিন্তার ক্ষিপ্রতা থাকতে হবে প্রথম জনের। আচমকা থেমে দাঁড়ানোর ম্যাজিক জানে স্নোমোবাইলগুলো, এবং একটার সাথে আরেকটা ডু-র মাঝখানে দশ গজ ব্যবধান থাকায় সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হবে।

প্রতিটি ডুতে একটা করে হেডলাইট। জ্বলে উঠল রানারটা, পরমুহূর্তে নিভে

গিয়ে আবার জ্বলে উঠল। লাইন থেকে সামনে বাড়ল রানার ডু। তারপর লাইন ছেড়ে মুখ করল সেই তারাটার দিকে। প্রথমে ধীর গতিতে এগোল রানা।

একে একে পিছু নিল সবাই। রানার পিছনে হিরোমিচি নিতাই। তিন নম্বরে ড. এডওয়ার্ডস। চার নম্বরে কংকর। সবার পিছনে, পাশাপাশি থাকল মিলটন স্টেনার আর কারজো বুতেরা। ওদের দু'জনেরই আর সবার চেয়ে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, রানার পিছনে যারা রয়েছে তাদের পিছনে নেই ওরা। লাইনের দু'দিকে পাঁচ ফিট দূরে রয়েছে দু'জন, এগোচ্ছে অক্ষত বরফের ওপর দিয়ে। লাইনের শেষ মাথায় একজন থাকবে, সে যেই হোক, একথা ভাবা যায় না। পাশাপাশি থাকলে মিলটন আর বুতেরা পরস্পরের ওপর চোখ রাখতে পারবে। একজন যদি কোন বিপদে পড়ে, অন্তত আরেকজন সেটা জানতে পারবে।

অভিযান শুরু হবার পর কে কি ভাবছে এখন তাই নিয়ে জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলের অভাব নেই এডওয়ার্ডসের মনে। বিস্ময়ের ঘোরটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, সে-কথা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে সে। সেই পুরানো কিন্তু সুপ্ত উপলব্ধিটা আবার শিহরণ এনে দিল তার সারা শরীরে—ভেতরে ভেতরে আসলে চিরকালই ডানপিটে সে! নিজের সাথে তর্ক জুড়ে দিল—তাকে জোর করে পাঠানো হয়েছে এই অভিযানে, এ-কথা আসলে সত্যি নয়। সে যদি না আসতে চাইত, কার বাপের সাধ্যি ছিল পাঠায় তাকে? আর এই যে একটু একটু ভয় ভয় লাগছে, এটা আসলে কিছু না। দলের লীডার মাসুদ রানার কথাই ধরা যাক। নিশ্চয়ই এ-ধরনের অনেক অভিযানে সফল হবার অভিজ্ঞতা আছে তার, তা নাহলে এত থাকতে তাকেই বা কেন লীডার বানানো হবে? শুধু সফল অভিজ্ঞতাই নয়, মানুষটার সাহস, বুদ্ধি, যোগ্যতা ইত্যাদিও নিশ্চয়ই আর সবার চেয়ে বেশি। ট্রেনিঙের সময় সেটা প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হয়েছে মনে মনে। সেই দুর্ধর্ষ মাসুদ রানাও নিজে থেকে স্বীকার করেছে, বিপদ সঙ্কুল কোন মিশনে গেলে তারও ভয় ভয় করে। কাজেই ওর নিজের এই ভয়টা আসলে কিছু না অ্যাকশনের সময় আর সবার মত ঠিকই সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

নিতাইকে অনুসরণ করছে এডওয়ার্ডস। মাঝে মধ্যে দেখতে পাচ্ছে রানার ডু। লীডার সাহেবের এই মুহূর্তের অনুভূতি কি হতে পারে আন্দাজ করতে গিয়ে খানিক চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিল সে। গবেষণা শুরু করল জাপানের সবচেয়ে বিশালদেহী নিতাইকে নিয়ে। কে জানে, দৈত্যটা হয়তো রাশিয়ানদের যাকে সামনে পাবে তারই ঘাড় মটকাবার প্ল্যান আঁটছে মনে মনে, সেটা তাকে মানাবেও। ঠিক পিছনেই রয়েছে কংকর। রেসিং কার চ্যাম্পিয়ন, ইউরোপের সেরা ইঞ্জিন মেকানিক কি ভাবতে পারে কংকর? সত্যিই যদি সেসলভকে দখল করতে পারে ওরা ফেরার সময় নিশ্চয়ই রাশিয়ানদের সবগুলো গাড়ির ইঞ্জিন নষ্ট করে দিয়ে আসবে সে। লীডারের সাথে কোন না কোন সময়ে এই লোকটার কিছু গোলমাল বাধবে, সে-ব্যাপারে এডওয়ার্ডসের মনে কোন সন্দেহ নেই।। কিসের যেন পূর্বাভাস পাচ্ছে সে দু'জনের ব্যবহারে। এডওয়ার্ডসের কাছে কংকর একটা দুর্বোধ্য চরিত্র। এই মিশনে রানাই তাকে নির্বাচন করেছে অথচ কেন যে করেছে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখন। দু'জনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট আড়াআড়ির ভাব

রয়েছে। মিশনে যোগ দিতে যখন আপত্তি করেনি, তখন ধরে নিতে হয় অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় লোক সে। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে খুশি হওয়া উচিত তার। কিন্তু তার হাব-ভাব দেখে মনে হয় তাকে পেয়ে রানারই যেন কৃতার্থ হওয়া উচিত। এডওয়ার্ডসের মনে পড়ল, ফ্রেঞ্চ নাগরিক হলেও কংকরের জন্ম আসলে যুগোস্লাভিয়ায়। সেই সাথে মনে পড়ল, সেসলভ সোভিয়েত নাগরিক হলেও তাঁরও জন্মস্থান যুগোস্লাভিয়া। ভুরু কুঁচকে উঠল এডওয়ার্ডসের। কিন্তু এই রকম একটা কাকতালীয় ঘটনার ব্যাখ্যা খোঁজার ধৈর্য হলো না তার। মন থেকে সেসলভ আর কংকর দু'জনকেই বহিষ্কার করে ভাবতে শুরু করল স্টেনার আর বুতেরার কথা।

ছোট চারশো সিসি রোট্যাক্স টু-স্ট্রোক ইঞ্জিন চমৎকার কাজ করছে। ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়, কোথাও কোন গোলমাল নেই। তুষার আর বরফ তীরবেগে ছুটে চলেছে দু'দিকে। স্পীডোমিটারের দিকে তাকাল রানা। ঘণ্টায় বিশ মাইল। ডু-র পেরিয়ে আসা প্রতিটি ইঞ্চি যেন শরীর দিয়ে অনুভব করছে রানা। পথের সাথে খানিকটা পরিচয় ঘটল, সেই সাথে আত্মবিশ্বাসও বাড়ল, সেটা সংক্রামিত হলো লাইনের শেষ মাথা পর্যন্ত, তারপর ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে চলল রানা। ঠিক পিছনেই রয়েছে নিতাই, তাকে শুধু রানার ডু-র পিছনটা লক্ষ্য করে দস্তানা পরা হাত দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে রাখতে হয়েছে। থ্রটল বাটনের মাথায় বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিল সে, প্রেশার বেড়ে যাবার সাথে সাথে স্পীডও বেড়ে গেল। সামনের ডু-র কাছ থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল সে, ব্যবধানটা দ্রুত কমে আসতে শুরু করল।

ওদের নিচে বরফের সারফেস আশ্চর্য মসৃণ। ছোট ঢাল বা ডেবে যাওয়া বরফের গা দেখেও রানা দিক বদল করল না, ফলে এক-আধটু ঝাঁকি খেল ডুগুলো। ছোট গাড়ি নিয়ে গ্রাম্য মেঠো পথ ধরে যেতে হলে যে অসুবিধে হয় তারচেয়ে বেশি কিছু নয় এটা।

পাঁচ মাইল পেরিয়ে আসতেই কেবিনের ভেতরটা এমন গরম হয়ে উঠল যে শরীর ঘামতে শুরু করল রানার। হিটার কন্ট্রোলের নব নামিয়ে দিল ও, পার্কার সামনের চেনটাও টেনে নামিয়ে দিল। একেবারে খুলে ফেলতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তা করতে হলে স্কি-ডু থামাতে হবে। প্রতিটা সেকেন্ড মূল্যবান, তাই অপব্যয় হতে দিতে চায় না ও। তবে শরীরে ঘাম দেখা দেয়াটা খারাপ, বিশেষ করে পায়ে। ঘাম মানে তো পানিই, বুটের ফেল্টটাকে বিপজ্জনক ভাবে স্যাঁতসেঁতে করে ফেলতে পারে। ও চায় না স্কি-ডু থেকে বেরোবার দশ মিনিট পর আবিষ্কার করুক পা দুটো জমে বরফ হয়ে গেছে।

চল্লিশ মাইল পেরিয়ে আসার পর আলো ফুটতে শুরু করল আকাশে। প্রথম একটু একটু করে, তারপর দ্রুত। শুরু হতে যাচ্ছে ক্ষণস্থায়ী টোয়াইলাইট। স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল রানা। পিছনে যারা আছে তাদেরও সামনের স্কি-ডুকে অনুসরণ করা সহজ হয়ে উঠল।

হঠাৎ একটা পরিবর্তন লক্ষ করল রানা, বাতাসে তুষার কণা নেই। সেটা এডওয়ার্ডসও লক্ষ করল, হাত বাড়িয়ে ওয়াইপারের সুইচ অফ করে দিল সে। কিন্তু

রানা আর নিতাইয়ের স্কি-ডুর ছড়িয়ে দেয়া বরফ কুচি বাতাসের সাথে উড়ে এসে পড়তে লাগল উইন্ডস্ক্রীনে। আবার তাড়াতাড়ি ওয়াইপারের সুইচ অন করল সে। একটা শিক্ষা হয়ে গেল তার, আর কখনও ওটার সুইচ অফ করবে না সে। প্লেক্সিগ্লাসে তুষার কণা পড়লেই কেবিনের ভেতরের গরমে সাথে সাথে গলে যাচ্ছে সেটা, পরমুহূর্তে ঠাণ্ডা বাতাস সেগুলোকে বরফে পরিণত করছে। ওয়াইপারের ব্লেড যদি হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দেয়, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সামনের দৃশ্য মুছে যাবে চোখের সামনে থেকে, অন্ধের মত স্কি-ডু চালাতে হবে তাকে।

সদ্য ফোটা আলোটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাল রানা। ডু-র স্পীড বাড়িয়েই চলেছে ও। যতটুকু এগোতে পারছে ততটুকুই জমা পড়ছে লাভের খাতায়, এই রকম নির্ঝঞ্ঝাটে সামনের বাকি পথ পেরোতে পারলে চমৎকার হত। কিন্তু তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দেয়া বরফের স্তূপ বা উঁচু ঢাল স্কি-ডুর পক্ষে পেরোনো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সেগুলোকে পাশ কাটাবার জন্যে ঘুর পথ ধরতে হলো ওকে, সেগুলোকে পাশ কাটাবার জন্যে পিছনের ওরা সবাই একান্ত বাধ্য ছেলের মত অনুসরণ করল ওকে, তারপর আবার ধনুকের মত বাঁকা পথ ধরে ফিরে এল আদি সরল রেখায়। খানিক পর পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। কিন্তু ডু-র ছড়িয়ে দেয়া বরফ কুচিতে ঝাপসা হয়ে আছে পিছনটা, হিরোমিচি নিতাইকে আবছাভাবে কখনও দেখা গেল, কখনও আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকল সে।

ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার গতি। মসৃণ বরফের বিস্তৃতি সেই আগের মতই আছে। ওদের গতির সাথে তাল বজায় রেখে দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে দিগন্তরেখা। টোয়াইলাইটের আলো ফোটার পর থেকে অন্তত দিগন্তরেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সেই থেকে একই রকম আছে সেটা, কোনরকম পরিবর্তন নেই। অন্য কোন ল্যাটিচ্যুডের টোয়াইলাইটের চেয়ে আর্কটিকের টোয়াইলাইটের আলো অনেক বেশি উজ্জ্বল, সেই সাথে বরফে প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বলতা এত বেড়ে ওঠে যে অনায়াসে খবরের কাগজ পড়া যায়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে যাবে, তারপর আবার অন্ধকার। বিশ ঘন্টা বা তারও বেশি পথ চলতে হবে ওদের অন্ধকারে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে, সেই সাথে গতি হয়ে আসবে মন্থর।

রওনা হবার পর আড়াই ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, পিছনে ফেলে এসেছে দীর্ঘ প্রায় আশিটা মাইল। এই সময় দিগন্তরেখা একটু যেন বদলাতে শুরু করল। এতক্ষণ ছিল সরল, এখন আঁকাবাঁকা দেখাল। আরও কাছে চলে এসে বুঝল রানা, সামনের ওটা একটা বরফের দেয়াল। কবে কোন্ যুগে কে জানে অনেক, অনেক নিচে মস্ত একটা আলোড়ন জেগেছিল, তারই ফলশ্রুতিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এই চীনের প্রাচীর।

পাঁচিলের সামনে এসে প্রথমে ডান দিকে বাঁক নিল রানা, তারপর ঘুরে খানিক দূর এগোল বাঁ দিকে। পিছন থেকে ওদের কারও বুঝতে বাকি থাকল না, পাঁচিলের গায়ে সুড়ঙ্গ খুঁজছে লীডার।

কিন্তু সুড়ঙ্গ কেন, প্রাচীরের গায়ে কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর কিছুই দেখা গেল না। বিশাল প্রাচীরের নিচে ড থামাল রানা, বাকি সবাইও যে যার ডু নিয়ে

ঘিরে ধরল ওকে। প্রত্যেকে নিজের পারকা বেঁধে নিয়ে গগলস পরল চোখে, হুডের ড্র-স্ট্রিং টেনে এঁটে নিল, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল বরফে।

বাতাসের ধাক্কা খেয়ে বেসামাল হয়ে উঠল সবাই। গাড়ির ভেতরে থেকে টের পায়নি কিছু, কিন্তু বেরিয়ে আসতেই তীব্র ঠাণ্ডার ছ্যাঁকা লাগল। প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, তবু ঠাণ্ডা আর বাতাসের হামলায় অস্থির হয়ে পড়ল ওরা। প্যাক আইস থেকে বাতাসের সাথে উড়ে এসে বালির মত মিহি তুষার আক্রমণ চালাচ্ছে।

পা ফাঁক করে শক্তভাবে, বাতাসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ওরা। মুখ তুলে তাকাল প্রাচীরের মাথায়। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ফিট উঁচু, ওদের পায়ের কাছ থেকে প্রায় খাড়া ভাবে উঠে গেছে। খানিকটা ছুটে আসার জায়গা পেলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী পর্যন্ত যে-কোন ঢাল টপকে যেতে পারবে স্কি-ডু। কিন্তু এই পাঁচিল টপকাবার কথা ভাবাও যায় না। নিতাইয়ের দিকে একবার শুধু তাকাল রানা। আর কিছু বলতে হলো না।

বিশাল শরীর নিয়ে সাবধানে এগোল নিতাই। মোটা কাপড়চোপড় পরে থাকায় দেখতে তাকে চলমান একটা পাহাড়ের মতই লাগল। প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে বরফের দিকে তাকিয়ে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর বেয়ে উঠতে শুরু করল। তার জন্যে এটা হয়তো কোন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু নিচে থেকে ওদের সবার বুক ভয়ে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। টিকটিকি যেমন দেয়াল বেয়ে উঠে যায়, নিতাইও তেমনি তরতর করে পাঁচিলের মাথায় পৌঁছে গেল। সমতল মাথায় প্রথমে একটা পা ফেলল সে, তারপর দ্বিতীয় পা তুলল। এই সময় নিচে থেকে দেখল ওরা, প্রথম পা-টা পিছলে যাচ্ছে। গেলও। ছ্যাঁৎ করে উঠল সবার বুক। কিন্তু দ্বিতীয় পা সমতল মাথায় ফেলে শরীরের ভার সেটার ওপর চাপিয়ে দিয়ে পিছলে যাওয়া পা-টাকে আলগোছে তুলে নিল সে। নিচ থেকে মনে হলো ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেল নিতাই, কিন্তু তার সহজ শান্ত ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো ব্যাপারটা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তার। একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে সামনের দিকে এগোল সে। ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এক সময় শুধু হুড পরা মাথার পিছনটা দেখা গেল, তারপর পাঁচিলের মাথার আড়ালে হারিয়ে গেল সেটাও।

বিশ সেকেন্ড পরই আবার পাঁচিলের এদিকের কিনারায় দেখা গেল নিতাইকে। নিচে তাকিয়ে পারকার ভেতর মাথা নাড়ল সে। তারপর নামতে শুরু করল। উঠতে যতটুকু সময় লেগেছিল তার সিকি ভাগ সময়ও লাগল না নেমে আসতে।

'কি দেখলে?' জানতে চাইল রানা।

'পাঁচিলের ওদিকটাও এদিকের মত,' বলল নিতাই।

'ডানে বাঁয়ে?'

'দু'দিকেই দুই কি তিন মাইল দূরে মনে হলো পাঁচিল ডেবে গেছে,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল নিতাই 'চোখের ভুলও হতে পারে।'

নিজের ড্র-র দিকে চলে গেল রানা, ফিরে এল এক জোড়া ওয়াকি-টকি নিয়ে। 'ডাক্তার আর বুতেরা আমার সাথে এসো। নিতাই, স্টেনার আর কংকর, তোমরা ডান দিকে যাও। দুটো দলই পাঁচিলের কাছাকাছি থাকবে। দেখা যাক পেরোবার

কোন রাস্তা পাওয়া যায় কিনা।'

হ্যান্ডসেটটা নিল মিলটন স্টেনার। 'রেডিওর বদলে এটা কেন?'

'এর রেঞ্জ মাত্র বিশ মাইল। যথেষ্ট, কিন্তু খুব বেশি নয়।' হন হন করে এগিয়ে নিজের ডুতে উঠে পড়ল রানা। দরজা বন্ধ করেই নব ঘুরিয়ে চালু করল হিটার। ইঞ্জিনের আওয়াজটা কর্কশ, কিন্তু সেটাই যেন ওর কানে মধু বর্ষণ করছে। টু-স্ট্রোকের ছোট্ট সিলিন্ডার ব্লক আর গোটা কয়েক চঞ্চল পার্টস, এগুলোই ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে—ভাবতে কেমন যেন লাগে।

দ্রুত একটা ইউ টার্ন নিয়ে বাঁ দিক ধরে এগোল রানার ডু, বরফ প্রাচীরের গোড়া বরাবর। ঠিক পিছনেই থাকল ডাক্তার এডওয়ার্ডস, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল বুতেরা ঠিক মত আসছে কিনা। হাতে আর বড়জোর আধঘন্টার মত আছে টোয়াইলাইট, কিন্তু ডুগুলোকে ওদের যদি বয়ে নিয়ে যেতে হয় অন্ধকারে সেটা সম্ভব হবে না।

ইচ্ছে করেই স্পীড তুলল না রানা। বরফ পাঁচিলের কাছাকাছি এলাকায় ওত্ পেতে থাকতে পারে সব রকমের বিপদ। কোন ঝুঁকি না নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে স্পীড কমিয়ে রাখল ও। পাশে পাঁচিলটা এখনও সেই আগের মতই আছে, কোথাও পঁচিশ-ত্রিশ ফিট উঁচু, কোথাও পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ ফিট। গায়ে কোথাও কোন গর্ত, ফাঁক, ফাটল কিছুই নেই। দু'মাইল পর, তিন মাইল পর—কোন পরিবর্তন নেই। এমন কি পাঁচিল কোথাও নিচুও হয়নি যে ডুগুলোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

শ'দুয়েক গজ আরও এগোল রানা, তারপর ঘুরিয়ে নিল ডু। ফিরে চলল ওরা। এবার গতি বাড়িয়ে দিল রানা, যেহেতু পরখ করা বরফের ওপর দিয়ে ফিরছে। অন্তত সারফেস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রথম যেখানে থেমেছিল সবাই, জায়গাটা দশ মিনিট পর পেরিয়ে এল ওরা। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা গেল ডু-র বেল্টের দাগ, তারপর হারিয়ে গেছে। সেই দাগ ধরে ছুটল তিনজনের ডু। কিন্তু পাঁচিলটা সেই আগের মতই আছে। কোথাও পঁচিশ ফিট উঁচু, কোথাও চল্লিশ ফিট। এদিকে আলোও কমতে শুরু করেছে। খানিক পরই নেমে আসবে অন্ধকার।

মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল এডওয়ার্ডস। কিছু পেয়েছে কংকর? জানার কোন উপায় নেই। রানার কাছে ওয়াকি-টকি থাকলেই বা কি, ওকে তো আর থামার সিগন্যাল দেয়া যায় না। তবে খানিক পরই বোঝা গেল, কিছু একটা পেয়েছে ওরা। হয়তো পাঁচিলটা শেষ হয়ে গেছে, আশা করল এডওয়ার্ডস।

মিছে আশা। টোয়াইলাইটের শেষ আলোয় আবার এক হলো দুটো দল। ওদের পাশেই প্রাচীরের গায়ে একটা ফাঁক দেখা গেল, ফিট চল্লিশেক লম্বা হবে। সবাই এগোল সেদিকে। সামনে দেখা গেল ছড়ানো ছিটানো রয়েছে বরফের ছোট বড় চাঁই। ঢাল বেয়ে খানিকটা ওঠার পর দৃশ্যটা পরিষ্কার ধরা দিল সবার চোখে। এডওয়ার্ডস ছাড়া আর কারও চেহারায় কোনরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না। সবাই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। শুধু এডওয়ার্ডস তাকিয়ে আছে পাঁচিলের গায়ে ফাঁকটার দিকে।

ফাঁকের দু'দিকের দেয়াল প্রায় খাড়া ভাবে উঠে গেলেও একদিকের দেয়ালের গায়ে সরু একটা কার্নিস আছে। সতর্কতার সাথে এগোলে যে-কেউ দেয়াল ধরে

ওপারে যেতে পারবে। কিন্তু ডুগুলোকে পার করার উপায় কি হবে সেটা নিয়েই সমস্যা। ফাঁকের মাঝখানে, ছয়-সাত ফিট লম্বা একটা লেক, তাতে টলমল করছে পানি, কতটা গভীর ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফাঁকের দু'দিকের দেয়াল প্রাচীরের উল্টোদিকে পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে, মাঝখানটা এরই মধ্যে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিন্তু শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে ম্লান আলো।

আরও বিশ সেকেন্ড খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা লেকটা। তারপর ফিরল কংকরের দিকে। 'আরও সামনে গিয়ে দেখলে হত।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল কংকর। 'গিয়েছিলাম তো। কোথাও আর কোন ফাঁক নেই।'

'কতদূর গিয়েছিলে?'

'এক মাইলের কম নয়।' কাঁধ ঝাঁকাল কংকর। 'কিন্তু আর কোন ফাঁক খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করার কি মানে? ডুগুলোকে আমিই একটা একটা করে পার করিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

'কিন্তু আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না,' সতর্ক কণ্ঠে বলল রানা।

তাচ্ছিল্যের ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল কংকরের ঠোঁটে। 'আর কারও জন্যে হয়তো ঝুঁকি নেয়া হবে, কিন্তু আমি একজন রেসিং ড্রাইভার, রিমেমবার? এই সাত ফিট পানি টপকে যাওয়া আমার জন্যে পানির মতই সহজ।'

দু'সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল রানা, 'ঠিক আছে।'

কিন্তু রানার কথা শোনার জন্যে ওখানে তখন দাঁড়িয়ে নেই কংকর। নিজের ডু থেকে একটা শাবল নিয়ে ফিরে এল সে।

'গুড!' শাবল দেখেই কংকরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে রানা।

'হ্যাঁ,' একটা হামবড়া ভাব ফুটে উঠল কংকরের চেহারায়। 'বরফের চাঁইগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেই ডু নিয়ে ছুটে আসার জায়গা পেয়ে যাব। তারপর এক এক লং জাম্পে ওপারে নিয়ে যাব একটা করে ডু।' রানার সামনে দাঁড়াল সে। 'আপনি জানেন, ওস্তাদ, লন্ডনের একটা বাস একবার টাওয়ার ব্রিজে কি কাণ্ড করেছিল? পঞ্চাশজন আরোহী নিয়ে পাঁচ ফুটি একটা ফাঁক দিব্যি পেরিয়ে গিয়েছিল সে। ওপারে গিয়ে পড়ার সময় ব্যালেন্স না হারালে এটা কোন সমস্যাই নয়। ল্যান্ডিংটাই আসল কথা।'

'সেই সাথে টেক-অফটাও নিখুঁত হওয়া চাই,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'সেজন্যেই তো বরফের চাঁই ভাঙতে হবে। এসো তোমরা।' সবাইকে তাগাদা দিল কংকর। যে-যার ডু থেকে শাবল বের করে নিয়ে হাত লাগাল কাজে। রানাও পিছিয়ে থাকল না।

শুধু যে আলগা চাঁই ভাঙা, তা নয়; সেই সাথে এবড়োখেবড়ো উঁচু-নিচু হয়ে আছে বরফের সারফেস। গর্তের কিনারা পর্যন্ত কোনরকম সমতল করতে একঘণ্টার মত লেগে গেল ওদের। ক্রমশ উঠে যাওয়া র‍্যাম্পের মত একটা কিছু তৈরি হলো ঘেমে গেছে ওরা সবাই, এই মাত্র কাজটা শেষ করে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সরু সমতল পথটার দিকে। ঘামের বিন্দুগুলো বরফ হয়ে যাচ্ছে ভুরুতে।

নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কংকরের চেহারা, মুখের সামনে হাত

তুলে তালুতে থুথু ছিটাল সে। ব্যাপারটা লক্ষ করে এডওয়ার্ডস ভাবল, হাত দুটো কি কাঁপছে ওর?

নিজের ডুতে ফিরে এল কংকর। দড়াম করে বন্ধ করল দরজা। স্টার্ট দেয়াই ছিল, অন্ধকারে শ'দেড়েক গজ পিছিয়ে গেল সে। আবছাভাবে ডু-র শুধু আউটলাইনটা দেখতে পাচ্ছে রানা। পথের দু'পাশে ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু কারও চেহারাতেই তার কোন আঁচড় নেই। ছুটে আসছে কংকরের ডু।

নিশ্চয় থ্রটল পুরো খুলে দিয়েছে কংকর। মেশিনগানের মত ইঞ্জিনের একটানা আওয়াজ। দু'দিকে তুষারের নিচু ঢেউ তুলে তীর বেগে ছুটে আসছে ডু।

র‍্যাম্পে এসে উঠল। রানা আন্দাজ করল, ঘণ্টায় চল্লিশের মত স্পীড। ডানা মোড়া পাখির মত শূন্যে উঠে পড়ল সেটা। ফাঁকের ওপর আলোর একটা ঝলকের মত দেখাল সেটাকে। পানি ভর্তি লেকের ওপারের কিনারা পেরিয়ে গেল অনায়াসে, তারপর শূন্যেই একটু বেঁকে গেল, নিচু হয়ে পড়ল সামনের দিকটা। ওপারের মসৃণ বরফে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ল ডু। বোঝা গেল শূন্যে থাকতেই ভারসাম্য ঠিক করে নেয়ার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করেছে কংকর, এড়িয়েও গেছে দুর্ঘটনাটা, কিন্তু বরফে পড়েই প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে একদিকে কাত হয়ে পড়ল স্নোমোবাইল। দম আটকে গেছে এডওয়ার্ডসের, ডু-র উল্টে পড়াটা চাক্ষুষ করার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু তার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত করে সামলে নিল কংকর, মসৃণ বরফের এক ধারে দাঁড় করাল ডু।

হয় লেকের ওপারের কিনারা আগে থেকেই আলগা হয়ে ছিল, অথবা কংকরের ডু বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ায় ঝাঁকি খেয়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে সেটায় ফাটল দেখা দিয়েছে--কেউ লক্ষ না করলেও, কয়েক সেকেন্ড পর, কংকরের ডু উল্টে পড়া থেকে একটুর জন্যে বেঁচে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই, রানা দেখল, ডু-র পিছনে বরফের কিনারা ঝপাৎ করে ধসে পড়ল লেকের পানিতে। আর সবাই কংকরের ডু-র দিকে তাকিয়ে ছিল বলেই বোধহয়, ব্যাপারটা লক্ষ করল না। কিংবা লক্ষ করলেও এর তাৎপর্যটা সাথে সাথে বুঝল না। সাত ফিট লেকটা লম্বায় বেড়ে গিয়ে এগারো ফিটে দাঁড়াল।

ডু থেকে নেমে কিনারার দিকে এগিয়ে এল কংকর।

রানাও এদিকের কিনারায় পৌঁছল। বলল, 'ঝুঁকিটা বুঝতে পারছ, কংকর?'

কিনারা ধসে পড়েছে দেখে উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল কংকর। তারপর বলল, 'ও কিছু না। আরও দু'ফিট ধসলেও ডু নিয়ে আসতে পারব আমি।'

'হয়তো পারবে,' সমর্থনের সুরেই বলল রানা। 'কিন্তু ওপারে পৌঁছানো আর পৌঁছে নিরাপদে ডু দাঁড় করানো এক কথা নয় তুমি তো আরেকটু হলে নিজেরই ঘাড় ভাঙতে যাচ্ছিলে।'

অপমানে লাল হয়ে উঠল কংকরের চেহারা। 'আমার ওপর আস্থা রাখুন, ওস্তাদ!' রেগেমেগে বলল সে। 'শুধু লক্ষ রাখুন, রেজাল্টটা কি দাঁড়ায়, আমি পারি কিনা।'

'পারবে না তা বলিনি,' বলল রানা। 'আমার পরামর্শ, এসো, সবাই মিলে

আরেকটু খেটেখুটে এদিকের র‍্যাম্পটা উঁচু করে নিই। তোমার ডু যদি আরও খানিক ওপর থেকে লাফ দিতে পারে, বিপদের কোন ভয় থাকবে না।'

তাচ্ছিল্যের সাথে কাঁধ ঝাঁকাল কংকর। উত্তর না দিয়ে ফাঁকের একদিকের সরু কিনারা ধরে সাবধানে এগিয়ে আসতে শুরু করল সে। কার্নিসের মাঝপথ পর্যন্ত এগিয়ে গেল নিতাই, কংকরকে সাহায্য করার জন্যে। নিতাইয়ের হাত ধরে নিরাপদে ফাঁকের এপারে চলে এল সে। সরাসরি এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি লেগে রয়েছে। বলল, 'ওস্তাদ, আপনি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছেন। সামান্য একটা কাজ, আপনি যদি বলেন আমি পারব না, তাহলে আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগে।' মুখের হাসিটা একটু ম্লান হলো, কুঁচকে উঠল চোখ দুটো, যেন তোয়াক্কা না করে মুখের ওপর তিক্ত সত্য কথা বলতে যাচ্ছে, এই রকম একটা ভঙ্গি। 'কথায় বলে, যার কাজ তাকেই সাজে। ইউরোপের সেরা মটরিস্ট আমি, আর কেউ ভুলে গেলেও আমি সেটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না।'

'খুব ভাল কথা,' মুখে হাসি টেনে বলল রানা। 'তবু, মিশনের নিরাপত্তার কথা ভেবে আবারও বলছি, এসো, র‍্যাম্পটা আর একটু উঁচু করে নেয়া যাক।'

নিজের মুখের সামনে হাত ঝাপটা দিয়ে রানার কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল কংকর। 'আমি যে পারব, সেটা আপনাকে না দেখিয়ে আমার শান্তি নেই।' বলে ঘুরে দাঁড়াল কংকর, এগোল দ্বিতীয় ডু-র দিকে।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। তারপর ইঙ্গিতে কাছে ডাকল নিতাইকে। নিচু গলায় কি যেন বলল রানা। এডওয়ার্ডস মিলটন আর বুতেরাকে নিয়ে ফাঁকের একধারের সরু কার্নিসের দিকে এগোল নিতাই। কার্নিসের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সবার কোমরে দড়ি বাঁধল সে, তারপর পথ দেখিয়ে ফাঁকের দেয়াল ঘেঁষে দলটাকে নিয়ে এগোল সন্তর্পণে। এদিকে দ্বিতীয় ডুতে উঠে বসেছে কংকর। স্টার্ট দেয়াই ছিল, এখন সেটাকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে।

এক দৌড়ে কংকরের ডু-র পাশে চলে এল রানা। ওকে দেখে ডু দাঁড় করাল কংকর। চেহারায় রাগ রাগ ভাব, ভেবেছে রানা বোধহয় তাকে বাধা দিতে চাইছে।

'এক মিনিট দেরি করো,' বলল রানা। 'ওরা ওপারে পৌঁছুক আগে।'

'কেন?'

উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফিরে এল ফাঁকের কিনারার কাছে। ইতোমধ্যে আবার পিছাতে শুরু করেছে কংকর, তবে দেড়শো গজ পিছিয়ে নিতাইয়ের দলটা ওপারে না পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর ডু নিয়ে ছুটে আসতে শুরু করল ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা হাতে তৈরি র‍্যাম্পের দিকে।

ছুটে আসা ডু-র দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। ব্যাপারটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে কংকর, মাঝপথেই তার স্পীড বেড়ে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলে দাঁড়াল।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঠিকই ছিল ব্যাপারটা। র‍্যাম্পের কিনারা থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল ডু। লেকের ওপর আলোর একটা ঝলকের মত দেখাল সেটাকে। ফাঁকের এপার থেকে রানার মনে হলো, এগারো ফিট লেকটা পেরিয়ে যেতে পারবে কংকর। কিনারা থেকে লাফ দেবার পর ক্রমশ আরও ওপর দিকে উঠে

যাচ্ছিল ডু, তারপর মাঝপথে পৌছবার একটু আগেই নিচের দিকে নামতে শুরু করল। ওপারের কিনারা পেরোতে এখনও সাড়ে চার ফিটের মত বাকি আছে, এই সময় ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। ওর আনুমানিক হিসেবে যদি কোন ভুল না হয়, দুর্ঘটনায় পড়তে যাচ্ছে কংকর।

ডু-র নাকটা পেরিয়ে গেল ওপারের কিনারা। পেরোল মাঝখানটাও। তারপরই বরফের ওপর পড়ল ডু-র সামনের অংশ। কিন্তু পিছনটা কিনারা টপকাতে পারেনি।

বরফের শক্ত কিনারার সাথে সংঘর্ষ ঘটল, সেখানেই আটকে গেল ডু, উল্টেও পড়ল না, পিছিয়ে পানিতেও নামল না। ইঞ্জিনটা অবশ্য সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল। তারপরই ধাতব কি যেন ভেঙে যাবার আওয়াজ পেল ওরা। ট্রাক মেকানিজমের কিছু একটা নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে। হঠাৎ পিছন দিকে নামতে শুরু করল ডু।

হাতের তালু ঘেমে গেল রানার। ওপারের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা নিতাইয়ের দলটা হায় হায় করে উঠল একযোগে। স্লো মোশন সিনেমার মত লাগল দৃশ্যটা। অলস ভঙ্গিতে, একটু একটু করে, দু'এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে নিচের পানির দিকে নেমে যাচ্ছে কংকরের ডু। বুঝতে অসুবিধে হলো না, কংকরের ওজন পড়েছে ডু-র পিছন দিকে।

যে-কোন মুহূর্তে ভারসাম্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে যাবে ডু। অসহায়, আতঙ্কিত দল নিয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে নিতাই। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর মারা যাচ্ছে কংকর, বুঝতে কারও বাকি থাকল না।

কি যেন বলল রানা। কিন্তু ওর চিৎকার ওপারের কারও কানে ঢুকল বলে মনে হয় না। সবাই স্থির পাথরের মত তাকিয়ে আছে ডু-র দিকে। ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে সেটা।

সবার আগে নড়ে উঠল এডওয়ার্ডস। হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, শাবলটা এখনও তার হাতে। এক পা এগিয়ে মাথার ওপর তুলল শাবল, তারপর বাঁকা ডগাটা সজোরে নামিয়ে দিল ডু-র নাকে, ধাতব পাতের গায়ে। কর্কশ একটা শব্দ করে শাবলের বাঁকা মাথাটা ঢুকে গেল পাতের ভেতর। এই সময়, বোধহয় নাড়া খেয়েই, দ্রুত নামতে শুরু করল ডু। টান পড়ল শাবলে, কিন্তু এডওয়ার্ডস সেটা ছাড়ল না। শাবলের টানে ধসে পড়া এবড়োখেবড়ো কিনারা পর্যন্ত চলে এল সে, শাবলটাকে দু'হাত দিয়ে ধরে রেখেই আধ-বসা ভঙ্গিতে হাঁটু ভাঁজ করল। কিন্তু ডু-র ওজন এবং পতনের টান সহ্য করার শক্তি তার শরীরে নেই। কিনারা দিয়ে নেমে যেতে শুরু করল সে। হঠাৎ লোহার মত কি যেন পড়ল তার কাঁধে। আরেকটু হলে হাত থেকে ছুটেই যাচ্ছিল শাবলটা। পরমুহূর্তে শাবল ধরা ওর হাতের ওপর নিতাইয়ের হাত পড়ল। ধীরে ধীরে টান বাড়াল নিতাই। শাবল, শাবলের সাথে ডু, এবং এডওয়ার্ডস, এক চুল এক চুল করে পিছিয়ে আসতে শুরু করল। কিনারা থেকে সরে এল এডওয়ার্ডস, এবার নিতাইয়ের সাথে তার টানও যোগ হলো। কিন্তু তার বোধহয় কোন দরকার ছিল না, বিশালদেহী নিতাই একাই একশো।

দু'মিনিটের মধ্যে কিনারা থেকে উঠে এল ডু। সমতল, মসৃণ বরফের ওপর

থামানো হলো সেটাকে। কংকর নেমে আসবে, সেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ইতোমধ্যে রানাও সরু কার্নিস ধরে চলে এসেছে এপারে।

ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ করল এডওয়ার্ডস। ঝাঁকি খেল দরজা, কিন্তু খুলল না। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ভেতরে তাকাতে দেখা গেল হাতল ধরে টানাটানি করছে কংকর, কিন্তু ঘোরাতে পারছে না সেটা বাইরে থেকে হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল নিতাই, কি যেন ভেঙে যাবার আওয়াজ হলো, সেই সাথে খুলে গেল দরজা। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল কংকর।

'ব্যথা পেয়েছ?' জানতে চাইল রানা।

'মাথাটা ঠুকে গেছে, দু'এক জায়গায় ছড়ে গেছে চামড়া,' ম্লান গলায় বলল কংকর। 'আর কিছু না।' ঘাড় ফিরিয়ে তোবড়ানো ডু-র দিকে তাকাল সে। বাতাসের ধাক্কায় দুলছে দরজা। বনেটের গায়ে এখনও গেঁথে রয়েছে এডওয়ার্ডসের শাবলের মাথা। এগিয়ে গিয়ে শাবলটা খুলে ফেলল সে, তারপর ইঞ্জিন কাভারটা তুলল। চেহারায় রাগ আর কাঠিন্য।

দু'সেকেন্ড পর রানার দিকে ফিরল সে। 'গেছে। বরফের কিনারা লেগে মাঝখান থেকে ভেঙে গেছে কারবুরেটর।'

'স্পেয়ার নেই?'

'কারবুরেটর নেই।'

'তার মানে,' উদ্বেগের সুরে বলল রানা, 'একটা ডু কমল। মাত্র চার ভাগের এক ভাগ রাস্তা পেরিয়েছি।'

রানা থামতেই নিতাই বলল, 'আরেকটু হলে একজন মানুষকেও হারাতাম।'

'কাজটা করা উচিত হয়নি কংকরের,' কারজো বুতেরা স্পষ্ট গলায় বলল, 'রানা নিষেধ করেছিল। র‍্যাম্পটা উঁচু করে নিলে আর এই কাণ্ড ঘটত না।'

ঝট করে বুতেরার দিকে ফিরল কংকর। 'ফের সেই কথা? র‍্যাম্প উঁচু করলে ঘণ্টা হবে। আমি পারিনি, সেটা ঠিক। কিন্তু সেই সাথে এ-কথাও ঠিক, আমি যখন পারিনি তখন ডু নিয়ে এই লেক পেরোনো আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

'থাক, ঝগড়ার দরকার নেই,' বলল রানা। কংকরের দিকে ফিরল ও 'তুমি পারোনি, কিন্তু পারতে। সে যা...'

কিন্তু প্রসঙ্গটা রানাকে এড়িয়ে যেতে দিল না কংকর, চটে উঠে বলল, 'পারতাম মানে?'

কংকরের উত্তেজিত মুখের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল রানা, 'এখনও আমি বিশ্বাস করি, তুমি পারো। যদি র‍্যাম্পটা আরেকটু উঁচু করে নাও।'

'অসম্ভব!' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল কংকর। 'আমার অভিজ্ঞতা তা বলে না আপনার যখন নিজের ওপর এতই বিশ্বাস, কাজটা করে দেখান না?' কোন রকম ইতস্তত না করে পরিষ্কার চ্যালেঞ্জ করে বসল সে।

রাগ করল না রানা। কিন্তু কোন রকম দ্বিধা করতেও দেখা গেল না ওকে। শান্তভাবে ঘুরে দাঁড়াল ও। এডওয়ার্ডসকে পাশ কাটিয়ে থামল অচল ডু-র পিছনে। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল নিতাইকে, খোলা দরজা দিয়ে ডু-র ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরল নিতাই। পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে এক পাশে সরিয়ে

দিল রানা ডুটাকে। তারপর কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা কার্নিসের দিকে এগোল। সবাই ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল। অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এসেছে ওদের মাঝখানে।

কার্নিসের ওপর দিয়ে ওপারে ফিরে যাচ্ছে রানা। কারও বুঝতে বাকি থাকল না, কংকরের চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছে ও। সবার আগে বাধা দিল ওকে কংকরই। সে নিজে পারেনি, আর কেউ চেষ্টা করতে গেলে নির্ঘাত মারা পড়বে বুঝতে পেরে ভয়ে কেঁপে উঠল তার বুক।

'ওস্তাদ!' চিৎকার করে ডাকল সে। 'দাঁড়ান! শুনুন!'

সরু কার্নিসের ওপর শান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'বলো।'

'রাগের মাথায় বলেছি কথাটা, অন্যায় করেছি,...ডু নিয়ে এই লেক পেরোবার কোন দরকার নেই,' দ্রুত বলল কংকর। 'তারচেয়ে আমরা নতুন একটা পথ খুঁজে নেব। কোথাও না কোথাও শেষ হয়েছে পাঁচিলটা...'

'এখান দিয়েও ডুগুলোকে পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব,' বলল রানা। 'শুধু র‍্যাম্পটাকে একটু উঁচু করে নিতে হবে। আবার খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে যাব কেন?'

'কিন্তু প্রথমে আপনিই তো বলেছিলেন এখান দিয়ে পেরোতে গেলে ঝুঁকি নেয়া যাবে...'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু কার ঝুঁকি?' বলেই আবার ঘুরে দাঁড়াল রানা। এগোল কার্নিস ধরে।

রানার পিছন দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল ওরা সবাই। কেউই কথাটার অর্থ ধরতে পারেনি।

'ওস্তাদ! এক মিনিট!' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল কংকর। রানার পিছু পিছু বাকি সবাই কার্নিসের দিকে এগোতে শুরু করেছে। সবার আগে কংকর।

মাঝপথে আবার থামল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। 'কি?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না...'

'ঝুঁকির কথা বলেছিলাম তোমার কথা ভেবে,' বলল রানা।

তবু বুঝল না কংকর। 'আপনার কথা কেমন যেন হেঁয়ালির মত, আপনি... বলতে চাইছেন, আপনার জন্যে এটা কোন ঝুঁকি নয়?'

উত্তর না দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল রানা।

সবাই পেরিয়ে এল কার্নিসটা। নিতাইকে ইঙ্গিত করল রানা, সাথে সাথে শাবল হাতে নিয়ে কাজে লেগে গেল নিতাই। তার আর রানার দেখাদেখি এক কংকর ছাড়া সবাই যোগ দিল র‍্যাম্প উঁচু করার কাজে।

'ওস্তাদ!' দ্রুত এগিয়ে এসে রানার একটা হাত চেপে ধরল কংকর। তার ধারণা, জেদের মাথায় নিজের মরণ ডেকে আনতে যাচ্ছে রানা। 'বললাম তো অন্যায় করেছি। আপনি আমাকে মাফ করে দিন!'

সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। লক্ষ করল, সবাই যে যার হাতের কাজ থামিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'দেখো, এই মিশনের লীডার করে পাঠানো হয়েছে আমাকে। সবাই লীডারের কথা মত চলবে, সেটাই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু

অন্তত একজন আমার কথা অমান্য করেছে। নির্দেশ অমান্য একটা ছোঁয়াচে ব্যাপার, দেখাদেখি আর কেউ যদি অমান্য করে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু মিশনের স্বার্থে আমি সেটা হতে দিতে পারি না। আর কেউ যাতে আমার নির্দেশ বা পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে সাহস না পায় সেজন্যে সবাইকে দেখিয়ে দিতে চাই, আমি নাম-কা-ওয়াস্তে লীডার নই—চ্যালেঞ্জ ফেস করার যোগ্যতাও রাখি।'

'কিন্তু আপনি মারা পড়বেন!' অসহায় ভঙ্গিতে সবার দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল কংকর।

মৃদু হাসল রানা। এডওয়ার্ডস লক্ষ করল, কংকর ছাড়া বাকি সবার চেহারা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে থমথম করছে। কংকরকে নয়, ওরা সমর্থন করছে রানাকে। তাদের লীডার যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে চায়, তারাও দেখতে চায় সাফল্যের সাথে চ্যালেঞ্জ ফেস করার যোগ্যতা সত্যি সে রাখে কিনা। ট্রেনিঙের সময় লীডারের অনেক গুণের পরিচয় তারা পেয়েছে, কিন্তু ট্রেনিং আর কঠোর বাস্তবের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এখন যদি লীডারকে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করে তারা, তাকে এবং তার নেতৃত্বকেই অপমান করা হবে সেটা।

কংকরের কথার উত্তর না দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল রানা। আবার কাজ শুরু করল। কংকর ছাড়া বাকি সবাই অনুকরণ করল ওকে। এক পাশে দাঁড়িয়ে অস্থির ভাবে নিজের মাথার চুল টানাটানি করতে শুরু করল কংকর। বুঝতে পেরেছে, রানাকে বাধা দেয়া এখন আর কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

র‍্যাম্পটা উঁচু করে নিতে আধঘণ্টার বেশি সময় লেগে গেল । ডু-র হেডলাইট জ্বেলে কাজ সারল ওরা। কাজটা শেষ হতেই নিতাইকে নিয়ে ফাঁকের ওপারে চলে গেছে কংকর। দুর্ঘটনা যে নির্ঘাত ঘটবে, সে-ব্যাপারে শুধু কংকর নয়, কারও মনেই বিশেষ কোন সন্দেহ নেই। শুধু রানাকে নির্বিকার এবং শান্ত দেখাল।

ক্রমশ উঁচু হতে হতে আগের চেয়ে অন্তত দেড় ফিট ওপরে উঠে গেছে র‍্যাম্পের কিনারা। আগাগোড়া কংকরের ধরনটাই অনুকরণ করল রানা। প্রথমে দেড়শো গজ পিছিয়ে গেল সে। তারপর ডু নিয়ে ছুটল। র‍্যাম্পে উঠল ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল স্পীডে। কিনারা থেকে শূন্যে লাফ দিল সেটা। সবার সাথে লেকের ওপারে দাঁড়িয়ে কংকরও লক্ষ করছে ব্যাপারটা। দেখল, কিনারা থেকে ডু লাফ দেবার পর ওর বেলায় যা ঘটেছিল, রানার বেলায় তা ঘটল না। শূন্যে থাকতে, দু'বারই, কংকরের ডু মাঝপথে একটু বেঁকে গিয়েছিল। কিন্তু রানার বেলায় দেখা গেল, সোজা হয়ে আছে ডু, যেন শূন্যের ওপরই সরল একটা রাস্তা ধরে ছুটে এল সেটা। প্রথমে ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে শুরু করল ডু, তারপর নিচের দিকে নামতে শুরু করল। কিন্তু অধোগতিটা শুরু হলো লেকের মাঝখানে নয়, সেটা পেরিয়ে আসার পর। কিনারা থেকে কম করেও তিন ফিট দূরে বরফের ওপর নামল ডু, ঝাঁকি একটা খেল বটে, কিন্তু উল্টে পড়ার বা কাত হবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। পনেরো গজ এগিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা, সাথে সাথে দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা।

কেউ হাততালি দিল না বা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল না। তবে সবাই ছুটে এল রানার দিকে। কংকরের দিকে ইচ্ছে করেই তাকাল না রানা, সবাইকে উদ্দেশ্য

করে বলল, 'যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে আর নয়। তোমরা এপারেই থাকো, ডুগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাবে পথ থেকে। আমি একটা একটা করে পার করে নিয়ে আসি ওগুলো।' বলে আর দাঁড়াল না রানা।

সবাই নিঃশব্দে, কিন্তু শ্রদ্ধার চোখে তাকিয়ে থাকল রানার গমন পথের দিকে। কিন্তু কংকরের চেহারায় শ্রদ্ধা বা প্রশংসা নয়, নিখাদ বিস্ময় ফুটে রয়েছে ঘোরটা এখনও ভাঙেনি।

হঠাৎ ছুটল সে। কার্নিসের গোড়ার কাছে গিয়ে ধরে ফেলল রানাকে। 'ওস্তাদ! এ কিভাবে সম্ভব?'

'এখন তুমিও পারবে…

কিন্তু রানাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কংকর আবার বলল, 'আমি সে-কথা জানতে চাইনি!' রানার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল সে, 'আমি জানতে চাইছি, র‍্যাম্পটা কতটা উঁচু করে নিলে কি সম্ভব, তা আপনি জানলেন কিভাবে?'

খানিক ইতস্তত করতে দেখা গেল রানাকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আন্দাজ করে বলেছিলাম।' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে এগোতে চেষ্টা করল রানা।

'কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছেন আপনি,' দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল কংকর। 'আন্দাজ থেকে নয়, আপনি অভিজ্ঞতা থেকে, হিসেব করে বলেছেন কথাটা।' কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, তাকে থামিয়ে দিল কংকর, 'মাসুদ রানা…মরিস রেনার— দুটো নামের সাথে অদ্ভুত একটা মিল আছে।'

'মরিস রেনার?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার, তারপর মৃদু হাসল। 'কে সে?'

'ইউরোপের আকাশে ধূমকেতুর মত উদয় হয়েছিল সে,' অনেকটা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত দেখাল কংকরকে, 'দুনিয়ার সমস্ত রেসিং মটরিস্টকে হতভম্ব করে দিয়ে আবার ধূমকেতুর মতই গায়েব হয়ে গিয়েছিল। বেশ অনেক দিন আগের কথা, কিন্তু আজও মটরিস্টদের মুখে মুখে ফেরে মরিস রেনারের কথা। ট্যালেন্ট বললে অপমান করা হবে তাকে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রেসিং মটরিস্ট হবার যোগ্যতা ছিল তার। কিন্তু কি যে হলো, যেমন হঠাৎ এল, তেমনি রহস্যময় ভাবে হঠাৎ একদিন গায়েব হয়ে গেল।' থামল কংকর, খুঁটিয়ে দেখল রানাকে। 'মরিস রেনারের ফটো দেখেছিলাম একবার। আপনার সাথে অনেক মিল আছে। ওস্তাদ?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে। 'আপনিই কি সেই বিস্ময়? পর পর ছ'টা গ্র্যান্ড প্রি-তে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন—আপনিই?'*

অবাক হবার ভান করল রানা, 'দুত্তোরী! মরিস রেনারের নাম আমিও শুনেছি। কোথায় মরিস রেনার, আর কোথায় মাসুদ রানা, কার সাথে কার তুলনা করছ!' গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা 'আমি এই মিশনের লীডার, আর কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই, কংকর!' পরমুহূর্তে আশ্চর্য সুন্দর একটুকরো হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। একটা চোখ টিপে ঘুরে দাঁড়াল সে। দ্রুত পা বাড়াল।

---

* মাসুদ রানা-৪১, সতর্ক শয়তান দ্রষ্টব্য।

রানার গমন পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কংকর। চেহারায় এখন শুধু বিস্ময় নয়, সেই সাথে গভীর শ্রদ্ধার ভাবও ফুটে উঠেছে। মুখে রানা যাই বলুক, ওর পরিচয়টা উপলব্ধি করে নিতে অসুবিধে হয়নি কংকরের। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে থর থর করে কেঁপে উঠল শরীরটা। মরিস রেনারের সাথে তার পরিচয় আছে, এতদিন নিজেরই সেটা জানা ছিল না! ভাবতে গিয়ে গর্ব অনুভব করল সে। ইউরোপে ফিরে বন্ধু-বান্ধবদের জানাতে পারবে, গাড়ির যাদুকর সেই মরিস রেনারের সাথে তার দেখা হয়েছিল!

চার

এক এক করে বাকি তিনটে ডু এপারে নিয়ে এল রানা। একবারও বিপদের কোন সম্ভাবনা দেখা দিল না, পরপর তিনবারই প্রথম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল মাত্র। লোকসানের মধ্যে অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে, আর একটা ডু হারিয়েছে ওরা।

হন হন করে হেঁটে এসে রানার সামনে থামল কংকর। 'আপনার সাথে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ,' বলে নিজের ডু-র পিছনের সীটে উঠে বসল সে। রানার ডু সে-ই ভেঙেছে, কাজেই নিজেরটা রানার হাতে তুলে দিতে তার কোন আপত্তি বা ক্ষোভ নেই।

অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে টোয়াইলাইট, আবার মিট মিট শুরু করেছে একটা দুটো তারা। নিজের বাঁ দিকে সোজা তিন মাইল এগোল রানা, প্রাচীরের গা ঘেঁষে। তারপর নির্ধারিত কোর্সে পৌঁছে সেটা ধরে রওনা হলো। দশ ফিট পিছনে থেকে বাকি ডুগুলো অনুসরণ করল ওকে। প্রচুর সময় নষ্ট হলেও, প্রাচীরের সামনে পড়ার আগে পর্যন্ত সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে খুব ভাল এগোতে পেরেছিল ওরা, কাজেই তেমন উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। এই খানিক আগে চারটে বেজেছে। দ্রুত একটা হিসেব করল ও। পাঁচ কি ছয় ঘণ্টার মধ্যে একশো বিশ মাইল পেরোতে হবে ওদেরকে। সম্ভব।

এরপর আবার কয়েকটা পাঁচিলের সামনে পড়তে হলো। কিন্তু কোনটাই প্রথমটার মত চীনের প্রাচীর নয়। দুই আর তিন নম্বরটার ওপর দিয়ে দিব্যি এগিয়ে গেল ডুগুলো চার আর পাঁচ নম্বরের গায়ে ফাঁক থাকায় ভেতর দিয়ে এগোতে কোন অসুবিধে হলো না। কিন্তু এরপরই ওদের সামনে পড়ল—ঢাল, পাঁচিল, লেক বা ফাটল নয়, বড় বড় বরফের টাঁই। ওদের সামনে আড়াআড়ি ভাবে ছড়িয়ে আছে। সামনে শ খানেক গজ পর আবার মসৃণ সারফেস শুরু হয়েছে, কিন্তু ওদের দু'দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর ছড়িয়ে আছে ড্রাম আকারের বড় বড় বরফের টুকরো।

আগের সেই কৌশলটাই খাটাল ওরা। দলটাকে দু'ভাগ করে পাঠানো হলো দু'দিকে, কোথাও কোন ফাঁক আছে কিনা দেখে আসার জন্যে। নেই। অগত্যা একমাত্র বিকল্প উপায়টা কাজে লাগাতে হলো ওদেরকে। নির্দেশ দিল রানা, বরফের

চাইর ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে। সোজা যাওয়া সম্ভব নয়, এগোতে হবে আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করে, সেই সাথে প্রতিবার একটা করে ড্রুকে বয়ে আনতে হবে। প্রথমে রানার ড্রু। সবাই মিলে ধরাধরি করে তুলল সেটা, তারপর হোঁচট খেতে খেতে এগোল। অসম্ভব ভারী, ছয়জন মিলেও ড্রুটাকে উঁচু করে ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল ওরা। বরফে ওদের পা স্থির হতে পারছে না প্রতি মুহূর্তে কারও না কারও পা হড়কাচ্ছে। কখনও ডান দিকে কাত হয়ে পড়ল ড্রু, কখনও বাঁ দিকে। তিন ভাগের এক ভাগ দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই সময় পা পিছলে ধপাস করে বরফের ওপর বসে পড়ল এডওয়ার্ডস। পতনটা রোধ করার জন্যে আপনাআপনি ড্রু ধরে ঝুলে পড়ল সে। একই সময় আরও দু'একজনের পা পিছলে যাওয়ায় এডওয়ার্ডসের মাথার ওপর নেমে আসতে শুরু করল ড্রুটা। ওপর দিকে বিস্ফারিত চোখ তুলে ড্রু-র দিকে তাকিয়ে থাকল এডওয়ার্ডস। ওর মাথার ওপর ঝুলে আছে ড্রু, সেটাকে ধরে আছে এক কোণে বুতেরা আর পিছনে মিলটন। প্রাণপণ চেষ্টা করছে তারা, গোঙানির মত আওয়াজ বেরিয়ে আসছে তাদের নাক-মুখ দিয়ে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না কোন, একটু একটু করে নেমে আসছে ড্রু। খানিকটা ওজন নিজের হাতে নেবার জন্যে উন্মাদের মত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল এডওয়ার্ডস। কিন্তু ওই চেষ্টাই সার। চার হাত-পা সম্ভাব্য সব দিকে পিছলে যেতে শুরু করল তার। দুটো পিলারের মত দাঁড়িয়ে আছে এখনও মিলটন আর বুতেরা। কিন্তু সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে দ্রুত, থরথর করে কাঁপছে তাদের হাত-পা। যে-কোন মুহূর্তে আপনাআপনি হাত থেকে ছুটে যাবে ড্রু। দু'জনেই ঘামছে। ওদের কাঁপুনির সাথে কাঁপতে শুরু করল স্নোমোবাইলের ছাদটাও। প্রথমে নিজের পায়ে দাঁড়াল রানা, প্রায় একই সাথে নিতাই। ওদের দু'জনের সাহায্য পেয়ে হাঁফ ছাড়ল বুতেরা আর মিলটন। তারপর কংকরও উঠে দাঁড়াল, ড্রু-র খানিকটা ওজন তুলে নিল নিজের হাতে।

বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পেরে ধপাস করে আবার পড়ে গেল এডওয়ার্ডস, বরফের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকল ঝাড়া বাট সেকেন্ড। তারপর কাঁপতে শুরু করল শরীরটা। মানসিক ধাক্কাটা সামলে উঠতে আরও আধ মিনিট লাগল তার। তারপর যখন সংবিৎ ফিরে চোখ মেলল, দেখল, তার ওপর ড্রুটাকে ধরে আছে সবাই, কিন্তু কারও চেহারায় বিরক্তি বা অস্থিরতার কোন চিহ্নই নেই কৃতজ্ঞতায় মনটা ছেয়ে গেল তার। দেড় মিনিটের বেশি হয়ে গেল, শুধু ওর জন্যে ড্রু ধরে অপেক্ষা করছে ওরা পাঁচজন।

'আপনি বরং আমাদের পিছু পিছু আসুন,' মৃদু গলায় বলল কেউ।

কিন্তু তার কথায় কান দিল না এডওয়ার্ডস। ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়াল সে, সবার সাথে সে-ও ধরল ড্রু। আবার ওরা এগোতে শুরু করল। কিন্তু এবার আগের চেয়ে সাবধানে, একটু একটু করে

টুকরো বরফের এলাকা পেরিয়ে এসে নামানো হলো ড্রু। সাথে সাথে সেটার ভেতরে উঠে বসে স্টার্টারে থাবা চালাল কংকর। জ্যান্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন, সেই সাথে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। বাকি ড্রুগুলো বয়ে নিয়ে আসার সময়ও প্রত্যেকটার ইঞ্জিন বন্ধ করে রাখতে হলো, আর যদি স্টার্ট না নেয় এই ভয়ে অস্থির

হতে হলো প্রতিবার। ফ্রেঞ্চ-কানাডিয়ান কোম্পানী বম্বার্ডিয়ারস কুইবেকে তৈরি করেছে এই স্নোমোবাইল, তারা এমন একটা ইলেকট্রিক স্টার্টার লাগিয়ে দিয়েছে যেটা সাব-জিরো টেম্পারেচারেও কাজ করে। কিন্তু দুনিয়ার কোন স্টার্টারের হাতে নিজের জীবনের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে রাজি নয় রানা। অথচ এই মিশনে বেরিয়ে ঠিক তাই দিতে হয়েছে তাকে।

একে একে পার হতে শুরু করল ডুগুলো যাত্রীদের কাঁধে চড়ে।

আধঘন্টা পর আবার ওরা নিজেদের পথ ধরল। এবার কিন্তু মসৃণ সারফেস পেল না, ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে লাগল ডু। এগোবার গতিও আগের তুলনায় মন্থর। ঘণ্টায় বড়জোর বিশ পঁচিশ মাইল। প্রথম ধাক্কায় খুব ভাল এগোনো গিয়েছিল বলে সময়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়েনি বটে, কিন্তু এই ভাবে যদি ক্রমশ এগোবার গতি আরও কমে আসে, পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে ওদের।

ছয়টার দিকে নিতাই দেখল, সামনের ডু ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে আনছে। এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা, দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। প্রতিটি ডুর পাশে থামল ও, ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর গলা, 'খেয়ে নেয়া যাক।'

খিদে নেই, কিন্তু রানার কথাটাকে লীডারের নির্দেশ ধরে নিয়ে পিছনে হাত পাঠিয়ে খাবারের ইনসুলেটেড প্যাকেটটা কোলের ওপর নিয়ে এল এডওয়ার্ডস। গন্তব্য যতই এগিয়ে আসছে ততই ভয়-ভাবনা কাটিয়ে উঠছে সে। দলের আর সবার মত সচেতন ভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে কেউ বলে দেয়নি, অথচ জানে আরও আশি মাইল পেরোতে হবে ওদেরকে। তারপর সামনে পড়বে সেই পাহাড় প্রাচীর। পথে যদি কোন বিশেষ বিপদ দেখা না দেয়, ঠিক করা সময়ের সামান্য একটু আগে বা পরে পৌঁছতে পারবে ওরা। রাশিয়ানদের এক হাত দেখে নেবার কোন ইচ্ছে নেই তার, বরং সংঘর্ষ বাধলে সবার আগে নিরাপদ কোথাও গা ঢাকা দেবার কথা ভেবে রেখেছে সে। কিন্তু অসুস্থ বিজ্ঞানী সেসলভের শুশ্রূষা করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সেজন্যেই তার নিজের অসুস্থ হয়ে পড়া চলে না। শরীরের শক্তি অটুট থাকা চাই। তাই জোর করে বরাদ্দ খাবারটুকু খেয়ে ফেলল সে। পেট ভরে উঠতেই মনে একটা খুশির ছোঁয়া অনুভব করল। কেবিনটা বেশ গরম, মনে হলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোন গাড়িতে বসে আছে। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল সে। দূরে অন্ধকারের দেয়াল, তার সামনে থেকে সেই দেয়াল পর্যন্ত রূপোলী বরফের বিস্তৃতি। দেখতে কি সুন্দর, অথচ দুনিয়ার সবচেয়ে নির্জন আর বিপজ্জনক জায়গা এটা। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছাড়া এক মিনিটও বাঁচতে পারবে না মানুষ। খাওয়া শেষ করে প্যাকেটটা মাথার পিছনে রেখে দিল সে। অনুমতি পেলে আবার যাত্রা শুরু করতে পারে। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে তাকাল ডুগুলোর দিকে। স্টার্ট বন্ধ করা হয়নি, তাই একটু একটু কাঁপছে ওগুলো। নিজের ডু থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে নিতাই, এক নম্বরের গায়ে হেলান দিয়ে কথা বলছে রানার সাথে। এডওয়ার্ডসের দৃষ্টি আবার ফিরে গেল নিতাইয়ের ডু-র ওপর। আরে! ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। সর্বনাশ! দু'নম্বর ডুটা কাঁপছে না কেন!

দরজা খুলে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ডস। হন হন করে দু'নম্বর ডু-র পাশে এসে

দাঁড়াল। একেবারে চুপ মেরে আছে নিতাইয়ের স্নোমোবাইল। কতক্ষণ আগে বেরিয়েছে নিতাই কে জানে, কিন্তু সে নিশ্চয়ই স্টার্ট বন্ধ করেনি! তাহলে? বরফের ওপর দিয়ে ছুটল ও পিছন থেকে হাত রাখল নিতাইয়ের কাঁধে।

'তোমার ইঞ্জিন বন্ধ কেন?'

হতভম্ব চেহারা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নিতাই। 'স্টার্ট বন্ধ?'

'কংকর!' জরুরী তাগাদার সুরে ডাকল রানা।

সাথে সাথে ডু থেকে বেরিয়ে এল কংকর। কিছু বলতে হলো না, নিতাইয়ের পিছু পিছু ছুটল সে। স্টার্টার ঘুরিয়ে কোন কাজ হয় কিনা দেখল প্রথমে। খক্ খক্ করে কেশে উঠল ইঞ্জিন, কিন্তু স্টার্ট নিল না। ঝটকা দিয়ে ডু-র সামনের ঢাকনি তুলে ফেলল। লিড খুলে পরীক্ষা করল ইঞ্জিন।

'স্টার্টার ঘোরাও,' নির্দেশ দিল সে।

ডুতে উঠে বসে স্টার্টার ঘোরাল নিতাই। আপন মনে মাথা ঝাঁকাল কংকর, টুল বক্স খুলে বার স্প্যানারটা বের করে নিল। প্লাগ খুলে নতুন একটা প্লাগ ফিট করল। বলল, 'স্টার্টার!'

খক-খক-খক। একটু বিরতি। আবার খক-খক-খক। কল্পনার চোখে দেখতে পেল কংকর, নতুন প্লাগটাও তেল মেখে ভিজে যাচ্ছে। টু স্ট্রোকের এই একটাই অসুবিধে, ভাবল সে। পেট্রল-তেল যেভাবে মেশে তাতে প্লাগটা ভিজে যায়। কিন্তু এরপর আর কোন বিরতি না নিয়ে একটানা আওয়াজ ছাড়তে লাগল ইঞ্জিন। কিন্তু কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কংকর, স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে কারবুরেটর সেটিং অ্যাডজাস্ট করে ইঞ্জিনের শব্দ আরও একটু বাড়িয়ে দিল। দরজার সামনে এসে উঁকি দিয়ে তাকাল ভেতরে। 'ফুয়েলের কি অবস্থা?'

'বাইশ গ্যালন।'

'তাহলে আর কোন অসুবিধে হবে না।' স্ক্রু ড্রাইভার আর স্প্যানার রেখে দিয়ে ডুর সামনের ঢাকনি বন্ধ করল কংকর।

আবার শুরু হলো যাত্রা। খানিক পর বাতাসের গতিবেগ বেড়ে গেল, তুষার কণায় ঢাকা পড়ে গেল সামনের দৃশ্য। দিগন্ত-রেখার কোন চিহ্ন নেই, দুশো ফিট সামনে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপর নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে তারাগুলোকে। ওদের নির্দিষ্ট তারাটা এখনও নাক বরাবর সামনে রয়েছে। মোটামুটি সোজা পথ ধরেই এগোচ্ছে ওরা, কিন্তু জায়গা মত পৌঁছে হয়তো দেখা যাবে যে-কোন একদিকে একটু বেশি সরে গেছে ওরা। সি.আই.এ. বিল্ডিঙে দেখা স্যাটেলাইট রিকনিস্যান্স ফটোগ্রাফ থেকে তৈরি মডেলটা স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা।

নোভাইয়া জেমলাইয়ার প্রধান দ্বীপ দুটো আসলে উঁচু আর রুক্ষ নর্দার্ণ উরালসের বাড়তি অংশ। সমুদ্র ওদেরকে মেইনল্যান্ড সাইবেরিয়া থেকে আলাদা করলেও, ওদের জিয়োগ্রাফিক্যাল স্ট্রাকচারে কোন পার্থক্য নেই। রুক্ষ পাহাড়ী এলাকা, মাথার ওপর গ্লেসিয়ার। ছয়শো মাইল লম্বা, এবং বাঁকা চাঁদের মত আর্কটিক সাগরে বেরিয়ে এসে কারা সী-কে ব্যারেন্টস্ সী থেকে আলাদা করেছে। আর্কটিক রিসার্চ স্টেশনের নতুন বিল্ডিংটা নর্থ আইল্যান্ডে একটা উঁচু কেপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কেপটা বড়শির মত বাঁকা হয়ে আছে সাগরের ওপর। ওদের

মিশনের কোর্স কোনাকুনি একটা পথ ধরে পৌঁছবে নর্থ আইল্যান্ডে, শেষ ক'মাইল এগোবে কোস্টলাইন বরাবর।

পথে আর কোন বাধা পড়ল না। যতই কাছে এগিয়ে আসছে গন্তব্য স্থল, রানার মন জুড়ে বসছে রাশিয়ানরা। কিছুই ভাল করে জানা নেই ওর। কি ধরনের ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে তারা, মনিটরিং কি করা হয়েছে না হয়েছে, দ্বীপটা কিভাবে পাহারা দিয়ে রাখে তারা—জানে না, জানার কোন উপায়ও নেই। হাইড্রোজেন বোমা উন্নয়নের যুগে দ্বীপগুলো ছিল প্রধান পরীক্ষা ক্ষেত্র, গোটা এলাকায় তখন বিজ্ঞানী আর সামরিক বাহিনীর লোক গিজ গিজ করত। কিন্তু টেস্ট-ব্যান চুক্তির পর গোটা পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। নিশ্চয়ই এখনও জোরাল পাহারার ব্যবস্থা করে অহেতুক খরচ বাড়াবার পথে যায়নি তারা। রানা আশা করল, এখন শুধু আর্কটিক রিসার্চ স্টেশন হিসেবেই ওটাকে ব্যবহার করছে রাশিয়ানরা, কাজেই প্রয়োজনীয় কিছু লোকজন ছাড়া গোটা বিল্ডিংটা ফাঁকাই দেখতে পাবে ওরা। অবশ্য, ওরা আসছে এ-খবর তারা যদি না পেয়ে থাকে তবেই ভেতরে ঢুকে কাজ হাসিল করা সম্ভব। আগেভাগে খবর পেয়ে গিয়ে থাকলে এই মিশনের কথা বাইরের দুনিয়া যাতে কোন দিন জানতে না পারে তার ব্যবস্থা তারা অবশ্যই করবে। দুনিয়ার বুক থেকে মিশনটাকে যদি নিশ্চিহ্ন করে দেয় তারা, মার্কিনীদেরও কিছু বলার বা করার থাকবে না। কিল খেয়ে কিল হজম করতেই হবে ওদের। বুক ফাটলেও মুখ ফুটে তো আর বলতে পারবে না যে আমরা রাশিয়ানদের এলাকায় বিনা অনুমতিতে একদল লোক পাঠিয়েছিলাম!

আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল পেরোতে হবে ওদেরকে। তার মানে, বিপদ সীমার ভেতরে ঢুকে পড়েছে মিশন। ওদের ম্যাসিভ রাডার চেন বরফ সারফেসের দিকে তাক করা আছে বলে মনে হয় না, তাছাড়া ডুগুলো এতই ছোট যে তাক করা থাকলেও স্ক্রীনে হয়তো ধরা পড়বে না ওগুলো। কিন্তু আসল সমস্যা হলো সুপার-সেনজিটিভ সিসমোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট, কোন সন্দেহ নেই বরফের ওপর ওদের নড়াচড়ার কারণে যে ভাইব্রেশন হচ্ছে সেটা ওগুলোয় ধরা পড়ে যেতে বাধ্য। বরফ স্বচ্ছ বলে ভাইব্রেশন তৈরি করে সহজেই। কিন্তু আশার কথা হলো, ওদের চারপাশে বরফের নড়াচড়া, ভাঙচুর, পতন ইত্যাদির বিরাম নেই কোন—ফলে ভাইব্রেশনের একটা প্যাটার্ন তৈরি না হয়েই পারে না। নিস্তব্ধতার মাঝখানে ওরা আওয়াজ আর ভাইব্রেশন তৈরি করছে, ব্যাপারটা তা নয়। একটা উদাহরণ মনে পড়ল রানার। ছয়টা ড্রাম, পাঁচটা পেটানো হচ্ছে, খানিক পর বাকি একটাও হালকা ভাবে পেটানো শুরু হলো। শব্দটা ওখানে থাকবে, কিন্তু আলাদা ভাবে শুনতে পাবার আশা করা বৃথা। কিন্তু মানুষের কান সম্পর্কে কথাটা খাটলেও, সুপার-সেনজিটিভ যন্ত্রের বেলায়ও কি তা সত্যি? যন্ত্র কি আওয়াজটাকে আলাদা করতে পারবে? পারলেও, কোন অপারেটরের কানে কি সেটা ধরা পড়বে?

আরও কিছু দূর এগোল ওরা। সোভিয়েত এলাকা দ্রুত কাছে চলে আসছে। ওরা যে শুধু ঝড়ের বেগে পৌঁছবে তাই নয়, ওদের সাথে অস্ত্রও আছে—এই দলের পরিচয় সম্পর্কে কারও মনে কোন সন্দেহ দেখা দেবার কারণ নেই। গতি এবং প্রকৃতি দেখেই বোঝা যায় বৈধ বা আইনসঙ্গত কোন উদ্দেশ্য ওদের থাকতে পারে

না। রাডার, সিসমোগ্রাফ বা অন্য কিছুতে ওরা যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলেও হয়তো পথে কোথাও অ্যামবুশ পাতবে না রাশিয়ানরা। ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেবে তারা। তারপর ছেঁকে ধরবে। কে জানে, হয়তো অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে তারা। হয়তো এত কষ্ট স্বীকার করে যাচ্ছে ওরা শুধু ধরা দেবার জন্যেই।

তুষার ঝড় আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফ্যাকাসে বরফ তিন মাইল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এখন। নিচের দিকে আকাশে খানিক আগে চাঁদ উঠেছে। বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে রানা, কংকরের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখে নিচ্ছে আর সবাই ঠিক মত অনুসরণ করছে কিনা।

স্নোমোবাইলের সাথে পাল্লা দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তটা। কিন্তু মনে মনে জানে রানা, এই পিছিয়ে যাওয়া এক সময় শেষ হবে। বরফের শেষ মাথায় দেখা যাবে বাদামী অথবা কালো রঙ, সারফেস থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আকাশের দিকে। তখন পাহাড়ের আকার আকৃতি দেখে নিজেদের পজিশন শুধরে নিতে পারবে ওরা, খুঁজে নিতে পারবে পাহাড় চূড়ায় দাঁড়ানো বিল্ডিংটা। তারপর হানা দেবে।

আটটা ছত্রিশে আর্কটিক রাতের আকাশে ঝুলতে দেখা গেল নোভাইয়া জেমলাইয়াকে।

পাঁচ

ছোট একটা অর্ধ-বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে পড়ল সবগুলো ডু। ইঞ্জিন চালু থাকল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো ওদের। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসার সাথে সাথে বাতাসে তুষার কণার পরিমাণও দ্রুত কমতে শুরু করল। একটু একটু করে পরিস্ফুট হচ্ছে ভূমির বিশাল আকৃতি। এরপর আর এক সেকেন্ডও দেরি করল না এক নম্বর ডু, নাক ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল আবার। বাকি চারটে অনুসরণ করল সেটাকে। আধমাইল ফিরে আসার পর পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল ভূমি রেখা। ডু থামিয়ে নেমে পড়ল সবাই। কনকনে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে রানার কথা শুনল ওরা। মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে তাকাল। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, সবারই গা ছমছম করছে।

'পাহাড় সারির আকৃতি দেখে বুঝতে পেরেছি,' বলল রানা। 'যেখানে পৌঁছুবার কথা সেখান থেকে তিন মাইল উত্তরে রয়েছি আমরা। তবে হাতে সময় আছে। কি করতে হবে, শোনো...'

আবার ছুটল ডু। এবার কোনাকুনি ভাবে দক্ষিণ দিকে, এবং ধীর গতিতে। মাঝে মধ্যে থামতে হলো ওদেরকে, পজিশন বুঝে নেবার জন্যে ডু থেকে নামতে হলো রানাকে। প্রায় এক ঘন্টা পর এমন একটা জায়গায় থামল ওরা যেখান থেকে হেডল্যান্ড দেখতে পাওয়া যায়। যদিও ওখান থেকে বিল্ডিংটা দৃষ্টি গোচর হলো না।

এখানে থেমে কংকরকে কিছু নির্দেশ দিল রানা। সাথে সাথে কাজে হাত লাগাল কংকর। একটা করে ডু-র সামনে থেমে এগজস্ট পাইপের ওপর, চাকার উঁচু কানায় বিশেষ ধরনের সাইলেন্স কলার ঢুকিয়ে দিল সে। এতে করে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ গতি কমে যাবে ডু-র, ঘণ্টায় দশ মাইলের বেশি ছুটতে পারবে না, কিন্তু এগোবে রোলস-রয়েসের মত নিঃশব্দে। ভাব-ভঙ্গিতে কোন রকম ব্যস্ততা থাকল না, কিন্তু কাজটা অল্প সময়ের ভেতর সেরে ফেলল কংকর। আর কিছু বাকি নেই, কথাটা জানবার জন্যে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর এক নম্বর ডু-র পিছনের সীটে উঠে বসল।

ধীরে ধীরে নোভাইয়া জেমলাইয়ার দিকে এগোবার এই অভিজ্ঞতার স্মৃতি ডক্টর এডওয়ার্ডসের জীবনে কখনও ম্লান হবে না। আশ্চর্য নিস্তব্ধ একটা ঠাণ্ডা জগৎ, গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে স্নোমোবাইলগুলো। বরফের শেষ প্রান্তের গোড়া থেকে গভীর কালো আর ভীতিকর গা ছমছমে আকৃতি নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড দ্বীপ। তার মাথার ওপর পাহাড় চূড়া রাতের আকাশের গায়ে ঝুলছে। ওরা নড়ছে, বাতাস নড়ছে, কিন্তু আর কিছু না। যত কাছে চলে এল ওরা, ততই পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল ভূমি রেখা। তারপর দেখা গেল পাহাড়ের পা। বরফ থেকে খাড়া উঠে গেছে ওপর দিকে।

সবার আগে আবছাভাবে প্রথম দেখতে পেল রানা—সাথে সাথে কংক্রিট বলে চেনা গেল না, মনে হলো বরফের রঙ বদলে ওখানে ধূসর হয়ে আছে, কিন্তু আরও একটু সামনে এগোবার পর চেনা গেল পরিষ্কার। দোতলা বিল্ডিং, চৌকো বাক্সের মত দেখতে। পাহাড় চূড়ার ওপর কঠিন একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জমাট বাঁধা সমুদ্রের দিকে মুখ। শরীরের পেশী টান টান হয়ে উঠল রানার। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করল, এই বুঝি দপ্ করে জ্বলে উঠল চোখ ধাঁধানো সার্চলাইট। এই বুঝি কড়াৎ শব্দে গর্জে উঠল রাইফেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে এক দুই করে সেকেন্ড গুণতে শুরু করল ও, ভাবল, যে-কোন মুহূর্তে আতশ বাজির খেলা শুরু হয়ে যাবে। বুকের খাঁচার ভেতর তড়াক তড়াক করে এমনি লাফাতে থাকল হৃৎপিণ্ড, মনে হলো আধমাইল দূরেরটা তো বটেই, টোকিয়োর সিসমোগ্রাফও ভাইব্রেশনটা ধরে ফেলবে।

খোলা বরফের মাঠে নিজেদেরকে ন্যাংটা ন্যাংটা লাগল এডওয়ার্ডসের। সেই লজ্জাতেই যেন একটু একটু করে, ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে ওরা। সামনে ওটা যেন মস্ত একটা বাঘ ঘুমাচ্ছে, তার দিকে এগোচ্ছে ওরা একদল খুদে পিঁপড়ে। জানে, যে-কোন মুহূর্তে ঘুম থেকে জেগে উঠে হুঙ্কার ছাড়তে পারে বাঘ।

আগে যেমন এক রঙা আর নিরেট বলে মনে হচ্ছিল পাহাড়ের গা এখন আর তা মনে হলো না। গভীর কালো রঙের মাঝখানে কোথাও কোথাও ধূসর ভাব, হালকা কালো রেখা, চিড়, ফাটল, গর্ত ইত্যাদিও দেখা গেল। ওপরে চূড়ার প্রায় পুরোটা কিনারা জুড়ে শুরু হয়েছে বিল্ডিঙের উত্থান। রঙটা উজ্জ্বল নয়, ম্লান। আরও কাছে চলে এল ওরা। এবার শাটারগুলো দেখতে পাওয়া গেল। এখনও অনেকটা দূরে, তাই ওগুলোকে যুদ্ধ-জাহাজের গান-পোর্ট কাভারের মত দেখতে লাগল। কল্পনার চোখে দেখল রানা, ঝট ঝট উঠে যাচ্ছে শাটারগুলো, গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে

ভয়ালদর্শন কামানের লম্বা ব্যারেল।

নিশ্চল পাহাড়ের ওপর মস্ত বাড়িটা স্থির হয়ে থাকল। সবগুলো শাটারের ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে চলেছে ওরা, কিন্তু একটাকেও খুলতে দেখল না। আর সিকি মাইল যেতে হবে, আর তিনশো গজ, আর দুশো গজ। বাড়িটা থেকে কেউ যদি বাইরে তাকিয়ে থাকে, বা এখন তাকায়, ওদেরকে দেখতে না পাবার কোন কারণ নেই। দেখবে, সাদা বরফের ওপর ছোট ছোট সাদা পোকার মত এগোচ্ছে কি যেন। এগজস্ট থেকে বেরিয়ে আসছে মিহি বাষ্প, বিনকিউলারে তাও ধরা পড়বে। হঠাৎ আবিষ্কার করল রানা, হ্যান্ডেলবারটা এত জোরে চেপে ধরে আছে ও যে হাত আর কাঁধের পেশী ব্যথা করতে শুরু করেছে। মুঠো আলগা করল ও। সামনের পাহাড় চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাশিয়ানদের একটা স্লেভ ক্যাম্পের কথা মনে পড়ে গেল। নোভাইয়া জেমলাইয়ার পিছনে, সোভিয়েত মেইনল্যান্ডের ভয়কুটায় সাধ্যের অতীত কাজ করিয়ে নিয়ে, বরফের ওপর হাঁটিয়ে হাজার হাজার বন্দীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে। স্ট্যালিনের সেই রোমহর্ষক যুগ শেষ হয়েছে কবেই, কিন্তু দুনিয়া জুড়ে কোথাও নিষ্ঠুরতার বাড়াবাড়ি এতটুকু কমেনি।

বিল্ডিংটা এখন ওদের মাথার ওপরে উঠে এসেছে। পাহাড়ের যেদিকে আঘাত হানে বাতাস তার উল্টোদিকে যতই এগোল ওরা ততই দৃষ্টির বাইরে সরে যেতে শুরু করল ওটা। পাথুরে অবয়বের কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ডু দাঁড় করানো হলো। ক্ষণস্থায়ী আর্কটিক গ্রীষ্মে উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই পাহাড়ের গায়ে তুমুল আঘাত হানে, কিন্তু এখন ঠাণ্ডার শক্ত মুঠোয় আটকা পড়ে শান্ত হয়ে গেছে পানি, বরফে পরিণত হয়ে প্রায় সমতল এবং মসৃণভাবে ক্রমশ নেমে এসে ঠেকেছে গ্র্যানিট প্রাচীরের গোড়ায়, তার নিচে ওপর থেকে ওদেরকে দেখা যাবে বলে মনে হয় না।

দশটা বাজে। হানা দেবার সময়।

সমস্ত ইকুইপমেন্ট চেক করে নিল ওরা। আর সবার মত সীলস্কীনের তৈরি ওভারবুট খুলে ফেলল এডওয়ার্ডস। সাদা ফেল্ট বুটের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবল, সামনে যে পাহাড়ে চড়ার কাজ রয়েছে তা কি এটা পরে সম্ভব? একটু নার্ভাস ফিল করল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল সামনে একটা বাঁক, মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে নিতাই। এই সময় সবাইকে তাগাদা দিল রানা।

পাথুরে পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নিতাই। কঠিন শিলা ছুঁয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে তার দৃষ্টি। প্রতিটি ফাটলে জমা হয়ে আছে সাদা বরফ, লম্বা ফাটলগুলো অনেক উঁচু থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে নিচে। খানিক পর পরই কার্নিস দেখা গেল, কোনটা পেন্সিলের মত সরু, কোনটা পাঁচ-সাত ইঞ্চি চওড়া। চওড়া কার্নিসে বরফের স্তূপ দেখা গেল। নিতাইকে অনুসরণ করল এডওয়ার্ডস। আঁটসাঁট শক্ত লাগল হারনেসটা, কোমরে এঁটে বসেছে বেল্ট, নাইলন লাইনের লম্বা কয়েলের বাড়ি অনুভব করল নিতম্বে। তার পাশেই রানা, অ্যালুমিনিয়াম আর ক্যানভাসের তৈরি একটা প্যাকেট রয়েছে ওর পিঠে, তাতে ভাঁজ করা রয়েছে একটা স্ট্রেচার। বুতেরা আর মিলটনের কোমরেও রশি রয়েছে। প্রত্যেকের পিঠে ঝুলছে একটা করে কারবাইন, বেল্টে ঢোকানো রয়েছে একটা

করে পিস্তল।

ওদের পিছনে, লাইন বন্দী ডুগুলোর সামনে অনবরত পায়চারি করছে কংকর। ইঞ্জিনগুলোকে চালু রাখার দায়িত্ব দিয়ে এই একজনকেই নিচে রেখে যাচ্ছে ওরা। এগুলোই ওদের পালাবার একমাত্র উপকরণ। আর একটু পরই রাতের অন্ধকারে একা হয়ে যাবে কংকর। কিন্তু তার সাথে ইঞ্জিনের আওয়াজ থাকবে। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো যন্ত্রণাদায়ক মনে হবে তার, কিন্তু ডুগুলো ওকে সঙ্গ দেবে।

ক্লাইম্বিং বেল্টের সাথে জোড়া লাগানো রশি দিয়ে একটা লূপ তৈরি করে পাশে দাঁড়ানো রানার দিকে তাকাল হিরোমিচি নিতাই। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল পাথরের পাঁচ-ছয় ফিট ওপরে একটা গর্তে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিতাই। ওপরে উঠতে শুরু করার আগে সামনেটা ভাল করে দেখে নিল সে। এরিয়াল ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয়েছিল পাহাড়ের গা বেয়ে সহজেই উঠে যাওয়া যাবে, কিন্তু পাহাড়ের গা একেবারে খাড়া না হলেও নিতাই যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে খাড়া। ওঠা সম্ভব, কিন্তু পানির মত সহজ নয়। আসলে নিজেব কথা নয়, মিশনের আর সবার কথা ভেবেই একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল নিতাইকে। ধীরে ধীরে, সতর্কতার সাথে উঠে যেতে শুরু করল সে। কিন্তু তার মধ্যে সতর্কতা লক্ষ করে ঘাবড়ে গেল এডওয়ার্ডস। বারবার রানার দিকে তাকাল সে, ঘন ঘন ঢোক গিলল। নিতাইয়ের পিছু পিছু ওই পথ ধরে তাকেও উঠতে হবে। অন্তত ওঠার চেষ্টা করতে হবে।

কাঁধে একটা চাপড় খেয়ে সামনে বাড়ল এডওয়ার্ডস, হারনেসের সাথে বেঁধে নিল রশি, কিন্তু গিঁট দিতে গিয়ে কাঁপতে শুরু করল দশটা আঙুল। ব্যাপারটা লক্ষ করল রানা, কিন্তু সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। ঝুঁকি নেবার সময় হয়েছে, তাকে বুঝতে দেয়া দরকার, নিজের কাজ নিজেকেই সেরে নিতে হবে।

নিতাই যখন চল্লিশ ফিট উঠে গেছে, গিঁট বাঁধার কাজ শেষ করল এডওয়ার্ডস। ইঞ্চি পাঁচেক চওড়া একটা কার্নিসে দাঁড়িয়ে আছে নিতাই, প্রয়োজন হলে রশি টেনে ওপরে উঠতে সাহায্য করবে এডওয়ার্ডসকে।

সবার আগে নিতাই, পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারে এক্সপার্ট, সমস্ত বোঝা নিয়ে উঠে যাবে। তারপর অনভিজ্ঞ এডওয়ার্ডস। তার নিচে রানা। রানার নিচে আরেকজন এক্সপার্ট, মিলটন···যদিও জাপানী নিতাইয়ের মত অতটা ভাল নয় সে। সবশেষে বুতেরা। আর্কটিকেরই লোক, সব কাজেই ওস্তাদ।

মুখ তুলে নিতাইয়ের দিকে তাকাল এডওয়ার্ডস। নিজের কাঁধে একটা লূপ পরে নিয়ে রশিটা টান টান করল নিতাই, বেল্টে ঝাঁকি অনুভব করল এডওয়ার্ডস। বরফ থেকে পা তুলে পাথরে ফেলল সে। পা দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা গর্ত পেয়ে গেল সে। তারপর আরেকটা। শরীরের ভার চাপাবার আগে প্রতিটি গর্ত পরীক্ষা করে নিল সে। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে, সেই সাথে মনে রাখার চেষ্টা করছে রানার উপদেশ—হাঁটু আর কনুই ব্যবহার করা চলবে না, পাথর থেকে শরীর দূরে সরিয়ে রেখে হাতের তালু আর আঙুল ও পায়ের তলা আর আঙুল ব্যবহার করে উঠে যেতে হবে। শুনতে সহজ মনে হয়, আসলে তা নয়। যতটা সম্ভব পাথরের গা ঘেঁষে থাকার ঝোঁকটা দমন করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। ইচ্ছে হয়, শরীর

দিয়ে, দাঁত দিয়ে, যা কিছু আছে সব দিয়ে আঁকড়ে ধরে পাথর। যত ওপরে ওঠা যায় ততই প্রবল হয়ে ওঠে ঝোঁকটা কিন্তু রশিটা বিশ্বস্ততার সাথে টান টান হয়ে আছে সারাক্ষণ, নিতাই যে তাকে সাহায্য করছে সেটা অনুভব করতে পারছে সে। টেনে তুলছে না বটে, কিন্তু যখনই প্রয়োজন তখনই একটা আকর্ষণ অনুভব করতে পারছে এডওয়ার্ডস, বিশেষ করে ভারসাম্য হারিয়ে টলমল করার সময়। মন থেকে সমস্ত চিন্তা বের করে দিয়ে পা আর হাতের জন্যে গর্ত খোঁজার কাজে লেগে আছে সে। বিশ ফিট উঠে এল, নিজেরই বিশ্বাস হয় না। শক্ত একটা কার্নিসে দাঁড়িয়ে একটু দম নেবে, বাদ সাধল নিতাই। রশিতে পর পর দুটো টান অনুভব করল এডওয়ার্ডস, বুঝল, আবার শুরু করতে বলছে। আবার একাগ্র মনে উঠতে শুরু করল সে। এরপর থামল নিতাইয়ের দশ ফিট নিচের একটা চওড়া চাতালে। বোধহয় ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে দেখেই দয়া হলো নিতাইয়ের, বিশ্রাম নেবার সময় দিল একটু। এই সুযোগে ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকাল এডওয়ার্ডস। দেখল, এরই মধ্যে তার দিকে উঠে আসতে শুরু করেছে রানা। লূপটা নিজের কাঁধে পরে নিল এডওয়ার্ডস, পাহাড়ের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে টান টান করে রাখল রশিটা, যতক্ষণ না তার নিচের নিরাপদ কার্নিসে পা ফেলল রানা। এরপর আবার নিজের রশিতে টান অনুভব করল সে। নিতাই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আরেকবার নিচের দিকে তাকাল এডওয়ার্ডস। রানাকে ছাড়িয়ে নেমে গেল দৃষ্টি। দেখল, ওপর দিকে মুখ তুলে অপেক্ষা করছে মিলটন,তার রশিতে টান টান ভাব না থাকায় এখনও উঠতে শুরু করেনি। আরও নিচে নামল এডওয়ার্ডসের দৃষ্টি। বরফের ওপর এখনও পায়চারি করছে কংকর।

ঘাড় সোজা করে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে চোখ রাখল এডওয়ার্ডস। ধীরে ধীরে উঠে গেল দৃষ্টি। আচমকা ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। সামনে কোথাও দেখতে পায়নি নিতাইকে। পর মুহূর্তে রশিতে আরেকটা টান অনুভব করে বুঝল, ভয়ের কিছু নেই, সামনেই কোন একটা বোল্ডারের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে নিতাই। আবার শুরু হলো তার গর্ত খোঁজার পালা।

ওপরে কোথাও নিঃশব্দে এগোচ্ছে নিতাই, চওড়া একটা কার্নিসে দাঁড়িয়ে আছে এডওয়ার্ডস, তার নিচের একটা চাতাল লক্ষ্য করে উঠে আসছে রানা, রানার নিচে মিলটন আছে কোথাও, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না, সবশেষে বুতেরা উঠে আসছে মিলটনকে লক্ষ্য করে—ঠিক এই পরিস্থিতিতে ঘটনাটা ঘটল। কিভাবে ঘটল, বলতে পারবে না এডওয়ার্ডস। তাকিয়ে ছিল নিচের দিকে, মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল বুতেরাকে, তারপরই হঠাৎ দেখল আড়াল থেকে শূন্যে বেরিয়ে এল বুতেরা, হাত-পা এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে বাতাসে। বোধহয় কোন গর্তে পা রেখেছিল, মেঝেটা ধসে গেছে। চোখের সামনে অলস ভঙ্গিতে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাটা, কিছু করার কথা মাথায় এল না তার। বুঝল, ডানপিটে এডওয়ার্ডসের ভবলীলা সাঙ্গ হতে যাচ্ছে। মিলটন আর বুতেরার মাঝখানের রশিটাকে ঝটকা খেয়ে টান টান হয়ে যেতে দেখল সে। বুঝল, আর বড়জোর এক সেকেন্ড, তারপরই পাহাড়ের গা থেকে ছিটকে পড়বে মিলটনও। এরপর রানার পালা, ওদের দু'জনের ভার সহ্য করার মত শক্তি তার থাকলেও, ঝাঁকি সামলাবার মত জায়গায়

পা নেই। ওরা নিজেরা পড়ার সময় তাকেও টেনে নেবে। তারপর টান পড়বে ওর রশিতে, ওকেও ছিটকে পড়তে হবে পাহাড় থেকে। সম্ভবত এখনও কিছু টের পায়নি নিতাই। চারজনের ওজন সে-ও ধরে রাখতে পারবে না। তার মানে ওদের পাঁচজনের কারুরই কোন আশা নেই। এত কথা ভাবতে আধ সেকেন্ডও লাগল না এডওয়ার্ডসের। তারপর দেখল, হঠাৎ ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে সামনে পড়ল রানা।

মিলটন পড়ে যাচ্ছে দেখে সবার আগে এডওয়ার্ডসের কথা মনে পড়ল রানার। রশিতে হ্যাঁচকা টান পড়লে সেটা সামলে নেবার কৌশল বা শক্তি কোনটাই নেই তার, জানে ও। সবে মাত্র একটা বোল্ডারের ওপর উঠেছে, এই সময় ঘটতে শুরু করল ঘটনাটা। বোল্ডারের মাথার ওপরটা চিড় খেয়ে আছে, সেটা আগেই লক্ষ্য করেছিল ও। এখন দেখল, চিড়টা বেশ কয়েক ইঞ্চি চওড়া। বোল্ডারের ওপারে একবার যেতে পারলে, আর ওই চিড়ের ভেতর রশিটা পড়লে, বুতেরার রশির টানে মিলটন পাহাড় থেকে ছিটকে পড়লেও ওদের দু'জনের পতন রোধ করা যায়, সেই সাথে ওর নিজের, এডওয়ার্ডসের আর সম্ভবত নিতাইয়েরও প্রাণ রক্ষা পায়। ওর আর মিলটনের মাঝখানের রশিটা টান টান হয়ে ওঠার আগেই বোল্ডারের মাথার ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে ওপারে পড়ল রানা। মনে মনে প্রার্থনা করল, ওর আর এডওয়ার্ডসের মাঝখানে যেন যথেষ্ট ঢিল থাকে রশি, তা না হলে ঝাঁকি খেয়ে পড়ে যাবে ডাক্তার।

বোল্ডার টপকে শক্ত পাথরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল রানা। প্রচণ্ড এক টান পড়ল নাইলন লাইনে, অপর প্রান্তে দু'জন লোকের ভার ঝুলছে। মনে হলো, রশির চাপে কোমরের কাছে দু'টুকরো হয়ে যাবে শরীরটা। পাথরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে কয়েক ফিট নেমে বোল্ডারের গায়ে ধাক্কা খেল রানা, এই সময় আরেকটা তীব্র ঝাঁকি। চিড়ের ভেতরই পড়েছে রশিটা, শেষ ঝাঁকি খেয়ে বোল্ডারের মাঝামাঝি উঠে ঝুলতে থাকল ও।

রানা লাফ দিয়ে বোল্ডার টপকাতে শুরু করেছে, এই সময় বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল নিতাইয়ের শরীরে। এডওয়ার্ডসকে পাশ কাটিয়ে নেমে এল সে। রশির প্রচণ্ড চাপে, আর বোল্ডারের গায়ে মাথা ঠুকে যাওয়ায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হয়েছে রানার। শুধু অনুভব করল, কে যেন তুলে ধরল ওকে, বুকের ওপর থেকে প্রচণ্ড চাপটা হালকা হয়ে গেল, সেই সাথে ঢিল হয়ে গেল কোমরের বেল্ট। পাথরের ওপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয়া হলো ওকে। দু'হাতে মাথা ধরে গোঙাচ্ছে ও। ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসল নিতাই। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতেই উঠে বসার চেষ্টা করল রানা। ওকে আশ্বস্ত করল নিতাই, 'পাথরের ফাটলে রশিটা আটকে যাওয়ায় বেঁচে গেছে ওরা, মি. রানা।'

হামাগুড়ি দিয়ে বোল্ডারটাকে পাশ কাটাল রানা। নিচে চোখ পড়তেই দেখতে পেল মিলটন আর বুতেরাকে। দু'জনেই নতুন গর্তে পা রেখে মুখ তুলে আছে ওপর দিকে। রানার কাঁধের পিছন থেকে বলল নিতাই, 'আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটেছিল—বুতেরার টানে পাহাড় থেকে ছিটকে পড়েছিল মিলটন।'

বিশ ফিট নিচে মিলটন আর চল্লিশ ফিট নিচে বুতেরাকে অক্ষত বলেই মনে

হলো রানার। এরপর ওপর দিকে তাকাল ও। আগে যেখানে দেখেছিল সেখানেই বিমূঢ় চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এডওয়ার্ডস। তাকে ভরসা দেবার জন্যে একটু হাসল ও।

'কুইক!' তাগাদা দিল রানা।

সাথে সাথে আবার উঠতে শুরু করল নিতাই। এডওয়ার্ডসকে ছাড়িয়ে গেল সে। আবার আগের প্যাটার্নে ফিরে এল দলটা। রশি ধরে সেটা টান টান করল রানা, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল মিলটন। নিচে অপেক্ষা করছে বুতেরা মিলটন থামলেই উঠতে শুরু করবে সে।

বাতাসের হা-হুতাশ ছাড়া আর কোন শব্দ পেল না রানা। যত ওপরে উঠছে ওরা, তত বেশি ঠাণ্ডা লাগছে বাতাস। মিলটনকে ওঠার সুযোগ দিয়ে আবার যখন একটা কার্নিসে দাঁড়াবার সুযোগ পেল ও, নিচে তাকিয়ে দেখল, আগের মতই নিয়মিত ভাবে ডুগুলোর সামনে পায়চারি করে যাচ্ছে কংকর। মাঝে মধ্যে থামছে সে, ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে।

পালা করে উঠতে হচ্ছে বলে সময় লাগছে অনেক বেশি। দুর্ঘটনার পর একবারও ওপর বা নিচের দিকে তাকায়নি এডওয়ার্ডস। হঠাৎ নাকের সামনে নিতাইয়ের বুট দেখতে পেয়ে একটু অবাকই হলো। কিন্তু থামল না। এরপর নিতাইয়ের উরু দেখতে পেল। একটা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরল নিতাই, টেনে তুলে নিল নিজের পাশে একটা চওড়া চাতালের ওপর। পাহাড়ের মাথা আর মাত্র কয়েক ফিট ওপরে। নিতাইয়ের সাথে রশি ধরে বাকি সবাইকে টেনে তুলল সে।

এরপর আবার এগোল নিতাই। কিন্তু এবার কেউ তাকে অনুসরণ করল না। এক ইঞ্চি, দু'ইঞ্চি করে উঠে গেল নিতাই, কিনারার ঠিক নিচে থামল তার মাথা। এরপর এক চুল এক চুল করে তুলতে শুরু করল মাথাটা। কিনারা ছাড়িয়ে গেল চোখ জোড়া। ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে ডানে বাঁয়ে তাকাল। দেখছে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় কিনা। কয়েক মুহূর্ত পর ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকাল সে, ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলল। ধীরে ধীরে, যাতে কোন শব্দ না হয়, নিতাইয়ের পাশে উঠে দাঁড়াল রানা। এরপর রানাকে অনুসরণ করল মিলটন। তারপর এডওয়ার্ডস। সবশেষে বুতেরা।

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিল্ডিংটা।

ছয়

কিনারা থেকে ফিট দশেক দূরে শক্ত পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিল্ডিংটা। চল্লিশ গজ লম্বা দেয়ালে গভীর কালো ছায়ার মত দেখাল জানালাগুলো, এখনও শাটার ফেলা রয়েছে। রানা অনুমান করল, সারা বছরের মধ্যে ওগুলো বোধহয় শুধু ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মে দু'একবার খোলা হয়। বিল্ডিঙের ডান প্রান্তে জমির ওপর ফুলে আছে শক্ত পাথরের স্তর, সেটার পিছন থেকে ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে

পাহাড়। অপর প্রান্তটা ওদের কাছাকাছি, সেদিকে গম্ভীর কালো একটা গোলাকার থামের মত আকৃতি দেখা গেল, উঠে গেছে ওপর দিকে—তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রানা বুঝল, ওপর তলায় ওঠার জন্যে ওটা একটা লোহার সিঁড়ি।

পাঁচ জোড়া চোখ খুঁটিয়ে দেখল বিল্ডিং আর আশপাশটা, কোথাও কেউ নেই। ভৌতিক পরিবেশ। দুনিয়ার সবচেয়ে নির্জন জায়গা বলে মনে হলো এটাকে।

এখনও হাঁপাচ্ছে ওরা, কিনারার ওপর মাথা তুলে ঝুলে আছে পাহাড়ের গায়ের সাথে। মিনিট খানেক কেটে গেল, কিন্তু এমন কিছু চোখে পড়ল না যা দেখে প্রহরার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আভাস পাওয়া যায়। বরফ সারফেসের অনেক ওপরে বাতাসের তেজ এখানে বেশি, সেটাই শুধু আর্কটিক নিস্তব্ধতা ভাঙছে।

পাথরের সাথে কি যেন ঘষা খেল, আওয়াজটা কানে যেতেই ঝট করে ঘাড় ফেরাল ডাক্তার। দেখল, কিনারা দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে রানা। একমুহূর্ত পর মসৃণ বরফের ওপর মাথা উঁচু করে শুয়ে থাকতে দেখা গেল রানাকে। একজন একজন করে উঠতে শুরু করল বাকি সবাই। রানার পর মিলটন, তারপর ডাক্তার, বুতেরা, সবশেষে নিতাই। রানার দেখাদেখি বেল্ট থেকে যে যার পিস্তল বের করে হাতে নিল।

আরও একটা মিনিট পেরিয়ে গেল। সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে বরফের ওপর দিয়ে ক্রল করে ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল রানা। পিছনে ওরা যারা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের চেহারা উদ্বেগে উত্তেজনায় বদলে গেছে। চোখের চারপাশ কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সবাই দলনেতার দিকে। কেউ কাউকে বলে দেয়নি, কিন্তু জানতে কারও বাকি নেই, নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিচ্ছে রানা। কেউ জানে না কি আছে বরফের নিচে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাশিয়ানরা তার বিছিয়ে রাখতে পারে, ছুঁলেই বিল্ডিঙের ভেতর অ্যালার্ম বেল ঝন ঝন করে উঠবে। বরফের ঠিক নিচেই পুঁতে রাখতে পারে মাইন। একটু চাপ পড়লেই বুম! দলনেতার হাড়-মাংস কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। হঠাৎ করেই ওরা সবাই ভয়ঙ্কর একটা সত্য উপলব্ধি করল—তারা আসলে রাশিয়ার ভেতর রয়েছে। রাশিয়া, আলাদা একটা জগৎ। যার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না তারা।

দেয়ালের সামনে পৌঁছল রানা, একটু থামল, তারপর ক্রল করে বিল্ডিঙের শেষ মাথার শেলটারের নিচে স্থির হলো। কোণ থেকে সাবধানে উঁকি দিল ও। পিছন ফিরে ওদের দিকে না তাকিয়েই মাথার ওপর একটা হাত তুলে সিগন্যাল দিল দ্রুত। বরফের ওপর দিয়ে ক্রল করে ওর দিকে এগোল সবাই।

ওরা পৌঁছতে ফিসফিস করে বলল রানা, 'পিছনের পাহাড়ে একটা রেডিও অ্যান্টেনা রয়েছে।' বুতেরার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল ও।

সবাইকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল বুতেরা। বিল্ডিঙের কোণ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। বুতেরার ওপর চোখ রেখে অপেক্ষা করছে সবাই। খোদার গজব পড়া এই জায়গায় রেডিওই যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম সে তো জানা কথা, আর বেশির ভাগ সময় চ্যানেলটাও যে খোলা থাকবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতিতে চ্যানেল বিচ্ছিন্ন করতে যাওয়া সাংঘাতিক ঝুঁকির ব্যাপার,

কিন্তু তারচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হবে ওটাকে যদি খোলা থাকতে দেয়া হয়।

এক, দুই করে পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। ওদের মনে হলো, কঠিন হাড়গুলো কুরে কুরে খাচ্ছে ঠাণ্ডা। এরই মধ্যে প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে হাত-পা। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল ওরা, ছোট একটা সচল বৃত্ত তৈরি হলো। এর একটু পরই ফিরে এল বুতেরা। সাদা বরফের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে, ভোজবাজির মত ওদের মাঝখানে উদয় হলো সে। 'তার কেটে দিয়ে এসেছি। এদিকে আর কোন রেডিও বা র‍্যাডার ইনস্টলেশন নেই।'

'পাহাড়ের ওপর কোথাও আরও একটা এরিয়াল থাকতে পারে,' বলল রানা।

ফিসফিস করে বলল বুতেরা, 'বরফের নিচে তার খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।'

'কি দেখলে ওদিকে?'

'সিঁড়িটা শেষ হয়েছে একটা কাঠের দরজার সামনে। ধাপগুলো লোহার। বিল্ডিঙের পেছনে একগাদা রাবিশ জমা হয়ে আছে, খানিকটা ফাঁকা জায়গাও দেখলাম—পার্কিং স্পেস বলে মনে হলো। কিন্তু চাকা, বেল্ট, চেন বা পথের কোন চিহ্ন নেই।'

'ওটা বোধহয় স্টেশন তৈরির শুরু থেকেই আছে ওখানে,' বলল রানা। 'ভাল করে দেখেছ, ভেতরে ঢোকার আর কোন পথ নেই?'

মাথা নাড়ল বুতেরা। 'দেখলাম তো। না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ও কি ভাবছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও, কারণ ওরা সবাই ওই এক কথাই ভাবছে—ইস্পাতের ধাপের মাথায় ওই দরজাটাই ভেতরে ঢোকার একমাত্র পথ। এই পর্যন্ত চিন্তা করে থেমে গেল সবাই, কিন্তু রানার চিন্তা আরও খানিক দূর এগোল। —এখন পর্যন্ত ভাগ্য ওদের সাথে ভালই ব্যবহার করছে। কাউকে কিছু টের পেতে না দিয়ে পৌঁছে গেছে ওরা। এক রানার ড্রু ছাড়া হারাতে হয়নি কিছু। কিন্তু এখন সিঁড়িতে টুক করে একটু আওয়াজ হলেই ভেতর থেকে ওরা শুনতে পাবে। দরজার ওপারে কি আছে, কোনদিকে গেছে এরপরের পথ, ভেতর থেকে তালা দেয়া আছে কিনা কিছুই জানা নেই। শব্দ শুনে রাশানরা যদি অস্ত্র হাতে নিয়ে ভেতরে অপেক্ষা করে থাকে, এই পরিস্থিতিতে যদি গান-ফাইট শুরু হয়, সরু সিঁড়িতে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে তাদের বেঁচে থাকার আশা খুব কম। প্রস্তুতি আর ইকুইপমেন্ট তাদের সাধ্যমত এত দূর পৌঁছে দিয়েছে ওদেরকে। এখন টিকে থাকতে হবে পাঁচজনের সাহস, বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা আর ভাগ্যের জোরে।

বাঁক ঘুরে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে এগোল ওরা। বন্ধ জানালার শাটারগুলো একটু কাঁপল না। সিঁড়ির মাথার ওপর দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল না। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে এগোল ওরা, খুঁটিনাটি অনেক কিছু ধরা পড়ল চোখে। ষোলোটা লোহার দাঁড়। প্রত্যেকটায় বরফের পলেস্তারা। রেলিং নেই। দাঁড় বা সরু ধাপ যাই বলা যাক, পিচ্ছিল হয়ে আছে। সিঁড়ির শেষ মাথায় একটা রেলিং-ঘেরা প্ল্যাটফর্ম, খুব বেশি হলে গায়ে গা ঠেকিয়ে কোন রকমে তিনজন লোক দাঁড়াতে পারবে; কিন্তু দরজাটা যদি বাইরের দিকে খোলে, তাহলে তাও সম্ভব নয়।

বাঁ হাতে পিস্তল নিয়ে এগোল রানা। রেলিং না থাকায় ধাপ বেয়ে উঠে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। প্রথম ধাপে পা ফেলে একটু একটু করে চাপ বাড়াল ও,

মুড় মুড় শব্দে ভেঙে যেতে শুরু করল বরফ। এই ভাবে ষোলোটা ধাপের ওপর থেকে বরফ সরিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়াল ও। দু'ধাপ পিছনে রয়েছে মিলটন। বাকি তিনজন নিচে থেকে হাতে কারবাইন নিয়ে কাভার দিচ্ছে ওদেরকে।

দরজাটা পরীক্ষা করল রানা। একটু পরই ওর পাশে এসে দাঁড়াল মিলটন। নিচে থেকে ওরা দেখল, দু'জনেই যার যার হাতের আউটার গ্লাভ খুলে কাঠের ওপর আঙুল বুলাচ্ছে। এক মুহূর্ত পর পিঠ বাঁকা করে ঝুঁকে পড়ল মিলটন, তারপর সিধে হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। কি যেন আলাপ করল ওরা। মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মিলটন। ধীরে ধীরে নেমে আসতে শুরু করল সে।

'বাইরের দিকে দরজায় কোন হাতল নেই,' নিচে নেমে এসে ওদেরকে জানাল মিলটন। 'কবাট খোলার সময় প্ল্যাটফর্মে মাত্র একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। কি করব আমরা, শোনো। তুমি, নিতাই, দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াবে, কবাট তোমার দিকে এগিয়ে আসছে দেখেও আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে না। মি. রানা দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সিঁড়িতে, নিচের ধাপে থাকব আমি, আমার সাথে বুতেরা।'

'আমি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ডাক্তার।

'বুতেরার পেছনে।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডাক্তার। মারামারি কাটাকাটি করার লোক সে নয়, ভালই হলো তার জন্যে।

বলে চলল মিলটন, 'প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দেবেন মি. রানা, দিয়েই তিনি ঘুরে দাঁড়াবেন, যাতে দরজা খোলার পর ওরা যেন তাঁর পিছনটা দেখতে পায়। কিন্তু তাঁর হাতে কারবাইন থাকবে। দরজা খোলার পর তিনি ঘুরতে শুরু করবেন। তারপর...' সব কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে না হওয়ায় চুপ করে গেল সে।

হাত পা নেড়ে ঠাণ্ডা তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত সবাই, মিলটন থামতেই দ্রুত, নিঃশব্দে যে যার পজিশনে উঠে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে সবার পজিশন একবার দেখে নিল রানা। সবশেষে ডাক্তারের চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল। তারপর তাকাল মিলটনের দিকে।

'সব ঠিক আছে,' ফিসফিস করে বলল মিলটন।

এক মুহূর্ত স্থির পাথর হয়ে থাকল রানা, তারপর হাত তুলে টোকা দিল দরজার গায়ে। বেশ জোরে জোরে, এক সেকেন্ড পর পর পাঁচবার নক করল ও। ভেতরে যারাই থাকুক, তাদেরকে বুঝতে দিতে চায় দরজায় কোন আশ্রয়প্রার্থী পশু নয়, মানুষ এসেছে।

টোকা দিয়ে শান্ত ভাবে পিছিয়ে এল রানা। তারপর দরজার দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় চক চক করে উঠল ওর হাতের কারবাইন।

এক, দুই করে বিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। কিছুই ঘটল না। আবার টোকা দেবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে যাবে রানা, এই সময় ভেতর থেকে একটা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কর্কশ, ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বর, সুর শুনে বোঝা গেল কিছু জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কি জিজ্ঞেস করল বোধগম্য হলো না কারও।

দরজার দিকে পিছন ফিরেই গলা চড়িয়ে একটা জবাব দিল রানা। সিঁড়িতে সবার শেষে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার, দরজার বোল্ট সরাবার আওয়াজটা তার কানেও ঢুকল। এরপর আরেকটা শব্দ—তালার ভেতর চাবি ঘুরল, ক্লিক। সেই ঘড়ঘড়ে গলাটা আবার ঢুকল কানে।

নিচ থেকে ধাপের ওপর মাথা তুলে তাকাল ডাক্তার। বুতেরো আর মিলটনকে ছাড়িয়ে গেল তার দৃষ্টি। দেখল, দরজার কবাট বাইরের দিকে খুলে যাচ্ছে। ফাঁকের ভেতর আলো দেখা গেল। আলোটাকে আড়াল করে বাইরে বেরিয়ে আসছে একটা মূর্তি।

দরজার দিকে এখনও পিছন ফিরে রয়েছে রানা। পাথর বললেই হয়। কাঁধ দুটো দু'দিকে ঢালু হয়ে আছে, ভঙ্গি দেখে মনে হবে অপলক তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল লোকটা। চৌকাঠ পেরিয়ে নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। একটা হাত তুলে টোকা দিল সে রানার কাঁধে।

লোকটা হাত তুলেছে, এই সময় দরজার আড়াল থেকে তার পিছনে বেরিয়ে এল নিতাই। ডান হাতের আঙুল টান টান রেখে তালুর কিনারা দিয়ে লোকটার গর্দানে প্রচণ্ড একটা কোপ বসাল সে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে শুরু করল লোকটা, তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে পতনটা রোধ করল রানা।

ইতোমধ্যে দরজার কবাট পুরোপুরি খুলে গিয়ে দেয়ালের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। নিতাই আর রানা দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে, দু'জনে মিলে নিজেদের মাঝখানে ধরে আছে অচেতন রাশিয়ানকে। দরজার ওপার থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে ওদের গায়ে। একটা গুলি, অন্য কোন আওয়াজ—কিছু না। টপাটপ ধাপ ক'টা টপকে প্ল্যাটফর্মে উঠে এল মিলটন। অচেতন রাশিয়ানকে তার হাতে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত, কিন্তু শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে লাফ দিয়ে দরজার চৌকাঠ পেরোল রানা। রাশিয়ানকে নিয়েই ওকে অনুসরণ করল নিতাই আর মিলটন। দলনেতার নিরাপত্তার দিকটা লক্ষ রাখতে চায় ওরা। ওদের পিছু পিছু চৌকাঠ পেরোল বুতেরো আর ডাক্তার।

ভেতরে ঢুকে রানা দেখল, ছোট একটা গার্ডরুম, দেখতে দুনিয়ার আর সব মিলিটারি গার্ডরুমের মতই। সাধারণ একটা টেবিল, তাতে টেলিফোন। সেটার পিছনে পিঠ খাড়া কাঠের দুটো হাতলহীন চেয়ার। ঘরের মেঝেটাও কাঠের। দেয়ালে ফায়ার-এক্সটিঙ্গুইশার। পাশাপাশি দুটো বোর্ড ঝুলছে। একটা নোটিশ বোর্ড, আরেকটায় পেরেকের সাথে ঝুলছে চাবি। খোলা দরজাটা ছাড়া আরও দুটো দরজা রয়েছে। একটা টেবিলের পিছনে। দেখে মনে হলো, স্টোররুম বা ল্যাভেটরিতে যাবার পথ। কিন্তু দরজার ওপরে বা কাছেপিঠের কংক্রিট দেয়ালে কোন ফাঁক-ফোকর চোখে পড়ল না। রাশিয়ানদের স্যানিটারী অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে জানা নেই রানার, কিন্তু জানে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা ছাড়া যারা ল্যাভেটরি তৈরি করে তাদের মত বোকা আর কেউ নেই। আন্দাজ করল, দরজাটা বোধহয় কোন সিঁড়ির দিকে খোলে।

খোলা দরজাটা বন্ধ করল রানা। ঘরের বাইরে কোথাও থেকে কেউ কিছু শোনার চেষ্টা করছে কিনা বোঝার উপায় নেই, তাই বোল্টটা লাগাবার সময়

অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করল ও, যাতে কোন রকম শব্দ না হয়। এরপর টেবিলের পিছনের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল আবার। দস্তানা খুলে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখল সেগুলো। পারকার হুড খুলে সরিয়ে দিল মাথার পিছনে, তারপর কান পাতল দরজায়। রানার ইঙ্গিতে হন হন করে এগোল ডাক্তার, দু'নম্বর বন্ধ দরজায় কান পাতল সে-ও।

কিছুই শুনতে পেল না ডাক্তার। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকল রানা। দরজার দু'পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ওরা। হাত বাড়িয়ে দরজার হাতল ধরল রানা। তারপর ধীরে ধীরে ঘোরাতে শুরু করল সেটা। ডাক্তার দেখল, একটু একটু করে ঘুরে গেল রানার কব্জি। এরপর দরজা খোলার জন্যে হাতল ধরে টান দিল রানা। প্রথমে হালকা ভাবে, তারপর জোর লাগিয়ে। কিন্তু দরজা খুলল না।

মৃদু একটা গোঙানির আওয়াজ শুনে সবাই ওরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ঘরের এক কোণে পড়ে আছে আহত রাশিয়ান, ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে তার। দ্রুত তার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। হাতের কারবাইনটা তার চোখ লক্ষ্য করে ধরল।

চোখ মেলল লোকটা। ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতেই দেখতে পেল কারবাইন, সাথে সাথে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করল রানা, সেই সাথে হাত ঝাঁকি দিয়ে কারবাইনটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উঠে বসতে যাচ্ছিল লোকটা, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। হাত দিয়ে প্রথমে তাকে দরজা, তারপর চাবি ঝোলানো বোর্ডটা দেখাল রানা।

দ্রুত মাথা নাড়তে শুরু করল লোকটা, কিন্তু তার চোখের দিকে কারবাইনের মাজল নেমে আসছে দেখে ঘন ঘন ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল। বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিতাই। সারি সারি চাবিগুলোর প্রথমটায় আঙুল ছোঁয়াল সে। মাথা নাড়ল লোকটা। একের পর এক চাবি ছুঁল নিতাই, যতক্ষণ না হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত লোকটার মুখে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে তার হাত পা বেঁধে ফেলল বুতেরা। তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর সন্তর্পণে দরজার কী-হোলে চাবি ঢোকাল। ধাতুর সাথে ধাতুর ঘষা লাগায় ক্ষীণ একটু শব্দ হলো, কিন্তু নিস্তব্ধ ঘরের ভেতর ওরা সবাই শুনতে পেল সেটা। এক চুল এক চুল করে ঘুরতে শুরু করল চাবি। তারপর হঠাৎ ক্লিক করে আওয়াজ। ছোট্ট একটা শব্দ, কিন্তু ওদের কানে বিস্ফোরণের মত শোনাল।

দরজা খুলল রানা। প্রথমে সামান্য একটু ফাঁক হলো কবাট, সেই ফাঁকে একটা চোখ রাখল ও। এক মুহূর্ত পর পুরোপুরি খুলল। উঁকি দিয়ে দেখে নিল ওদিকটা। তারপর চৌকাঠ পেরিয়ে পা দিল একটা করিডরে।

নির্জন করিডর, বিল্ডিঙটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা। সিলিং থেকে অদৃশ্য আলো আসছে, কিন্তু ম্লান। দু'দিকের দেয়াল আসলে স্রেফ পার্টিশন, নিচে থেকে ফিট ছয়েক কাঠ দিয়ে তৈরি, সিলিং পর্যন্ত বাকিটা কাঁচের দেয়াল। ওপর দিকে তাকিয়ে বুঝতে অসুবিধে হলো না, দু'পাশের সব ক'টা ঘর অন্ধকার। এক এক করে প্রতিটি ঘরের দরজা পরীক্ষা করল ওরা। সবগুলোয় তালা দেয়া।

রানা অনুমান করল, কামরাগুলো সব অফিস, ওয়ার্কশপ আর ল্যাবরেটরি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। ওর পিছু পিছু লাইন ধরে আবার সবাই ফিরে এল আগের কামরায়, সেই গার্ডরুমে।

এবার দু'নম্বর বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। হাতল ঘোরাতেই খুলে গেল এটা। রানার পিছু পিছু সরু একটা ছোট্ট প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। শেষ মাথায় সিঁড়ি। সিলিং থেকে আলো আসছে, তাছাড়া আর কোথাও কোন আলো নেই। কান পাততে হলো না, এমনিতেই ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। একটা ডিজেল। ওটাই বোধহয় এখানে পাওয়ার-সাপ্লাইয়ের উৎস।

কংক্রিটের সিঁড়ির নিচে দাঁড়াল রানা। পিছন ফিরে দেখে নিল সবাই তৈরি হয়ে আছে কিনা। তারপর ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। কারবাইনটা সিঁড়ির মাথার দিকে তাক করে আছে, ট্রিগার পেঁচিয়ে আছে আঙুল। দুটো ধাপ বাকি থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, হাত নেড়ে ওদেরকে উঠতে ইঙ্গিত করল।

রানার পিছু পিছু চওড়া একটা ল্যান্ডিঙে এসে উঠল ওরা। উল্টোদিকের কিনারা থেকে আবার নিচে নেমে গেছে সিঁড়িটা। নিচে একটা দরজা দেখা গেল। সবাইকে পিছনে নিয়ে সাবধানে নামতে শুরু করল রানা। ফেল্টবুটের সাথে রাবার সাঁটা আছে বলে প্রায় কোন শব্দই হলো না। শুধু পরিষ্কার খস খস আওয়াজ হচ্ছে।

দরজায় তালা দেয়া আছে কিনা তাই নিয়ে মাথাব্যথা শুরু হলো ডাক্তারের। থাকলে আবার ফিরে গিয়ে গার্ডরুম থেকে চাবি নিয়ে আসতে হবে। দরজায় কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল রানা। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অসহ্য লাগল ওদের। এই দরজার ওপারে নিশ্চয়ই আরও লোক আছে। এই রকম একটা স্টেশনে মাত্র একজন লোক থাকতে পারে না। তারমানে, দরজা খোলার সাথে সাথে শুরু হয়ে যাবে অ্যাকশন।

হাতল ধরল রানা। ধীরে ধীরে ঘোরাতে শুরু করল। আর যখন ঘুরল না, আলতো ভাবে চাপ দিল একটু। চুল পরিমাণ ফাঁক হলো কবাট। চোখ কুঁচকে সেই ফাঁকে তাকাল রানা পরমুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে সবার দিকে তাকাল এবং মাথা ঝাঁকাল।

সিগন্যাল দিয়েই কাঁধের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় দরজার কবাট খুলে ফেলল রানা। লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওর কাঁধের ঠিক পিছনেই দেখা গেল মিলটনকে। ভেতরে ঢুকেই দু'দিকে সরে গেল দু'জন, মাঝখানে উদয় হলো নিতাই। দাঁড়িয়ে পড়ল তিনজন প্রত্যেকের হাতে কারবাইন নলের তিনটে গর্ত টার্গেট খুঁজে বেড়াবার ভঙ্গিতে দ্রুত এদিক থেকে ওদিকে আসা-যাওয়া করছে।

একটা ফিল্ম-শো চলছিল, তাতে বাধা দিয়েছে ওরা। কামরার ডান দিকে একটা স্ক্রীন আর বাঁ দিকে একটা প্রজেক্টর দেখা গেল, দুটোর মাঝখানে বিছানার ওপর শুয়ে বসে আছে লোকজন। এই মুহূর্তে সবাই হতভম্ব, বিমূঢ়—ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে নড়াচড়া শুরু হয়নি এখনও।

প্রথমে একজন, তারপর আরেকজন ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদের দিকে। সাথে সাথে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ, অবিশ্বাসে ঝুলে পড়ল মুখ। কিন্তু বাকি সবাই এমন কি বিস্মিত হবার জন্যেও প্রচুর সময় নিল। গোটা ব্যাপারটা এত

সহজ দেখে মনে মনে একটু নিরাশই হলো ডাক্তার, তেমনি খুশিও হলো। ভাবল, এটাই যদি বিপজ্জনক পরিস্থিতি হয় তাহলে ডানপিটে হয়ে উঠতে তার বাধা কোথায়? নিতাইয়ের বগলের তলা দিয়ে গলে কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল সে। নিতাই তো বটেই, সেই সাথে রানাও যে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তা সে ওদের দিকে না তাকিয়েও টের পেল। গর্বের পরশ অনুভব করল সে। ভাবল, সে-ও যে কাজে লাগতে পারে সেটা প্রমাণ করার এই তো মোক্ষম সময়। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে সুইচবোর্ডের সামনে থামল সে। হাতে প্রথম যে সুইচটা ঠেকল সেটাই অন করল, কিন্তু জ্বলল না আলো। আরেকটা সুইচ অন করতেই প্রজেক্টরের ম্লান আলোর জায়গায় উজ্জ্বল বালবের আলো মেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কামরা।

তাক করা আগ্নেয়াস্ত্র নিজেই একটা আন্তর্জাতিক ভাষা, অন্ধ ছাড়া আর সবাই বোঝে। শুয়ে-বসে থাকা রাশিয়ানরাও ভাষাটা বুঝল। বিমূঢ় ভাবে কেটে গিয়ে ভীতি আর ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠল তাদের চেহারায়। এ ওর দিকে, সে তার দিকে তাকাল, বিড় বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না কিছু। রানার ইঙ্গিতে এগিয়ে গেল গিলটন, থামল প্রজেক্টর অপারেটরের সামনে। কারবাইনের ইঙ্গিত পেয়ে বাকি লোকদের সাথে যোগ দিল সে-ও। দড়াম করে দরজা খোলার একমাত্র আওয়াজ ছাড়া অস্বাভাবিক আর কিছু শোনা যায়নি এখন পর্যন্ত।

সুইচবোর্ডের একটা হোল্ডারের ভেতর প্লাগ ঢোকানো রয়েছে, বুদ্ধি করে সেটা খুলে ফেলল ডাক্তার, সাথে সাথে অচল হয়ে গেল প্রজেক্টর, সেই সাথে থেমে গেল সাউন্ড। ধীরে ধীরে বড় কামরার চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলাল রানা। শোয়া-বসা, খাওয়া-দাওয়া এবং অবসর সময় কাটানো, এই ধরনের কাজে এই একটাই কামরা ব্যবহার করা হয়, অনুমান করল ও। দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে সারি সারি লকার, ছোট আকারের দেরাজ। লকারের ওপর সুটকেস, কাপড়চোপড় গাদা হয়ে আছে। বাতাসে গুমোট একটা ভাব। সিগারেট আর ঘামের গন্ধ। রানার পিছু পিছু একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বুতেরা আর ডাক্তার। দরজা খুলে ছোট্ট, সরু প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা।

বিল্ডিঙের আকৃতি দেখে আগেই ধারণা করেছিল রানা, এদিকে বড় রুমটা ছাড়া আর বোধহয় একটা কি খুব জোর দুটো ছোট কামরা থাকতে পারে। সরু প্যাসেজ ধরে আরেকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজার হাতল ধরে ঘোরাতেই খুলে গেল সেটা। প্রথমেই চোখ পড়ল লোহার একটা খাটের ওপর। গলা পর্যন্ত কম্বল ঢেকে কে যেন শুয়ে আছে। কামরাটা ছোট, চারকোনা। একটা বুক-শেলফ, একটা আলমিরা, একটা ওয়ারড্রোব, একটা টেবিল, একটা ওয়াশবেসিন, দুটো চেয়ার—আর কিছু নেই।

লোহার খাটের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে লোকটা। তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু নাড়া দিল ও।

ঘুম ভাঙল না। এবার আরও একটু জোরে নাড়া দিল রানা। সেই একই অবস্থা। তার কাঁধ ধরে শরীরটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল এবার।

শরীরটা চিৎ হতেই বুঝল রানা, ইনিই সেসলভ আইজ্যাক। ধক করে উঠল

ওর বুকের ভেতরটা। কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। সত্যিই তাহলে সঠিক অনুমান করেছে ওরা! সত্যিই বেঁচে আছেন সেসলভ। সত্যিই ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করানো হচ্ছে তাঁকে দিয়ে! সবই তাহলে সত্যি!

'ঘুমটা তাড়াতাড়ি ভাঙান,' ডাক্তারকে বলল রানা।

বিজ্ঞানী সেসলভের ওপর ঝুঁকে পড়ল ডাক্তার, শুনতে পেল গলা চড়িয়ে নিতাই আর মিলটনকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিল রানা, 'ওদের সবার কাপড় খুলে নাও। সব কাপড় জড়ো করো এক ধারে।' নিতাই আর মিলটন নির্দেশটা কিভাবে দেবে রাশিয়ানদের, ভাবতে গিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল ডাক্তার।

কিন্তু বিজ্ঞানীর ঘুম ভাঙাতে ডাক্তারও ব্যর্থ হলো। তাঁর পালস ঠিক আছে, কাজেই অস্থির হলো না সে। ধারণা করল, নিশ্চয়ই বেশি পরিমাণে ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে তাঁকে। সম্ভবত পাশের কামরায় সিনেমা দেখানো হচ্ছিল বলে প্রফেসর নিজেই ওষুধটা নিয়েছেন। কারবাইন রেখে দিয়ে তাঁর বাঁ চোখের পাতা খুলল সে। চোখের তারা দেখে মনে কোন সন্দেহ থাকল না, ঘুমের ওষুধই।

'ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'মি. সেসলভ স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়েছেন।'

'আপনি তাঁর ঘুম ভাঙাতে পারবেন কিনা বলুন।'

'ওষুধ-পত্র বা ইকুইপমেন্ট যা নিয়ে এসেছি তা দিয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু কথা সেটা নয়। আসলে ওষুধের ঘুম না ভাঙানোটাই ভাল।'

'আপনি বলতে চাইছেন এইভাবে নিয়ে যাব আমরা?'

মুখ তুলে তাকাল ডাক্তার। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে কিন্তু শব্দগুলো বেরিয়ে আসতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে মুখের ভেতর জমে গেল।

দেখেই বোঝা যায় হাসি হাসি মুখ নিয়ে জন্মেছে মেয়েটা, কিন্তু এই মুহূর্তে সে জোর করে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে রেখেছে চেহারায়। হয়তো মানাত না, কিন্তু হাতে ছোট একটা রিভলভার থাকায় গাম্ভীর্যের ভাবটুকু দারুণ মানিয়ে গেছে। রিভলভারটা ডাক্তারের বুক লক্ষ্য করে ধরে আছে সে। বলল, 'নড়বেন না! কেউ নড়বেন না!'

রানা এবং বুতেরা চরকির মত ঘুরে যেতে শুরু করল। দু'জনের কারবাইনই ফায়ার করার পূর্ব মুহূর্তের ভঙ্গিতে উঠে আসছে। দু'জনের একজন হয়তো মেয়েটাকে গুলি করে শুইয়ে দিতে বা নিরস্ত্র করতে পারত। কিন্তু ডাক্তার যা দেখল, ওরা তা দেখতে পেল না।

রিভলভারটা রানা বা বুতেরার দিকে নয়, এমন কি ডাক্তারের দিকেও নয়, তাক করা রয়েছে সেসলভ আইজ্যাকের দিকে। প্রথমে ডাক্তারের দিকেই লক্ষ্য করে ছিল, কিন্তু বুদ্ধি করে ঘুরিয়ে নিয়েছে মেয়েটা।

'না!' চেঁচিয়ে বলল ডাক্তার এডওয়ার্ডস। 'কেউ গুলি করবেন না!'

সাত

সেসলভ আইজ্যাককে পাবার উত্তেজনায় ঘরের যে আরেকটা দরজা আছে সেটা ওরা কেউ লক্ষই করেনি। দুটো ঘরের মাঝখানের ওই দরজা নিশ্চয়ই খোলা এবং ভিড়ানো অবস্থায় ছিল, কবাট খুলে কখন, মেয়েটা ভেতরে ঢুকেছে ওরা কেউ টেরও পায়নি। আরেকটু হলে ট্রিগার টিপে দিত রানা, ডাক্তারের কথা শুনে শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছে নিজেকে। মেয়েটাকে ছাড়িয়ে তার পিছনে চলে গেল ওর দৃষ্টি। খোলা দরজার ওপারে ছোট একটা ঘর দেখা গেল, একটা বিছানা রয়েছে, তারপর আর বিশেষ জায়গা নেই। ঘর না বলে ওটাকে খুপরি বলাই ভাল।

বিশুদ্ধ, ঝরঝরে ইংরেজীতে বলল মেয়েটা, 'সবাই, আপনারা সবাই পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ান!' রিভলভারটা এখনও ঘুমন্ত সেসলভের মাথা লক্ষ্য করে ধরা।

নিজের অজান্তেই ডাক্তারের হাত দুটো মাথার ওপর উঠে গেল ধীরে ধীরে, তারপর পিছাতে শুরু করল সে। তাকিয়ে আছে মেয়েটারই দিকে। আচমকা ওদের ওপর টেক্কা দেয়া হয়েছে, সেটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু ডাক্তারের কাছে তার চেয়েও বিস্ময়কর বলে মনে হলো এই রকম একটা জায়গায় নীল-নয়না সুন্দরীর আবির্ভাব। চেহারাটা তো আকর্ষণীয় বটেই, মেয়েটা বেশ লম্বা এবং গড়নটা অ্যাথলেটদের মত।

'যার যার হাতের পিস্তল মেঝেতে নামিয়ে রাখুন,' অনুত্তেজিত ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর, কিন্তু নীল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওদেরকে নজরবন্দী করে রেখেছে।

চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ডাক্তার, রানা আর বুতেরা ঝুঁকে পড়ে মেয়েটার নির্দেশ পালন করতে যাচ্ছে। নিজের জায়গা থেকে শুধু ওদেরকে নয়, সেই সাথে পাশের দরজাটাও চমৎকার নিজের আওতার মধ্যে রেখেছে মেয়েটা। ওই দরজার ওপারে ছোট্ট প্যাসেজ, তারপরই মেইন রুম। কেউ কিছু বলল না ওরা। চুরি করতে এসে ধরা পড়লে কারই বা কি বলার থাকে? কিন্তু ওরা তিনজনেই মিলটন আর নিতাইয়ের কথা ভাবছে। মেইন রুমে যে ওদের আরও লোক আছে, মেয়েটা নিশ্চয়ই তা জানে। গলা চড়িয়ে এই খানিক আগে ওদেরকে নির্দেশ দিয়েছে রানা। লোক আছে জানে মেয়েটা, কিন্তু ক'জন আছে জানে না।

মেঝেতে পিস্তল রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, মুখে বন্ধুত্বের হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ভালই ইংরেজী জানো, কাজেই আলাপ করতে অসুবিধে হবে না। ব্যাপারটা হলো...'

'চোপ!' চোখ রাঙিয়ে হুমকি দিল মেয়েটা। 'একটাও কথা নয়।' রিভলভার নেড়ে ইঙ্গিত করল সে, সবাইকে তার পিছনের দরজার দিকে এগোতে বলল। বুদ্ধিটা ভালই এঁটেছে, ওদেরকে নিজের ছোট্ট কামরায় আটক করতে চায়।

খুপরির ভেতর আটকা পড়লে আর কোন আশা নেই, বুঝতে পেরে দ্রুত কিছু

একটা করার কথা ভাবল রানা। সবাই মিলে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়লে মেয়েটাকে নিরস্ত্র করা সম্ভব, কিন্তু তাতে অন্তত একজন বা দু'জনকে হারাতে হতে পারে। না, ঝুঁকিটা নেয়া বোকামি হয়ে যাবে এ মেয়ে গুলি করতে ইতস্তত করবে বলে মনে হয় না। আর একটি মাত্র বিকল্প আছে, নিতাই আর মিলটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু কিভাবে?

মাথার ওপর হাত তুলে এগোল রানা। প্যাসেজে বেরোবার দরজার গা ঘেঁষে এগোতে হলো ওকে। মেইন রুম থেকে নড়াচড়া, মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল কানে। রানার পিছনেই বুতেরা। তার পিছনে ডাক্তার। প্যাসেজের দরজাটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় ভাবল সে, দেবে নাকি ঝেড়ে এক দৌড়? কিন্তু আড়চোখে তাকাতেই দেখল, রিভলভারটা তার দিকেই তাক করে আছে মেয়েটা। পালা করে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ওদের তিনজনের দিকে। আর মাত্র দু'এক মুহূর্ত, তারপরই খুপরির ভেতর আটকা পড়বে ওরা। তারপর মেইন রুমে ঢুকে নিতাই আর মিলটনকে নিরস্ত্র করবে মেয়েটা। শেষ হয়ে যাবে ওদের এত সাধের অ্যাডভেঞ্চার।

খুপরির দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডাক্তারের দিকে।

রানার দৃষ্টির কি অর্থ করল ডাক্তার সে-ই বলতে পারবে, সাথে সাথে মেয়েটার দিকে ফিরে ইঙ্গিতে সেসলভকে দেখাল, তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'উনি সাংঘাতিক অসুস্থ!'

স্থির দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। কথা না বলে রিভলভার নেড়ে আগে বাড়তে ইঙ্গিত করল তাকে।

'আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজেই দেখুন না!' দ্রুত বলল ডাক্তার। 'প্রফেসর ঘামছেন। এর অর্থ কি জানেন?'

কয়েকবার চোখ পিট পিট করল মেয়েটা। সেসলভের দিকে তাকাল একবার। আবার ফিরল ডাক্তারের দিকে। মাথা নাড়ল এদিক ওদিক। অর্থাৎ কই, প্রফেসর তো ঘামছেন না!

'আপনি বোকা নাকি?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ডাক্তার। 'মুখ কেন ঘামবে! চুল আর কাপড়ে হাত দিয়ে দেখুন, একেবারে ভিজে গেছে।' চেহারা এবং গলার সুরে উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলল সে। 'হি ইজ হাইপো-গ্লাইকেমিক।'

আবার আধাআধি ঘুরে সেসলভের দিকে তাকাল মেয়েটা।

'প্রফেসরকে মেরে ফেলার রাস্তা করেছেন আপনারা,' চটেমটে বলল ডাক্তার। 'এত বেশি ইনসুলিন দেয় কেউ? নিশ্চয়ই আপনার কাজ? বেশি দেরি নেই, তাকিয়ে থাকুন, প্রফেসর হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলেন বলে!' একটু বিরতি নিল ডাক্তার, তারপর আবার বলল, 'আর, একবার খিঁচুনি শুরু হলে কার বাপের সাধ্যি থামায়!'

ইতস্তত করতে দেখা গেল মেয়েটাকে। ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছে না। কিন্তু যতই ইতস্তত করুক, আচরণে কোনরকম ঢিলে-ঢালা ভাব নেই। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিছানার দিকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল সে। তিনজনের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে, হাতের রিভলভার তাক করে আছে

রানা আর ডাক্তারের মাঝখানে বুতেরার দিকে অপর হাতটা পিছনে সরিয়ে নিয়ে গেছে, নাগালের মধ্যে এলে যাতে ছুঁতে পারে বিছানাটা। কিন্তু বিছানার প্রান্ত কামরার এক কোণে রয়েছে, ওদের ওপর নজর রাখতে রাখতে পিছিয়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছানো তার জন্যে বেশ কঠিনই।

'দেখুন, দেখুন!' রেগে মেগে চেঁচিয়ে উঠল ডাক্তার। 'প্রফেসর কেমন করছেন! তাকান!'

বিছানার মাথার কাছে থামল মেয়েটা। প্রফেসরের দিকে তাকাল না। বাঁ হাতটা দিয়ে প্রফেসরের মুখ স্পর্শ করার চেষ্টা করছে সে। মনে মনে প্রমাদ গুণল ওরা। মেয়েটার হাত যদি প্রফেসরের শুকনো চুল স্পর্শ করে, সব ভেস্তে যাবে।

চোখের কোণ দিয়ে দেখল রানা, সরু প্যাসেজে কি যেন নড়ে উঠল। পরমুহূর্তে মিলটনকে দেখতে পেল ও। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্যাসেজের দরজার দিকে তাকাতে যাচ্ছিল ডাক্তার, কিন্তু হঠাৎ বুঝল সেটা বোকামি হয়ে যাবে। মেয়েটার দিকে তাকাল সে। জানতে চাইল, 'শেষবার কখন ইঞ্জেকশন দিয়েছেন তাঁকে?' রাগের সাথে এক পা সামনে বাড়াল সে।

আচমকা হাত লম্বা করে গুলি করতে গেল মেয়েটা, ঠিক সেই মুহূর্তে ভোজবাজির মত তার হাত থেকে ছিটকে পড়ল রিভলভারটা। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের আঙুলগুলো চেপে ধরল সে, সেই সাথে ককিয়ে উঠল ব্যথায়। ছোট্ট পরিসরে গুলির আওয়াজটা হলো কামান দাগার মত। কয়েকবার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঘরের ভেতর ছুটোছুটি করল বুলেটটা। গুলির আওয়াজ শোনা মাত্র তিনজনই ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়েছে মেঝেতে। তবু ওদের মধ্যে কেউ একজন কাতরে উঠল। গম্ভীর চেহারা নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল মিলটন। রাইফেলের বোল্ট নাড়াচাড়া করছে। মাজল থেকে ধোঁয়ার একটা সূক্ষ্ম রেখা বেরিয়ে আসতে দেখল ওরা। ঝুঁকে পড়ে রিভলভারটা তুলে নিল সে।

'ধন্যবাদ, মিলটন,' বলল রানা। কিন্তু উঠে বসার চেষ্টা করল না ও। মিলটন লক্ষ করল, দলনেতা দু'হাত দিয়ে খামচে ধরে আছে তার উরু। মিলটনের দৃষ্টি অনুসরণ করে ব্যাপারটা ডাক্তারও লক্ষ করল। রানার দিকে দ্রুত এগোল সে। 'মি. রানা? কি ব্যাপার?'

'উরুতে গুলি খেয়েছি।'

'কই দেখি!'

দেঁতো হাসি হেসে বলল রানা, 'ভদ্রমহিলার সামনে দেখাই কিভাবে?'

মেয়েটার দিকে ফিরল ডাক্তার। ইঙ্গিতে খুপরিটা দেখিয়ে দিল। 'ওখানে।'

আঙুলগুলো এখনও ধরে আছে মেয়েটা। বুলেট তাকে স্পর্শ করেনি, হাত থেকে শুধু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে রিভলভারটা। তবে ঝাঁকি খেয়ে আঙুলগুলো বোধহয় থেঁতলে গেছে। মেয়েটাকে নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল মিলটন।

ক্ষতটা পরীক্ষা করল ডাক্তার। মারাত্মক কিছু নয়। রানার গায়ে লাগার আগে মিলটনের বুলেট তার প্রায় সবটুকু শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। শুধু তাই নয়, চিড় খেয়ে, তুবড়ে আসল চেহারাটাও হারিয়ে ফেলেছে বুলেট। তবে রানার কাপড়চোপড় ফুটো করে ভেতরে ঠিকই ঢুকতে পেরেছে। মাংসের ভেতরও

ঢুকেছে, কিন্তু মাত্র অর্ধেকটা। হাত দিয়ে টেনেই সেটাকে বের করতে পারল ডাক্তার। মেডিকেল কিট খুলে ক্ষতটাকে গোসল করিয়ে দিল সে। বেশ ভালই রক্ত পড়ল। খানিকটা গজে পেনিসিলিন পাউডার ছড়িয়ে সেটা গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ডাক্তার, তারপর শক্তভাবে বেঁধে দিল ব্যান্ডেজ।

'একটু ব্যথা হতে পারে, বাকি সব ঠিক থাকবে।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

'খুব বেশি ব্যথা হলে বলবেন, মরফিন তো আছেই,' বলল ডাক্তার।

'ঠিক আছে। মিলটন!'

রানার হাঁক শুনে মেয়েটাকে সামনে নিয়ে খুপরি থেকে চলে এল মিলটন। সবাইকে পিছনে নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। সেখান থেকে ঢুকল মেইন হলরুমে। পনেরো জন বিবস্ত্র রাশিয়ান দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, উল্টোদিকের দেয়ালে পিঠ দিয়ে রয়েছে নিতাই, হাতের কারবাইন সামনের দিকে তাক করা। স্ট্রেচারের প্যাকেটটা পিঠ থেকে নামাল রানা। বলল, 'তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়ে এটায় তুলুন প্রফেসরকে।'

বুতেরাকে সাথে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল ডাক্তার। ঢুকল প্রফেসরের বেডরুমে। তাঁর গা থেকে কম্বল সরিয়ে দেখল, সিল্কের পাজামা পরে আছেন তিনি। সেটা খুলে নিল ডাক্তার। অচেতন লোককে কাপড় পরানো ঝামেলার ব্যাপার হলেও, অনেকদিন আগেই কাজটা রপ্ত করে নিয়েছে ডাক্তার। ওয়ার্ডরোবে এক সেট আর্কটিক ড্রেস পাওয়া গেল। বুতেরার সাহায্যে প্রফেসরকে কাপড় পরাতে তিন মিনিটের বেশি লাগল না তার। রেসকিউ স্ট্রেচারে তোলা হলো তাঁকে। দ্রুত হাতে বোতাম লাগিয়ে, স্ট্র্যাপ বেঁধে ফেলল বুতেরা। কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে প্রফেসরকে, কথাটা ভেবে গম্ভীর হয়ে উঠল ডাক্তার। ডায়াবেটিসের রোগী, কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ কোন ডাক্তার দেয় নাকি! এখন যদি প্রফেসর ঘুমের ভেতর অনির্দিষ্টকালের জন্যে থেকে যান, কিংবা কোমা-র ভেতর চলে যান, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

মেঝেতে সবুজ রঙের একটা ক্যানভাস পার্সেলের মত দেখাল স্ট্রেচারটাকে। স্ট্র্যাপ ইত্যাদির সাহায্যে নিখুঁত ভাবে তাতে শুইয়ে রাখা হয়েছে প্রফেসরকে। তাঁকে আরেকবার পরীক্ষা করল ডাক্তার, তারপর বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে।

মেইন রুমে ঢুকে দেখল, অত্যন্ত ব্যস্ত ব্যাকুলতার সাথে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে মেয়েটা রানাকে।

'বিশ্বাস করুন, উনি আমার রোগী, আমি ছাড়া…'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা।

রোগ, রোগী এসব নিজের সাবজেক্ট ভেবে নাক গলাল ডাক্তার। 'আমি কোন সাহায্যে লাগতে পারি, মি. রানা?'

ডাক্তারের দিকে ফিরল রানা, 'কি বলছে শুনুন। ও নাকি প্রফেসরের নার্স। নিজের রোগীকে কোথাও নিয়ে যেতে দেবে না…এই সব প্রলাপ।'

মেয়েটার দিকে ফিরল ডাক্তার। 'কি?'

ডাক্তারের দিকে এগিয়ে এল মেয়েটা এক পা। ভাবটা যেন, সে নিজে যখন

একজন নার্স, তাহলে নিশ্চয়ই একজন ডাক্তারের সমর্থন আদায় করতে পারবে। শান্ত কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বলল সে, 'একেবারে প্রথম থেকে আমি প্রফেসরের নার্স, ব্যাপারটা তা নয়। আসলে আমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমাকে নার্সিঙের ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। আপনারা যদি তাঁকে নিয়ে যেতে চান, আমাকেও তাঁর সাথে যেতে হবে। এইটুকুই বোঝাতে চাইছি আমি। আবার বলছি,' রানার দিকে ফিরল সে, 'আমাকে ছাড়া প্রফেসরের চলবে না। আমি যে শুধু তাঁর নার্স, তাও নয়। আমি তাঁর সাথে কাজও করি। তাঁর সাপ্লাই, ইনসুলিন ইত্যাদি সব আমার দায়িত্বে রাখা আছে…'

'যেতে চাইছ, কিন্তু জানো কোথায় নিয়ে যাব তাঁকে আমরা?' বলল রানা। 'রাশিয়ার বাইরে।'

'জানি। একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু আপনারা সত্যি আসবেন তা আমি বিশ্বাস করিনি। প্রফেসরকে সাহায্য করা কারও পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয়নি আমার।'

'তোমরা মেসেজ পাঠিয়েছিলে…মানে? তাহলে রিভলভার কেন?' জানতে চাইল রানা।

রাগের সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। গলায় রাজ্যের ঝাঁঝ ফুটিয়ে বলল, 'জানব কিভাবে আপনারা কে, কোত্থেকে এসেছেন? কে.জি.বি.-ও তো হতে পারতেন? আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন? প্রফেসরকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন না?'

'আর, আমরা যদি সত্যি কে.জি.বি. হতাম, কি করতে তুমি?'

'হোক কে.জি.বি. তারা যদি অস্ত্রের মুখে প্রফেসরকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করত, আমি বাধা দিতাম। প্রথম সুযোগে অবশ্যই আমি খুন করতাম প্রফেসরকে। কারণ লেবার ক্যাম্পে যাবার চেয়ে মৃত্যু অনেক…অনেক ভাল, এ-কথা প্রফেসরের মুখে অনেকবার শুনেছি আমি।' গলাটা আবেগে কেঁপে উঠল মেয়েটার। 'নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও তাঁর এই সর্বনাশ আমি ঠেকাতে চেষ্টা করতাম।'

'অসম্ভব,' বলল রানা। 'এত কথার পরেও তোমাকে সাথে নেবার উপায় নেই আমাদের।'

'প্লীজ!' মেয়েটার করুণ চোখের দৃষ্টিতে দয়া প্রার্থনার আবেদন ফুটে উঠল। 'প্লীজ! আমার জীবনে প্রফেসর বাপের চেয়েও বেশি। তাঁকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড বাঁচতে পারব না। আমাকেও তাঁর দরকার। এর যে কি গুরুত্ব, আপনাকে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই। অ্যাকাডেমিশিয়ান সেসলভের সাথে অনেক দিন ধরে আছি আমি, তাঁর সব কাজে আমি সাহায্য করেছি…'

আবছা ভাবে মনে পড়ল রানার, ড. নোলটন সেসলভের একজন নিবেদিত প্রাণা অ্যাসিস্ট্যান্টের কথা বলেছিলেন বটে। ড. নোলটন আন্দাজ করেছিলেন, মেসেজটা হয়তো সেই অ্যাসিস্ট্যান্টই পাঠিয়েছে।

'মেসেজটা কিভাবে পাঠানো হয়েছিল?' জানতে চাইল রানা।

'আমিই পোস্ট করেছিলাম,' বলল মেয়েটা। 'মীটিং অ্যাটেন্ড করার জন্যে মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাদের। চোখে চোখে রাখা হয়েছিল

আমাদেরকে। কিন্তু আমার ওপর ওদের তেমন কড়া নজর ছিল না। এক সুযোগে ওটা আমি পোস্ট করি। কিন্তু তখন আমরা জানতাম না ওটা রাশিয়া থেকে আদৌ বেরুতে পারবে কিনা।' চেহারা থেকে আবেগ সরে গিয়ে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। 'আপনারা যে এসেছেন, সেজন্যে আমি সাংঘাতিক খুশি হয়েছি!'

ডাক্তার বুঝল, সিদ্ধান্ত এখন দলনেতাকেই নিতে হবে।

'প্রফেসরকে আমরা রাশিয়া থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি জানার পরও তুমি আমাদের সাথে যেতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। যাব বলেই তো মেসেজটা পাঠাতে সাহায্য করেছি প্রফেসরকে। বুঝতে পারছেন না, ওটা পাঠাবার জন্যে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে হয়েছিল আমাকে!'

'কোথায় যেতে চাও তুমি?'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। যেন প্রশ্নটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারেনি। 'কেন, যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই…'

'যুক্তরাষ্ট্রে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'মেসেজটা তো ওখানেই পাঠিয়েছিলাম আমরা। আপনারা এসেছেনও ওখান থেকে। তবু জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'না, তোমাদের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ আছে কিনা জানতে চাইছিলাম,' বলল রানা।

'প্রফেসরের কথা বলতে পারব না,' একটু চিন্তা করে উত্তর দিল মেয়েটা। 'আর আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি তো আগেই বলেছি প্রফেসর যেখানে যাবেন আমাকেও সেখানে যেতে হবে।'

'পথে বিপদ হতে পারে। তুমি মারাও যেতে পারো। আমরা সবাই মারা পড়তে পারি। এটা একটা বিপজ্জনক অভিযান, নিরাপদ কোথাও আমরা হয়তো পৌঁছুতেই পারব না।'

নীল চোখ দুটো ভিজে উঠল। 'আপনি বুঝতে পারছেন না! প্রফেসরের মত এত বড় এক মহাপুরুষের সাথে কাজ করার সুযোগ পাওয়া কতখানি পরম গৌরবের ব্যাপার। রাজনীতি, জাতীয়তা ইত্যাদি ঠুনকো জিনিসের চেয়ে তাঁর সান্নিধ্য আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।'

'ওরা তোমাকে বেঈমান বলবে। তোমার পরিবারের ওপর অত্যাচার হবে।'

'পরিবার বলতে আমি একা। আমার কেউ নেই।'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'আর্কটিক কাপড়চোপড় আছে তোমার?'

'হ্যাঁ!' আনন্দে চিকচিক করে উঠল চোখের দৃষ্টি। 'হ্যাঁ, আছে! ঘরে—নিয়ে আসব?'

'তোমার সাথে মিলটন যাবে।'

এগিয়ে এসে রানার হাত ধরে ফেলল মেয়েটা। ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল। 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ!' বুজে এল গলাটা।

মনে মনে খুশিই হলো ডাক্তার। ফেরার পথে দলে একটা মেয়ে, তাও আবার সুন্দরী মেয়ে, থাকলে সবারই ভাল লাগবে। ঠাণ্ডা নরক পাড়ি দেবার সময় নীল-

নয়না ওদের প্রেরণা যোগাতে পারে। দল থেকে পাঁঠা পাঁঠা গন্ধ খানিকটা হলেও কমবে।

চেহারায় পাথরের মত কাঠিন্য নিয়ে মেয়েটাকে অনুসরণ করল মিলটন। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভুরু কুঁচকে উঠল ডাক্তারের। কঠিন পাত্র, এই নরওয়েজিয়ান মার্কসম্যান! এমন সুন্দরী মেয়ের সান্নিধ্যও ওর মনে এতটুকু ঢেউ জাগাতে পারেনি।

'সিঁড়ির মাথায় উঠে যাও, নিতাই,' দ্রুত নির্দেশ দিল রানা। 'সবাই ওপরে উঠবে, কাভার দাও।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিতাই। মেইন রুম থেকে দেখা গেল সিঁড়ি বেয়ে উঠছে সে। বুতেরা পজিশন নিল সিঁড়ির নিচে।

'রেডি?' জানতে চাইল রানা।

সিঁড়ির মাথা থেকে নিতাইয়ের গলা ভেসে এল, 'রেডি।'

দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো রাশিয়ানদের দিকে দু'পা এগোল রানা। 'যে-যার কাপড় তুলে হাতে নাও।'

এক চুল নড়ল না কেউ। তাকিয়ে থাকল রানার মুখের দিকে।

'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমার কথা,' বলল রানা। 'রাশান ভাষায় কথা বলছি আমি। তোমরা সবাই কানে খাটো, এ আমি বিশ্বাস করি না। কাপড় তোলো।'

পিছন থেকে ফিক করে হেসে ফেলল ডাক্তার।

তবু কেউ নড়ল না। অগত্যা ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হলো রানাকে। কারবাইন হাতে ওকে কাভার দিচ্ছে বুতেরা। এক বান্ডিল কাপড় তুলে সামনের লোকটার বুকের ওপর ছুঁড়ে দিল রানা। তারপর বাকি সবাইকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে। রাগে লাল হয়ে উঠল ওর চেহারা। সামনের লোকটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে বান্ডিলটা, আর সবাইও আগের মত দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

ঝট্ করে ওদের দিকে পিছন ফিরল রানা। হন হন করে হেঁটে ফিরে এল বুতেরার পাশে। 'ভেবেছিলাম খুন-খারাবির মধ্যে যাব না। কিন্তু...' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও। তারপর ফিরল বুতেরার দিকে। একটা চোখ টিপে বলল, 'এমন ভাবে গুলি করো যাতে সব ক'জন একটা করে পা হারায়।'

রাশিয়ান ভাষা ভালই বোঝে বুতেরা, নির্দেশটা রাশিয়ানদেরও বুঝতে অসুবিধে হলো না। কারবাইনে বুতেরার আঙুল চেপে বসছে দেখে তারা সবাই এক সাথে ঝুঁকে তুলে নিল যে-যার কাপড়ের বান্ডিল।

হাসি চাপল রানা। বলল, 'থাক, গুলি করার দরকার নেই, বুতেরা।'

গরু-ছাগলের মত খেদিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় নিয়ে আসা হলো সব কটাকে। সিঁড়ির মাথায় রয়েছে নিতাই। নিচে বুতেরা। এক লাইনে দাঁড় করানো হলো বন্দীদের। তারপর একজন একজন করে উঠতে বলা হলো। বিবস্ত্র লোকের আচরণে একটু আড়ষ্ট ভাব থাকেই, তাছাড়া ভীত সন্ত্রস্ত একটা ভাবও ওদের মধ্যে লক্ষ করা গেল। গার্ডরুমে নিয়ে আসা হলো সবাইকে।

রানা বলল, 'যেখানে যত কাপড় আছে সব কিনারা থেকে নিচে ফেলে দিতে

হবে।'

অস্ত্রের মুখে আবার নিচে নামানো হলো রাশিয়ানদের, বাকি সমস্ত কাপড়চোপড়, বুট ইত্যাদি নিয়ে গার্ডরুমে উঠে এল তারা। বাইরে, পাহাড়ের কিনারায় জড়ো করা হলো সব। সেগুলো পা দিয়ে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিল নিতাই। এরপর রাশিয়ানদের আবার সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনা হলো। সবাইকে গাদাগাদি করে ঢোকানো হলো মেয়েটার খুপরিতে। রানার নির্দেশে কামরার একমাত্র বালবটা ভেঙে ফেলল মিলটন। ভেতরে রাশিয়ানদের রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো দরজায়। বাইরে কারবাইন হাতে পাহারায় থাকল মিলটন। বুতেরা আর ডাক্তার স্ট্রেচারটা বয়ে নিয়ে এল স্টেশনের বাইরে। সারাটা পথ ওদের সাথে থাকল মেয়েটা, মুহূর্তের জন্যেও স্ট্রেচার থেকে হাত সরাল না।

লোহার সিঁড়ি বেয়ে নামল ওরা। স্ট্রেচারটা কিনারায় রাখা হলো। ওদের দিকে এগিয়ে এল নিতাই। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল সে। 'পরনে কিছু না থাকলে পিছু নিতে পারবে না ওরা, কি বলেন, ডাক্তার?'

'হ্যাঁ,' বলল ডাক্তার। 'লজ্জা নয়, ঠাণ্ডাই বাধা দেবে ওদেরকে।'

বিরাট লম্বা এক জোড়া রশি দিয়ে বাঁধা হলো স্ট্রেচারের দুই প্রান্ত। রশি জোড়ার অপর প্রান্ত দুটো আগেই লোহার সিঁড়ির সাথে বেঁধে নেয়া হয়েছে। দুটো রশির একটা ক্রমশ ঢিল করে স্ট্রেচার নামানো হবে, আরেকটা রশি নিজের হাতে রেখে স্ট্রেচারের সাথে নেমে যাবে নিতাই। নামার সময় ফুলে থাকা পাথরের গায়ে স্ট্রেচার আটকে যেতে পারে, সেজন্যে নিতাই থাকল। কিনারা থেকে নিচে তাকিয়ে ওরা দেখল, সেই আগের ভঙ্গিতেই ডু-র সামনে অনবরত পায়চারি করে যাচ্ছে কংকর।

স্ট্রেচারটা নামাতে মিনিট দশেক লাগল। দু'একবার পাহাড়ের গায়ে সেটা আটকাল বটে, কিন্তু কোন রকম বিপদ দেখা দিল না। ওপর থেকে ওরা দেখল, বরফের ওপর নামছে নিতাই, তাকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে আসছে কংকর।

মিলটনকে নিয়ে আসার জন্যে আবার বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকল বুতেরা। বন্ধ ঘরের ভেতর পনেরোজন বিবস্ত্র লোক রাগে ফুঁসছে, আর বাইরে একা দাঁড়িয়ে আছে মিলটন। বুতেরাকে দেখেই স্বস্তির হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। বলল, 'চলো, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।'

পাহাড়ের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল ডাক্তার। ডু-র দিকে হিড় হিড় করে স্ট্রেচার টেনে নিয়ে যাচ্ছে কংকর, আর রশি ধরে তর তর করে ওপরে উঠে আসছে নিতাই।

ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। তার দিকে ফিরল ডাক্তার। 'তোমার কাছে ইনসুলিন আছে?'

ক্যানভাসে মোড়া একটা বাক্স দেখাল মেয়েটা। ফার হুডের ভেতর হাসল সে। প্রফেসরের নির্দিষ্ট ইনসুলিন পাওয়া গেল দেখে খুশি হলো ডাক্তার। রাশিয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস সম্পর্কে কিছুই জানা নেই তার, এই পর্যায়ে ওষুধ-পত্র বদল করা বিপজ্জনকও বটে।

ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল রানাকে। 'তুমি নামতে জানো?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মেয়েটা। কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল রানা, চিৎকার করে স্ট্রেচারটা তুলে দিতে বলল কংকরকে।

আধ ঘণ্টা পর সবাই ওরা নিরাপদে নেমে এল নিচে। একটা ডুতে তোলা হয়েছে প্রফেসর সেসলভকে। এখনও তাঁর ঘুম ভাঙেনি। ওদের চারদিকে, বরফের ওপর ছড়িয়ে আছে রাশিয়ানদের কাপড়চোপড়। এগুলোর কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করলে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাবে তারা। এই প্রথম হুল ফোটানো আর্কটিক বাতাস আর কনকনে ঠাণ্ডার ছ্যাঁকা অনুভব করে খুশি হলো রানা। বন্ধ ঘর থেকে বেরোতে খুব বেশি সময় লাগবে না ওদের। কিন্তু মিলটন অত্যন্ত যত্নের সাথে যে-দুটো ভেঙে গুঁড়িয়ে রেখে এসেছে সেগুলো ছাড়া আর কোন রেডিও ট্র্যান্সমিটার যদি না থাকে, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কোন রকম সাহায্য পাবে না ওরা, অন্তত দিন কয়েকের জন্যে গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে ওদের। ওদের তরফ থেকে কোন সিগন্যাল না পেলে অন্য কোন স্টেশন থেকে অনুসন্ধানী দল নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু এক হপ্তার আগে নয়। তবে ওদের কাছে লুকানো ট্র্যান্সমিটার থাকা খুবই সম্ভব।

একা একা শুধু পায়চারি করে সময় কাটিয়েছে কংকর, তা নয়। ওদের পালাবার একমাত্র অবলম্বন ডুগুলোকে জ্যান্ত করে রেখেছে সে। বাকি সবার অনুপস্থিতিতে দু-দু'বার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ইঞ্জিন। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। শুধু স্টার্ট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলে ঘণ্টাখানেকের বেশি চালু থাকে না টু-স্ট্রোক। প্রতিবারই দ্রুততার সাথে আবার স্টার্ট দিয়েছে কংকর। সেজন্যেই পাহাড় থেকে নেমে সবগুলো ডু-র ইঞ্জিন চালু দেখতে পেল ওরা।

মিনিট কয়েক পরই ফিরতি পথে রওনা হলো মিশন। ফেরার পথে নতুন করে সাজানো হলো লাইন। একা কংকরকে সামনে থাকতে দেয়া হলো। তার পিছনের ডুতে প্রফেসর সেসলভকে নিয়ে থাকল রানা। রানার পিছনে নিতাইয়ের ডু। সবার পিছনে বুতেরা আর ডাক্তার পাশাপাশি। ডাক্তারের পিছনের সীটে জায়গা পেল মেয়েটা।

রানা আর কংকরের ডুতে একটা করে ডাইরেকশনাল রিসিভার বসানো হলো। কিছুটা ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেল, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। সামনের ডু যদি কোন দুর্ঘটনায় পড়ে, ওদের হাতে আর মাত্র একটা রিসিভার থাকবে, এবং সেটাকে পরে আর লিডিং স্নোমোবাইলে ফিট করার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। অথচ সবার আগে যে থাকবে তার কাছে রেডিও থাকাটা জরুরী। রানার কাছেও একটা থাকা দরকার। কারণ যোগাযোগের সময় কথা বলার দায়িত্ব ওকেই নিতে হবে।

প্রথম দিকে গতি হলো ঘণ্টায় আট মাইল। ভারী সাইলেন্সার এখনও ইঞ্জিনের আওয়াজ দমিয়ে রেখেছে। রানার নির্দেশ, অন্তত দশ মাইল না পেরিয়ে সাইলেন্সার খোলা চলবে না। গতি মন্থর বলে মনে মনে সবাই অস্থির, অজানা ভয়ে সবারই বুক দুরু দুরু। নোভাইয়া জেমলাইয়াকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিছনে ফেলে যত দূরে সরে যেতে পারা যায় ততই নিরাপদ আর স্বস্তি বোধ করবে ওরা। বরফ এখানে সমতল আর মসৃণ নয়, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেল ডু, তার সাথে ঝাঁকি খেলেন ঘুমন্ত সেসলভ। শুধু মাত্র একটা হারনেস কোমরে জড়িয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁকে

সীটের সাথে. ডু চালাতে রানা একটু অসতর্ক হলেই তাঁর মাথাটা দেয়ালের সাথে ঠুকে যেতে পারে। সাবধান হওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর। ডুগুলো এমনভাবে তৈরি, কারও জন্যে শোয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

নিতাইয়ের পিছনের ডুতে রয়েছে ডাক্তার আর মেয়েটা। সুন্দরী নারীর সান্নিধ্যে মন-মেজাজ খাসা হয়ে ওঠে ডাক্তারের, কিন্তু ফিরতি যাত্রার প্রথম পর্বে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে. এই মুহূর্তে রূপসীর মনোরঞ্জন করার তাগিদ অনুভব করছে না। গরম কেবিনে বসে এক এক করে সমস্ত ঘটনা স্মরণ করল সে। বিপদের মুখে পড়তে হয়নি তা নয়. কিন্তু কোন বিপদই ওদেরকে অচল বা ব্যর্থ করে দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত কাজ হাসিল করে নিরাপদে ফিরে যাচ্ছে ওরা। সত্যি? নিজেকেই জিজ্ঞেস করল ডাক্তার। দেখিয়াও না হয় প্রত্যয়—ওর হয়েছে সেই অবস্থা। ভাবল, এসপিওনাজ এজেন্টদের কত গল্প শুনেছে, কত কাহিনী পড়েছে, তাদের সাহস, বুদ্ধি ইত্যাদি লক্ষ করে নিজেকে ভোঁতা, দুর্বল এবং কাপুরুষ বলে মনে হয়েছে তার। কিন্তু এখন দেখছে, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টও পানির মত সহজে সারা যায়। থিউল থেকে রওনা হবার পর তার গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।

মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল সে। প্রতিবারই মেয়েটার উপস্থিতি নতুন করে আবিষ্কার করল, কিন্তু মেয়েটা তার মনোযোগ কাড়তে পারল না। পিছনে ফেলে আসা উঁচু জমির ওপর চোখ বুলাল ডাক্তার, বোঝার চেষ্টা করল ওখানে কিছু ঘটছে কিনা।

চোখাচোখি হতে প্রতিবারই ভদ্রতাসূচক মৃদু হাসল মেয়েটা। ডাক্তার দেখল, নোভাইয়া জেমলাইয়ার দ্বীপটা ক্রমশ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। শেষ বার যখন তাকাল. বরফ, আর অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। এতক্ষণে মেয়েটার দিকে খেয়াল দেবার কথা মনে পড়ল তার।

রওনা হবার সোয়া এক ঘণ্টা পর ডু-র মাথার লাল আলো জ্বেলে গতি মন্থর করে আনল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের ডু-র লাল আলো জ্বলে উঠতে দেখে কংকরও কমিয়ে আনল গতি। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। দরজা খুলে নামল রানা। সামনের ডু-র পাশে এসে দাঁড়াল ও। দরজা খুলে বেরিয়ে এল কংকর।

'সাইলেন্সার,' বলে নিজের ডুতে ফিরে এল রানা।

সবাই যে যার ডুতে বসে থাকল, দেখল, নিজের ডু-র পিছনে ঝুঁকে পড়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে কংকর। খানিক পর সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, হাতে সাইলেন্সার। ছুঁড়ে বরফের ওপর ফেলে দিল সেটা। তারপর দ্রুত এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার ডু-র পিছনে।

এক সময় ডাক্তারের ডু-র পাশে এসে দাঁড়াল কংকর। ডু থেকে নেমে পড়ল ডাক্তার। কংকরের পিছু পিছু ডু-র পিছন দিকে চলে এল সে।

'আশা করা যায় নিরাপদেই পৌঁছুতে পাবব আমরা, কি বলেন?'

পিছন ফিরে ডাক্তারের দিকে তাকাল না কংকর, বলল, 'নিশ্চয়ই।' সাইলেন্সার খুলে নিল সে, সাথে সাথে তিন গুণ বেড়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। ডাক্তারের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। বলল, 'আপনার

কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো, ম্যাডাম?'

'না-না!' বলল মেয়েটা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল ডাক্তার। দেখল, ডুর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে মেয়েটা। ভুরু কুঁচকে উঠল ডাক্তারের। বলল, 'বাইরে কেন?'

সুড় সুড় করে ডুতে উঠে বসল মেয়েটা। তাকে অনুসরণ করে ডাক্তারও উঠে পড়ল।

'কি করছেন উনি?'

'সাইলেন্সার খুলছেন,' বলল ডাক্তার 'এখন আমরা আরও দ্রুত এগোতে পারব।'

'আচ্ছা!' কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলল মেয়েটা, 'আমি নাত্রাশা এমাডেস্কি।'

'জন এডওয়ার্ডস।'

সীটের ওপর ঘুরে বসল রানা। বৃদ্ধ সেসলভের কোমরে জড়ানো হারনেসটা পরীক্ষা করে দেখল, আগের মতই টান টান হয়ে আছে, ঢিলে-ঢালা ভাব নেই কোথাও। অঘোরে ঘুমাচ্ছেন প্রফেসর, কিন্তু ডু থামাবার ঠিক আগের মুহূর্তে পিছন থেকে একটা আওয়াজ পেয়েছিল রানা, মৃদু একটা কাতর ধ্বনির মত শুনতে লেগেছিল। প্রফেসরের কাঁধে একটা হাত রাখল ও। মৃদু ঝাঁকি দিয়ে ডাকল, 'প্রফেসর?'

বৃদ্ধের ঠোঁট জোড়া নড়তে দেখল না রানা, কিন্তু অস্ফুট আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল, 'উঁ?'

এবার প্রফেসরের দুই কাঁধে হাত রাখল রানা, ঝাঁকি দিল আগের চেয়ে একটু জোরে। 'আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, প্রফেসর?' চোখের পাতা এখনও বুজে রয়েছে, কিন্তু কেঁপে উঠল একটু।

'প্রফেসর?'

'ঘুমাতে দাও...আমাকে ঘুমাতে দাও...'

'ঠিক আছে,' দ্রুত বলল রানা। 'একটু পরই আবার ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি। কিন্তু তার আগে আমার সাথে আপনার কথা বলা দরকার। মনে আছে, আপনি মার্কিন প্রফেসর এডওয়ার্ডের কাছে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলেন?'

কোন সাড়া নেই। এবার চোখের পাতাও কাঁপল না।

'প্রফেসর?' ঝাঁকি দিল রানা।

'উঁ?'

'প্রফেসর ওয়ার্ডের কথা মনে আছে আপনার?'

'কই, ওরা তো কেউ এল না।'

'চোখ খুলতে পারবেন, প্রফেসর?' জানতে চাইল রানা। 'আপনার মেসেজ পেয়েই তো এসেছি আমরা। চোখ মেলুন, তাকান।'

পাতার কাঁপন হঠাৎ বেড়ে গেল! 'কি বললে?'

'আমরা আপনাকে নোভাইয়া জেমলাইয়া স্টেশন থেকে বের করে নিয়ে এসেছি। ফিরতি পথে রয়েছি আমরা।'

প্রফেসরের চোখ দুটো সামান্য একটু ফাঁক হলো, কিন্তু সাথে সাথে আবার বুজে যেতে শুরু করল। 'আমার ঘুম পাচ্ছে···' জড়িয়ে গেল কথাগুলো।

আবার তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল রানা। 'শুনুন, প্রফেসর। বোঝার চেষ্টা করুন। আপনাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রে। ওখানেই তো যেতে চান আপনি, তাই না?'

বিড় বিড় করে বললেন বৃদ্ধ, 'দেশের কাজে লাগতে চাই আমি···'

'দেশের?'

সাড়া নেই।

আবার ঝাঁকি দিল রানা। কিন্তু প্রফেসর সেসলভ আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছেন। ওর ডু-র পাশ ঘেঁষে কংকরকে এগিয়ে যেতে দেখল রানা। নিজের সীটে সিধে হয়ে বসল ও। দেখল, সামনের ডুতে উঠে বসল কংকর। এক মুহূর্ত পর ছুটল কংকরের ডু। অনুসরণ করল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল, ওর পিছনে নিতাই, তার পিছনে ডাক্তার আর বুতেরার ডু অনুসরণ করছে।

গতি এবার শুরু থেকেই বাড়িয়ে দিল কংকর। হালকা চাঁদের আলোয় পথের সামনেটা দেখে নিতে অসুবিধে হলো না তার। যদিও খানিক আগে থেকে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে গেছে, সেই সাথে সাদা মেঘের মত মাতামাতি শুরু করেছে তুষার কণা। ডু-র লাইট জ্বালতে পারলে সুবিধে হত, কিন্তু ঝোঁকটা দমন করতে হলো রানাকে। এরই মধ্যে ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে রাশিয়ানরা, তা হয়তো সত্যি নয়, কিন্তু ওরা যদি কোন প্লেন পাঠিয়ে থাকে, পঞ্চাশ মাইল দূর থেকেও পাইলট দেখতে পাবে আলো।

রিস্টওয়াচের লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বুলাল রানা। সকাল দেড়টা। টোয়াইলাইট শুরু হতে এখনও নয় ঘণ্টা দেরি আছে, কাজেই ঘণ্টায় গড়ে বিশ মাইল এগোতে হবে ওদেরকে। আর বিশ মাইল এগোতে চাইলে ওদের স্পীড হওয়া উচিত ত্রিশ মাইল, কারণ পথে বাধা পড়বেই, এবং তাতে সময়ও নষ্ট হবে।

ড্রাইভিঙে খুব একটা মন দিতে পারল না রানা। মাথার ভেতর অনেক চিন্তা। খানিক পর সময়ের হিসেব ভুলে গেল ও। সংবিৎ ফিরল সামনের ডু হঠাৎ থামতে শুরু করায়।

সামনে বরফের বোল্ডার ছড়িয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে ডু চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দুশো গজ পর আবার সমতল এবং মসৃণ হয়ে গেছে সারফেস। সমস্যার সমাধান প্রথমবারের অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে ওদের, তাই ঘুর পথে জায়গাটা পেরোবার কথা কেউ তুললই না। সবাই জানে, ডুগুলোকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রথমে কংকরের ডু পার করা হলো। তারপর প্রফেসর সেসলভ সহ রানার ডু। এরপর নিতাইয়ের ডু। সবার সাথে ডাক্তারও বয়ে নিয়ে যাবার কাজে হাত লাগাল। দুশো গজের মধ্যে আর যখন পঞ্চাশ গজের মত পেরোতে বাকি আছে, এই সময় ওদের পিছন থেকে ভেসে এল একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ।

আট

দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। তাকাল পরস্পরের দিকে। ফিস ফিস করে বলল ডাক্তার, 'কি··· কিসের আওয়াজ?'

শত-সহস্র খুদে বর্শার মত ওদের কাপড়ে এসে পড়ছে তুষার কণা। চারদিকে বাতাসের মাতামাতি। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করল ওরা, কিন্তু আর কোন শব্দ পেল না। মিনিট খানেক পর আবার ডু নিয়ে হাঁটা দিল সবাই। টুকরো বরফের এলাকা পেরিয়ে এসে নামানো হলো সেটা। সাথে সাথে স্টার্ট দিয়ে ইঞ্জিন চালু করল কংকর। তারপর তাকে নিয়ে ওরা সবাই আবার ফিরে এল ডাক্তারের ডু-র কাছে।

'নামতে হবে তোমাকে,' নাতাশাকে বলল রানা। তারপর ভাবল, বিস্ফোরণের ব্যাপারে ও কিছু জানতে পারে। 'আওয়াজটা শুনেছ?'

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল নাতাশা। 'না তো! কিসের আওয়াজ?'

'কিসের জানি না। খানিক আগে শুনলাম। অনেকটা বজ্রপাতের মত শোনাল।'

মাথা ঝাঁকাল নাতাশা। 'অনেক সময় বরফ এই ধরনের আওয়াজ করে। বরফের গায়ে ফাটল দেখা দেবার সময় একের পর এক বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হতে থাকে।'

'একের পর এক নয়,' বলল রানা। 'একটা।'

'সেসমিক চার্জও হতে পারে। প্রায়ই ওগুলোর বিস্ফোরণ ঘটায় ওরা, ভাইব্রেশন রেকর্ড করার জন্যে। কখন কোথায় বিস্ফোরণ ঘটবে সে-ব্যাপারে সময়ের একটা প্যাটার্ন আছে, টাইমিং মেকানিজমের সাহায্যে অনেক আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। এসব ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব জুনোর।'

'জুনো?'

'স্টীলের গ্লাস পরে সে। আপনি হয়তো তাকে লক্ষ করেননি।'

'সেসমিক চার্জ বা বরফ ছাড়া আর কি হতে পারে?'

চোখ দুটো বড় বড় করে কিছু ভাবল নাতাশা। তারপর বলল, 'আর কিছু হতে পারে না। অন্তত আর কি হতে পারে, বুঝতে পারছি না আমি। হয় বরফ, না হয় সেসমিক চার্জ।'

খানিকটা হলেও, মনে মনে স্বস্তি বোধ করল রানা।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার যাত্রাশুরু করার তাগাদা অনুভব করল সবাই। বাকি ডুগুলো পার করে নিয়ে আসতে বেশি সময় নিল না ওরা। প্রতিটি ডু প্রথম বারের চেষ্টাতেই স্টার্ট দিতে পারল কংকর। নিজেদের মধ্যে আলোচনা না করেও সবাই জানে, দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। সময়ের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে ওরা, তা নয়, কিন্তু অন্ধকারে আলো না জেলে সমস্ত পথটা পাড়ি দিতে হবে ওদের, বাধা পেয়ে থামতে হলে প্রচুর সময় অপব্যয় হয়ে যাবে—শেষ পর্যন্ত হয়তো পিছিয়েই পড়তে

হবে ওদের।

নামমাত্র চাঁদের আলোয় বেশিদূর দেখার সুযোগ নেই, কিন্তু সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে স্নোমোবাইলের স্পীড বাড়িয়েই চলল কংকর। কল্পনার চোখে এক নম্বর ডুতে তার বসে থাকার ভঙ্গিটা দেখতে পেল রানা। সীটের পিঠে হেলান দিয়ে আছে সে, মনোযোগ দিয়ে ড্রাইভিং করার সময় তাই দেয়। চোখে পলক নেই, তাকিয়ে আছে সোজা সামনের দিকে। শরীরের সমস্ত পেশী ঢিল হয়ে আছে, দেখে বোঝার উপায় নেই এই লোক কী সাংঘাতিক ক্ষিপ্র। মুখে মৃদু হাসি থাকবে। হঠাৎ দেখে বোঝা যায় না, এতই ক্ষীণ, কিন্তু থাকবে।

ড্রাইভিঙে তেমন মনোযোগ নেই ডাক্তারের। কনভয়ের এখনকার গতি পঁয়ত্রিশের কম নয়, নোভাইয়া জেমলাইয়া আর ওদের মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত বেড়েই চলেছে। স্বস্তি আর নিরাপদ বোধ করল ডাক্তার। এতক্ষণে বিশ্বাস হচ্ছে, আর কোন বিপদ বা বাধার সামনে পড়তে হবে না মিশনকে। পিছন থেকে মাঝে মধ্যে এটা সেটা জিজ্ঞেস করল নাতাশা, উত্তর দিতে গিয়ে ড্রাইভিঙের ওপর থেকে মনোযোগ হারিয়ে ফেলল সে। ঠিক এই রকম একটা মুহূর্তে সামনের ডুটা আচমকা মস্ত এক লাফ দিয়ে কাত হয়ে পড়ল ডান দিকে। অসতর্ক ছিল বলেই নিজের ডু সময় মত থামাতে পারল না ডাক্তার। ইঞ্চি কয়েকের জন্যে নিতাইদের উল্টে পড়া ডু-র সাথে সংঘর্ষটা এড়িয়ে যেতে পারল বটে, কিন্তু সেটা ড্রাইভিঙে দক্ষতার জন্যে নয়, ভাগ্যের জোরে। ডু থামতেই এক ঝটকায় দরজা খুলে নিচে নামল, ছুটল পিছন দিকে।

নিতাইয়ের মাথা ঠুকে গেছে, থেঁতলে গেছে শরীর, কিন্তু গায়ে মোটা কাপড় থাকায় মারাত্মক ভাবে জখম হয়নি কোথাও। উল্টে পড়া ডু থেকে তাকে বের করতে বেশ খানিক সময় লাগল ওদের। সর্বনাশ হয়েছে অন্য দিকে। ডুটা গেছে। একটা স্টিয়ারিং স্কি নিশ্চয়ই বরফের ওপর মাথাচাড়া দিয়ে থাকা শক্ত কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়েছিল, বেঁকে গিয়ে ট্র্যাকের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে সেটা। ট্র্যাকটাও প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেছে। স্টিয়ারিঙে খুঁত থাকলে অক্ষত একটা মাত্র ট্র্যাক মাইল কয়েকের বেশি যেতে পারবে না, পথে কোথাও ছিঁড়ে যেতে বাধ্য।

'পোলার ভালুকদের জন্যে রেখে যেতে হবে এটা,' রাগের সাথে বরফে পা ঠুকে বলল কংকর।

'তার মানে গেল আর একটা!' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'নিতাই?'

'ইয়েস বস্?'

'তুমি ও. কে.?'

এক গাল হাসল জাপানী দৈত্য। 'কিস্যু হয়নি আমার, বস্। বহাল তবিয়তে আছি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কংকরের সাথে উঠে বসো।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল ও, 'সাবধান। আর একটা ডু হারালে অন্তত একজনকে স্কি-তে চড়তে হবে।'

ওদের কারও সাহস হলো না বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। বাতাসের উল্টোদিকে নয়, বাতাসের সাথে এগোবে দলটা, সেটাই রক্ষে! কিন্তু আর্কটিকের

উপযোগী সমস্ত কাপড় এবং ইকুইপমেন্ট ভেদ করে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ধারাল দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে ওদের গায়ে। এই পরিস্থিতিতে কাউকে যদি স্কি-তে চড়তে হয়, তাকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয়ারই নামান্তর হবে সেটা।

'ফুয়েল···কার কি অবস্থা?' জানতে চাইল কংকর।

'অবস্থা যাই হোক,' বলল রানা, 'ট্যাংকে কয়েক গ্যালন করে ভরে নাও সবাই। বলা তো যায় না, যদি দরকার লাগে!'

পাঁচ মিনিটেই সারা গেল কাজটা। প্রত্যেকটা ডুতে চার গ্যালন করে ফুয়েল ভরা হলো। অতিরিক্ত আরও প্রায় ঘণ্টা তিনেক ছুটতে পারবে স্কি-ডুগুলো।

আবার রওনা হলো ওরা। সময় তো যা নষ্ট হবার হয়েছেই, হাতে আছে আর মাত্র চারটে স্নোমোবাইল। এ-থেকে আর একটা যদি কমে যায়, সত্যিকার বিপদে পড়ে যাবে মিশন। এদিকে স্পীডও না বাড়ালে নয়। নোভাইয়া জেমলাইয়াকে মাত্র চল্লিশ মাইল পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। কোন হিসেবেই যথেষ্ট নয়। আবার রওনা হবার আগে রিস্টওয়াচ দেখে নিল রানা। সাড়ে তিনটে। সাত ঘণ্টায় দেড়শো মাইলের মত পাড়ি দিতে হবে। আর কোন বাধার সামনে পড়ার উপায় নেই ওদের।

মিশনের সাফল্য এখন অনেকটাই নির্ভর করছে কংকরের ওপর। একে তেমন আলো নেই, তার ওপর তুমুল তুষার ঝড়, যতটা না চোখে দেখে তারচেয়ে আন্দাজের ওপর নির্ভর করে ডু চালাতে হলো তাকে। গতি কমাবে সে উপায় নেই তার। রানার নির্দেশ, সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে দলটাকে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে হবে। কংকর গতি কমালে গোটা মিশন পিছিয়ে পড়বে। এই গুরু দায়িত্ব রানা ছাড়া আর এক শুধু কংকরের পক্ষেই পালন করা সম্ভব। ক্ষিপ্রতা, অসম-সাহস, ইঞ্জিনের মেকানিজম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ইত্যাদি অনেক গুণ রয়েছে কংকরের, সেজন্যেই তার ঘাড়ে দায়িত্বটা চাপাতে সাহস পেয়েছে রানা। দুটো কারণে সামনের ডুতে ও নিজে থাকেনি। সেসলভের ওপর নজর রাখতে হবে ওকে। এবং কনভয়ের মাঝখানে বা লেজের দিকেও একটা চোখ রাখা দরকার। সামনের ডুতে থাকলে সেসলভকে নিজের সাথে রাখতে পারত না ও। রাখলে মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যেত।

চোখের পলকে তুষার কণায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে উইন্ডস্ক্রীন, ওয়াইপারের ব্লেড ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করছে সাথে সাথে। খানিক পরপরই নিজের ডান দিকে তাকাল ডাক্তার। সেদিকে ওর পাশেই রয়েছে বুতেরা আর মিলটনের ডু-টা।

পরবর্তী দু'ঘণ্টায় দুটো ছোট প্রাচীর আর অগভীর দুটো ফাটলের সামনে পড়ল ওরা। ফাটল দুটোকে পাশ কাটানো সম্ভব হলো। কিন্তু প্রাচীর দুটো টপকাতে হলো পায়ে হেঁটে। ডুগুলোকে বয়ে নিয়ে আসার সময় বন্ধ করতে হলো ইঞ্জিন। আবার স্টার্ট নেবে কিনা সে-ব্যাপারে সবাইকে থাকতে হলো উৎকণ্ঠায়। প্রতিবার ইঞ্জিনগুলো প্রথম বারের চেষ্টায় স্টার্ট নিল দেখে স্বস্তির হাঁফ ছাড়ল সবাই। কোন বিপদ ঘটল না বটে, কিন্তু সময়ের দিক থেকে আরও খানিকটা পিছিয়ে পড়ল ওরা। সেটা পুষিয়ে নেবার জন্যে তুষার-ঝড়কে তোয়াক্কা না করে স্পীড ক্রমশ বাড়িয়েই

চলল কংকর।

এই দু'ঘণ্টায় ষাট মাইল এগোল ওরা। রানার নির্দেশে বীকন সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল কংকর। অন্ধকার তো আছেই, তার ওপর তুষার ঝড়েরও থামার কোন লক্ষণ নেই, তাছাড়া এদিকের সারফেসও এই খানিক দূর সমতল, তারপরই এবড়োখেবড়ো, ঘণ্টায় বিশ মাইল স্পীড তোলাই যেখানে বিপজ্জনক সেখানে পঁয়ত্রিশের নিচে একবারও নামল না কংকর। স্নোমোবাইলগুলো হালকা, সেটা আলাদা এবং অতিরিক্ত একটা হুমকি হয়ে দেখা দিল। ঝড়টা অনবরত পিছন থেকে ধাক্কা দিল ওদেরকে, কোন ফাটল বা ঢালকে পাশ কাটাবার জন্যে যখনই ডান অথবা বাঁ দিকে ঘুরল ওরা তখনই উল্টে পড়ার উপক্রম করল ডুগুলো। অবশ্য এই পরিস্থিতি বেশিক্ষণ থাকল না ধীরে ধীরে শ্লথ হয়ে এল তুষার ঝড়ের গতি। তাতে করে ঝুঁকির পরিমাণ কমল, তা নয়। কারণ ঝড় থামার সাথে সাথে স্পীড আরও একটু বাড়িয়ে দিল কংকর। তবে ঝড় না থাকায় মনে হলো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আগের চেয়ে একটু কমেছে, মিথ্যে হলেও এই অনুভূতি খানিকটা স্বস্তি এনে দিল সবার মধ্যে। টোয়াইলাইট শুরু হবার আগে ওদের সামনে আরও সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা অন্ধকার রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে প্রায় একশো মাইলের মত পাড়ি দিতে হবে। নোভাইয়া জেমলাইয়া বা অন্য কোন রাশিয়ান এলাকা থেকে শ'খানেক মাইল দূরে রয়েছে ওরা, কাজেই খুব একটা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠার কারণ নেই। এখন শুধু ওদেরকে সোজাসুজি সঠিক দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

সাড়ে পাঁচটার দিকে কফি খাবার জন্য থামল রানা। আর্কটিক আইস-প্যাকের যেখানে রয়েছে ওরা সেখান থেকে চারদিকে শ'খানেক মাইলের মধ্যে কোথাও কোন রকম বসতি নেই, কাজেই কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেবার মধ্যে কোন ঝুঁকি আছে বলে মনে হলো না।

সবার সাথে ডু থামাল ডাক্তারও, নাতাশাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমার পিছনে ফ্লাস্ক আছে, দু'জনের জন্যে কফি ঢালো।'

কফি শেষ করে ডু থেকে নেমে পড়ল ডাক্তার। এই সুযোগে সেসলভকে একবার পরীক্ষা করতে চায়। ডাক্তারকে আসতে দেখে নিজের ডু থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেল রানা, ডাক্তারের দিকে পিছন ফিরে কথা বলতে শুরু করল কংকরের সাথে। উইন্ডস্ক্রীনের দিকে পিছন ফিরে রানার সীটে বসল ডাক্তার। হারনেসের সাথে বাঁধা বৃদ্ধ সেসলভ এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। এই অবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি ঘাড়ে এবং কোমরে ব্যথা পাচ্ছেন, অথচ তাতেও তাঁর ঘুম ভাঙছে না, একটু অবাকই হলো ডাক্তার। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। প্রফেসর সেসলভ ঘামছেন না, ডায়াবেটিক কোমারও কোন লক্ষণ নেই, শ্বাস-প্রশ্বাসও নিয়মিত। পালস্ দেখল ডাক্তার, স্বাভাবিক। অনুমান করল, যে-কোন মুহূর্তে তাঁর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তবে, প্রথমবার ঘুম ভাঙলেই যে ওষুধের প্রভাব কেটে যাবে তা নয়। সেসলভ আবার হয়তো লম্বা সময়ের জন্যে, অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।

রানার ডু থেকে নেমে এল ডাক্তার, দেখল, কয়েক ফিট পিছনে চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাতাশা।

'স্যার কেমন আছেন, ডাক্তার?'

'উনি কি প্রায়ই এই রকম একটানা ঘুমান?'

একটু ইতস্তত করল নাতাশা। 'বারণ করলে শোনেন না, এক সাথে অনেকগুলো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেন...'

'কেন?'

'কারণ...' বিষণ্ণ একটু হাসল নাতাশা। '...জীবন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কিভাবে পালানো যায়, তাই নিয়ে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ভাবনা-চিন্তা করতেন। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন অথচ ঘুমাতে পারতেন না তখন ট্যাবলেট খেতেন।'

'হুঁ।'

'স্যারের ঘুম ভাঙানো একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার জন্যে। খাবার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর পাশে বসে থাকতে হয়েছে আমাকে...'

'ইনসুলিন? কখন নিতেন?'

'খাবার পর। অফিসে। নিজেই ইঞ্জেকশন নিতেন। তিনি ডায়াবেটিক, কাউকে জানতে দিতে চাইতেন না।'

'সময়টা?'

'সকাল ন'টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলতেন, ইঞ্জেকশন নিতেন সাড়ে দশটার দিকে। তারপর আবার শোয়ার সময়, এই রাত দশটার দিকে।'

আরও অনেকগুলো প্রশ্ন করল ডাক্তার। উত্তর যা পেল, বুঝল, সেসলভ শারীরিক দিক থেকে তেমন কোন বিপদের মধ্যে নেই। নিজেদের ডুতে ফিরে এল ওরা। ইতোমধ্যে বাকি সবাইও যে যার ডুতে উঠে বসেছে। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে বাইরে তাকাল ডাক্তার। দেখল, রওনা হবার জন্যে কংকরকে সিগন্যাল দিল রানা। সাথে সাথে সচল হলো কংকরের ডু। পরমুহূর্তে সেটাকে অনুসরণ করল রানা। ডান দিকে তাকাল ডাক্তার, তারই সাথে ডু ছাড়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে বুভেরা আর মিলটন। বোতামে চাপ দিল ডাক্তার। এক গজের মত এগোল ডু, কান ঝালাপালা করা ভয়ঙ্কর একটা কর্কশ ধাতব শব্দের সাথে ঝাঁকি খেল ওরা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ডাক্তার। কিন্তু তাকে কিছু করতে হলো না, আপনা থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ল ডু।

আওয়াজটা ডু-র তলার দিক থেকে এসেছে। কারণটা বুঝতে না পারলেও, ডাক্তার উপলব্ধি করল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর সবাইকে সাবধান করার জন্যে ওয়ার্নিং লাইটটা দু'বার জ্বালল সে। সবাই বাঁক নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকল ডুতে। তারপর কংকর আর রানাকে যার যার ডু থেকে নামতে দেখে সে-ও নেমে পড়ল।

'কি ব্যাপার, ডাক্তার সাহেব?' জানতে চাইল কংকর। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটছে সে, ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় ট্র্যাকে কিছু...'

'হাত লাগান আমার সাথে, কাত করুন,' কংকরের সাথে ডাক্তার আর রানা ডু-র গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিতে শুরু করল। বরফের গা থেকে ধীরে ধীরে

ওপরে উঠল ডান দিকের ট্র্যাক। হাঁটু গেড়ে বসল কংকর, পেন্সিল টর্চ জ্বেলে উঁকি দিল ডু-র নিচে।

কি করছে কংকর, বোঝা গেল না। ওরা দেখল, কিছু একটা ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করছে সে, টানাটানি করছে। দাঁতে দাঁত চাপল, হুঁক করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল নাকের ভেতর থেকে, গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে টেনে বের করে আনতে চাইল। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল সে, সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'ইউ ব্লাডি ফুল!' রাগে লাল হয়ে উঠেছে কংকরের চেহারা। 'বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন!'

ঢোক গিলল ডাক্তার। 'মানে?'

'আপনার মুণ্ডু!' খেঁকিয়ে উঠল কংকর। তাকাল রানার দিকে। 'ভেতরে আইস অ্যাক্স সেঁধিয়ে গেছে।'

'আইস-অ্যাক্স?' বোকা বোকা দেখাল ডাক্তারকে। 'সেটা তো এখানে রয়েছে।' ডু-র কেবিনের গায়ে একটা র‍্যাক আছে, ওখানেই মেটাল লূপের সাথে ঝুলে থাকার কথা আইস অ্যাক্সের। সেদিকে তাকাল ডাক্তার।

'নেই,' বলল কংকর। 'ডু কাত করে নিচু হলে দেখতে পাবেন, রোলার মেকানিজমের সাথে গেঁথে আছে ওটা। ছাড়ানো সম্ভব নয়, চারদিক থেকে জড়িয়ে রেখেছে বাঁকা ইস্পাত।'

'কিন্তু আমি তো বুঝতেই পারছি না কিভাবে...'

'কিভাবে, তাই না?' বলল কংকর। 'কেবিন থেকে বেরুবার সময় কাঁধের ধাক্কায় র‍্যাক থেকে ফেলে দেন ওটা। তারপর আপনাদের কারও বুটের টোকা খেয়ে ট্র্যাক মেকানিজমের ভেতর গিয়ে ঢোকে।'

'তা কি করে হয়? আমি কি এতই বেখেয়াল যে...

'কতটুকু বেখেয়াল তার প্রমাণ তো হাতেনাতেই পাওয়া যাচ্ছে। আর যাই করুন, ডাক্তার, জীবনে কখনও আমার শরীরে অপারেশন করবেন না! আপনার মত ডাক্তাররাই ভুল করে ভেতরে ফরসেপ রেখে পেট সেলাই করে।' রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল কংকর, তারপর আবার ফিরে এল। 'আশা করি স্কি চড়তে ভালই লাগবে আপনার!'

অপরাধবোধে জর্জরিত হতে থাকল ডাক্তার এডওয়ার্ডস, সেই সাথে ভাবতে চেষ্টা করল এই রকম একটা জঘন্য ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারল তার দ্বারা? শুধু দৈনন্দিন জীবনে নয়, সব ব্যাপারেই অত্যন্ত সচেতন সে। কেউ তাকে কখনও অগোছাল বা বেখেয়াল বলে গালি দেয়নি। ঘটনাটা যে কিভাবে ঘটল, ভাবতে গিয়ে কোন সমাধান পেল না সে।

'ঠিক আছে,' চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল ডাক্তার। 'আমি স্কি চড়েই যাব।'

'দু'জনকে চড়তে হবে,' বলল রানা। ডাক্তারের ওপর যদি চটেও থাকে, ওর চেহারা দেখে সেটা বোঝা গেল না।

'একজন আমি,' বলল ডাক্তার। 'স্কি আমি ভালই চালাই।'

'আরেকজন কে?' বলল বুতেরা। রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনার কথা ওঠে না। মিশনের স্বার্থেই এই রকম একটা ঝুঁকি লীডারকে আমরা নিতে দিতে পারি না।'

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ছিল রানা, মৃদু গলায় বলল, 'প্রফেসরের ওপর নজর রাখতে হবে আপনার। কাজেই আপনি স্কি-তে চড়ছেন না।'

'না, প্লীজ, মি. রানা,' তাড়াতাড়ি বলল ডাক্তার। 'আপনি বাধা দেবেন না। ভুলটা আমার হয়েছে, মাশুলও আমারই দেয়া উচিত।'

ডাক্তারের কথা কানে তুলল না রানা। 'নিতাই আর মিলটন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল স্কিয়ার,' বলল ও। 'ওরা স্কি-তে চড়ে যাবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে এক নম্বর ডুর দিকে এগোল ও। দুঃসংবাদটা দিতে হবে নিতাইকে।

জাপানী দৈত্য আগেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছে, ঝুঁকে পড়ে স্কি-র স্ট্র্যাপ খুলতে শুরু করে দিয়েছে সে। নাইলনের টোয়িং লাইন ডু থেকে বের করে ক্লিপ দিয়ে পজিশনে আটকে দেয়া হলো।

ঠিক হলো প্রফেসরের সাথে রানার জায়গায় থাকবে ডাক্তার। বুতেরা চলে যাবে সামনেরটায়, কংকরের ডুতে। মিলটন আর বুতেরার ডু খালি হয়ে গেল, তাতে নাতাশাকে নিয়ে থাকবে রানা। মিলটনকে টো করবে ডাক্তারের ডু। আর নিতাইকে টো করে নিয়ে যাবে রানার ডু।

ডাক্তারকে বলল রানা, 'সব পরিষ্কার? সামনে কংকর, কংকরের পেছনে আপনি, আপনার পেছনে লাইনের শেষ মাথায় মিলটন, মিলটনের পেছনে আমি, আমার পেছনে লাইনের শেষ মাথায় নিতাই।'

'আপনি মিলটনের সরাসরি পেছনে থাকবেন, নাকি একদিকে একটু সরে থাকবেন?' জানতে চাইল ডাক্তার।

'ঠিক পেছনে থাকব।'

'কিন্তু···আপনাদের জন্যে সেটা ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে না, মি. রানা?'

শান্তভাবে বলল রানা, 'গুণতিতে আমরা বেড়েছি। এরপর আমরা কোন অবস্থাতেই আরেকটা ডু হারাবার ঝুঁকি নিতে পারি না। আপনি কংকরের ডু অনুসরণ করবেন, আমিও ব্লাডহাউন্ডের মত আপনার ডু অনুসরণ করব। ডানে-বাঁয়ে কোন দিকেই এক ইঞ্চি সরব না আমরা, পরিষ্কার?'

ধীরে ধীরে মাথা কাত করল ডাক্তার। ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে কংকরের সাথে কথা শুরু করল রানা। পিছন থেকে নাতাশার গলা শুনতে পেল ও।

ডাক্তারকে বলল নাতাশা, 'কাজটা আমার দ্বারাও হয়ে থাকতে পারে।'

'মানে?' দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল ডাক্তার।

'ডু থেকে নামার সময় হোঁচট খেয়েছিলাম আমি—মনে আছে আপনার?'

হ্যাঁ, মনে পড়ল ডাক্তারের। পা পিছলে গিয়েছিল নাতাশার, ডু-র গায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে বসে পড়েছিল বরফের ওপর। 'আপনি কি র‍্যাকের সাথে ধাক্কা খেয়েছিলেন?'

টপ টপ করে দু'ফোঁটা পানি পড়ল নাতাশার আনত চোখ থেকে। 'লক্ষ করিনি! বোধহয় না। পড়ে যাওয়াটা ঠেকাতে ব্যস্ত ছিলাম, আর কোন দিকে খেয়াল

ছিল না। আমি দুঃখিত, ডাক্তার। মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার। নিশ্চয় আমার দোষেই...'

নাতাশার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুহূর্তটা স্মরণ করতে পারল ডাক্তার। 'প্রথম আমি বেরিয়েছিলাম; তারপর এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিলাম আপনি যাতে বেরুতে পারেন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে যেই মাথা উঁচু করলেন, অমনি পিছলে গেল আপনার পা। আপনি পড়ে গেলেন, আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলাম। উঁহুঁ,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'আপনি আইস-অ্যাক্সের কাছে ছিলেন না। ছিলাম আমি। ঠিক পাশেই।' চেহারাটা লাল হয়ে উঠল তার। 'সম্ভবত আমার দস্তানার টেপ বা লূপের সাথে আটকে গিয়েছিল আইস-অ্যাক্সটা। বরফে পড়ল, অথচ কোন আওয়াজই পাইনি—আশ্চর্য!'

কংকরের সাথে কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ডাক্তারের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে এল ও। রানার দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে গেল ডাক্তারের। নিঃশব্দে চলে গেল সে। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা আর নাতাশা। প্রফেসরের ডুতে গিয়ে চড়ল সে।

নাতাশার দিকে ফিরল রানা। ইঙ্গিতে ডুতে চড়তে বলল তাকে তার পিছু পিছু রানাও চড়ল ডুতে। বলল, 'যা ঘটার ঘটে গেছে, তাই নিয়ে দুঃখ করলে কোন লাভ নেই। কার দোষ সেটা বড় কথা নয়, ঘটনাটা ঘটায় মিলটন আর নিতাইকে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। তুমি পিছন দিকে তাকিয়ে বসো, পিছনের জানালা দিয়ে সারাক্ষণ নজর রাখবে নিতাইয়ের ওপর। যদি কিছু ঘটে, তা সে যাই হোক না কেন, সাথে সাথে জানাবে আমাকে।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল নাতাশা। সীটের ওপর ঘুরে পিছনের জানালার দিকে মুখ করে বসল সে। 'আমি রেডি।'

লাল আলো জেলে সিগন্যাল দিল রানা। সাথে সাথে কংকরের ডু চলতে শুরু করল। তারপর ডাক্তারেরটা। টান পড়ল রশিতে, স্কিতে দাঁড়িয়ে থাকা মিলটন সামনে এগোল। হাঁটু দুটো বেঁকে আছে তার, শরীরটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, দস্তানা পরা হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে আছে টো বার। সন্তর্পণে সামনে এগোল রানা। 'ঠিক আছে ও?'

'ইয়েস,' বলল নাতাশা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা। জানালা দিয়ে নিতাইকে দেখা গেল বাইরে, টো লাইনের শেষ মাথায়।

রানার সামনে, ডাক্তারের পিছু পিছু সাবলীল ভঙ্গিতে স্কি করছে মিলটন। ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়ল রানা, ওর স্নোমোবাইল আর স্কিতে চড়া মিলটনের মাঝখানে ব্যবধান রাখল বিশ গজের মত। এমনিতেই যথেষ্ট বিপদ আর কষ্টের মধ্যে আছে বেচারা মিলটন, তার মধ্যে হঠাৎ যদি পড়ে যায়, খুব কাছাকাছি থাকলে ডু থামাবার আগেই তাকে চাপা দিয়ে বসবে রানা।

ধীরে ধীরে স্পীড বাড়িয়েই চলল কংকর। কিন্তু কারও আর জানতে বাকি নেই যে এখন আর ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের প্রশ্ন ওঠে না। অনুকূল পরিস্থিতি এবং আবহাওয়ায়, সমতল মসৃণ বরফে, দিনের বেলা সত্যিকার একজন দক্ষ স্কিয়ার কিছুক্ষণের জন্যে ওই গতি বজায় রাখলেও রাখতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়

মিলটন আর নিতাইয়ের কাছ থেকে সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। বাড়তে বাড়তে পঁচিশ মাইলে উঠল কংকর, তাতেই স্থির করে রাখল গতি।

মিনিট পাঁচেক পর জানতে চাইল রানা, 'ঠিক আছে?' নাতাশা বলল, হ্যাঁ। পিছনে নিতাইয়ের দিকে চোখ রেখেছে সে, রানা নজর রেখেছে সামনে মিলটনের ওপর। পিছনের সীটে প্রফেসর থাকায় মিলটনকে চোখে চোখে রাখার কোন উপায় নেই ডাক্তারের।

'ঠিক আছে, নাতাশা?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, নাতাশা?'

'হ্যাঁ।'

'পিছনে ফ্লাস্ক আছে, দু'কাপ কফি ঢালো,' বলল রানা। 'ঘুম তাড়াতে কাজে লাগবে।'

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল নাতাশা, কাপটা নিল রানা। ঠিক আছে? জানতে চাইল রানা। হ্যাঁ। বলল নাতাশা।

মাঝে মধ্যে নিজেও ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। টো লাইনের শেষ প্রান্তে স্কির ওপর প্রকাণ্ড একটা শ্বেত ভালুকের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল নিতাইকে। তারপর আবার ফিরল সামনের দিকে, চোখ রাখল মিলটনের ওপর, দেখে নিল ওর ডু নরওয়েজিয়ানের স্কির তৈরি পথটা ঠিক ঠিক অনুসরণ করছে কিনা। বিশেষ করে এ-ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকার দরকার আছে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকায় চোখ দুটো জ্বালা করতে শুরু করল রানার। তারপর লক্ষ করল, মাঝেমধ্যে মনোযোগ ছুটে যাচ্ছে তার।

ক্লান্ত আর দুর্বল লাগল নিজেকে ওর। চট করে একটা হিসেব বেরিয়ে এল মন থেকে, ওরা সবাই একটানা আটাশ ঘণ্টা জেগে আছে। সুস্থ সবল একজন মানুষের জন্যে আটাশ ঘণ্টা জেগে থাকা তেমন কিছু নয়, কিন্তু পুরো সময়টা টেনশন আর গভীর মনোনিবেশের মধ্যে কাটাতে হলে তার সমস্ত শক্তি তো নিঃশেষ হয়ে আসবেই।

'ঠিক আছে, নাতাশা?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ পর পরই হঠাৎ করে ঝাপসা হয়ে এল রানার দৃষ্টি। সেই সাথে প্রায়ই মনোযোগ হারিয়ে ফেলল। এখন আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সচেতন থাকতে পারছে না, নিজেকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হলো—নাতাশার কাছ থেকে খবর নিতে হবে নিতাইয়ের, মিলটনের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরানো চলবে না।

দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। রানা বুঝল, ওর নড়াচড়া, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি শ্লথ হয়ে পড়ছে। এক সময় আবিষ্কার করল, মিলটনের দিকে নয়, উইন্ডস্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। কখন থেকে কে জানে ওয়াইপারের একটা ব্লেড সম্মোহিত করে ফেলেছে ওকে, অনবরত সেটাকেই অনুসরণ করছে ওর দৃষ্টি। জোর করে ওয়াইপার থেকে চোখ সরিয়ে মিলটনের দিকে তাকাল ও। তারপর যখন বুঝল, মিলটন নিরাপদেই আছে, নাতাশাকে জিজ্ঞেস করে নিতাইয়ের খবর

জেনে নিল।

'ঠিক আছে, নাতাশা?'

'হ্যাঁ।'

কংকরের কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করল রানা। কে জানে তার কি অবস্থা! ক্ষিপ্র সন্দেহ নেই, তার একাগ্রতাও তুলনা হয় না, কিন্তু ক্লান্তির সাথে আর কতক্ষণ লড়তে পারবে সে? সামনের দৃশ্য কখনও বদলায় না, চাঁদের আলোয় যতদূর দেখা যায় শুধু সাদা আর সাদা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, চওড়া একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। ঠাণ্ডা হিম সাদা একটা টানেল। দরজাটা খোলা দেখল রানা। নিশ্চয়ই কনুই লেগে খুলে গেছে ক্যাচটা।

আবার ঝিমুনির একটা ভাব গ্রাস করতে যাচ্ছে রানাকে। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে শুরু করল, ঠিক এই সময় মনে পড়ল কথাটা—বেনজিড্রিন! ডাক্তারের ব্যাগে আছে, হাতটা লম্বা করে দিয়ে আলোর বোতামে দু'বার চাপ দিল ও। সামনের ডু দুটো থামতে শুরু করল। ঢিল পড়ল মিলটনের টো লাইনে, ধীর গতিতে ডাক্তারের ডুর পাশে গিয়ে থামল সে।

'বেনজিড্রিন কাজে লাগবে, নাতাশা,' বলল রানা।

পরিচিত শব্দ, 'হ্যাঁ' শোনার জন্যে কান খাড়া করে আছে রানা। তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করল ও, কিন্তু অপেক্ষাই সার হলো। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

'নাতাশা।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্কের শিহরণ। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল পিছন দিকে। 'নাতাশা!'

চোখ বুজে ঝিমাচ্ছিল নাতাশা, একবার উঁ করে উঠে চোখ খোলার চেষ্টা করল, তারপর আবার ঝিমাতে লাগল।

এক ঝটকায় দরজা খুলল রানা, ছিটকে বেরিয়ে এল ডুর বাইরে। হিম বাতাসের ধাক্কা লাগল শরীরে। পারকা হুডের ভেতর দিয়ে পিছনে তাকাল ও। ডু-র পিছনে এখনও ঝুলছে লাইনটা, কিন্তু ঢিলে ভাবে। সেটা ধরে এগোল ও। বরফের ওপর থেকে হাতে উঠে এল টোয়িং হ্যান্ডেল।

নিতাইয়ের কোন চিহ্ন নেই কোথাও।

নয়

ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। ক্রমশ সরু হতে হতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে পথটা, ওই পথেরই কোথাও আছে হিরোমিচি নিতাই। দশ মিনিট হয়ে গেল স্কি-তে চড়ে তাকে খুঁজতে গেছে কারজো বুতেরা।

'আমারই ভুল,' পাশে দাঁড়ানো কংকরের দিকে ফিরে মৃদু গলায় বলল রানা। 'নাতাশা ঘুমিয়ে পড়তে পারে সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল। বেনজিড্রিনের কথা মনে না পড়লে এখনও হয়তো জানতে পারতাম না ব্যাপারটা।'

নিঃশব্দে নিজের ডুতে ফিরে গেল ডাক্তার এডওয়ার্ডস। একটু পরই আবার

দেখা গেল তাকে, সবাইকে দুটো করে বেনজিড্রিন ট্যাবলেট দিল সে। ট্যাবলেট দুটো মুখে পুরে ডাক্তারের ডু-র দিকে এগোল রানা। দেখল, ঘুমন্ত সেসলভের মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে নাতাশা।

'কেমন আছেন প্রফেসর?' জানতে চাইল রানা।

মুখ তুলল নাতাশা। নীল চোখে উদ্বেগ। 'কখন যে ভাঙবে এই ঘুম!'

পেটে বেনজিড্রিন পড়ায় মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে রানার। 'সরো তো, দেখতে দাও আমাকে।' সেসলভকে পরীক্ষা করল ও। পালস্ ঠিক আছে। ঘামছেন না। অসুস্থতার অন্য কোন লক্ষণও দেখা গেল না। তাঁর খাবার সময় হতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি, ইনসুলিন নেয়ার সময় হবে তিন ঘণ্টা পর। 'চিন্তার কিছু নেই। চলো, ডুতে বসিয়ে দিয়ে আসি তোমাকে।'

রানার সাথে নিজেদের ডু-র কাছে ফিরে এল নাতাশা। পথে কোন কথা হলো না। ডুতে চড়ল, হঠাৎ থেমে রানার দিকে তাকাল সে। 'কেউ যদি রাগারাগি করত বা গালি দিত তাহলে হয়তো মনটা হালকা হয়ে যেত আমার!' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল সে।

নাতাশার হাত ধরে তাকে ডুতে তুলে দিল রানা। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ফিরে এল বাকি সবার কাছে। ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই।

'একটা ডু নিয়ে দেখে আসতে পারি না কেউ?' জানতে চাইল ডাক্তার।

জবাব এল কংকরের কাছ থেকে, 'পিছনে নয়, ডুর কাজ সামনে এগোনো। তাছাড়া, বুতেরাকে পাঠাবার পর আর কাউকে পাঠাবার দরকার করে না। অন্ধকারে আমাদের সবার চেয়ে ভাল দেখতে পায় সে।'

'কিন্তু ডুর আলোতে অনেক দূর...'

'না,' ডাক্তারকে থামিয়ে দিয়ে বলল কংকর। 'আলো জ্বালার ঝুঁকি আমরা নেব না। তাছাড়া ডু পাঠানো মানে সেটাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা—মি. রানা তাতে রাজি নন।' বোঝা গেল, এসব ব্যাপারে তার সাথে আগেই কথা হয়েছে রানার।

পনেরো মিনিট কেটে গেল। বিশ মিনিট। কেউ এক চুল নড়ল না। বেনজিড্রিন খাওয়ার পর অস্বাভাবিক সচেতন হয়ে উঠেছে সবাই। শীতের কামড় অসহ্য লাগল, কিন্তু ডুতে ফিরে যাবার কথা তুলল না কেউ। পা আর হাত অসাড় হয়ে এল ওদের। রানার দিকে আড়চোখে তাকাল ডাক্তার। বরফের ওপর যেন একটা বোল্ডার মাথাচাড়া দিয়ে আছে। বুতেরা যে-পথে ফিরে আসবে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে ও। ডাক্তার ভাবল, ও রানা বলেই নিতাই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু না জেনে নড়বে না, কিন্তু ও লীডার বলে নিতাইয়ের খোঁজে পিছন দিকে যাবে না।

বুতেরার ফিরে আসার পথে ক্ষীণ একটু নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। মনে হলো, কিছু একটা আছে ও দিকে, পরমুহূর্তে মনে হলো, না, চোখের ভুল। তারপর অন্ধকারের ভেতর সত্যিই কি যেন নড়ে উঠতে দেখল ওরা। নড়াটা ধীরে ধীরে একটা রেখা, তারপর একটা কাঠামো পেল। তারপর স্থির ওপর দেখা গেল বুতেরাকে তীরবেগে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

নড়ে উঠল বোল্ডার, পা বাড়াল সামনে। কাছে এসে থামল বুতেরা। জানতে চাইল রানা, 'বলো?'

'মারা গেছে,' গম্ভীর থমথমে হয়ে আছে বুতেরার চেহারা, চোখ দুটো কঠোর। 'নিশ্চয়ই কিছুর সাথে ঠোকর খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।'

'মারা গেছে—ঠিক জানেন?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল ডাক্তার।

ডাক্তারের চোখ ভেদ করে বুতেরার দৃষ্টি যেন ভেতরে ঢুকে গেল। 'মারা গেছে। ঠাণ্ডায়।' তার পিঠে আড়াআড়ি ভাবে একটা স্কি ঝুলছে, সেটা টেনে সামনে নিয়ে এল। 'দেখুন।'

সবাই দেখল ওরা। তারপর পরস্পরের দিকে তাকাল। নিতাইয়ের স্কি এটা, সোলের ওপর কাঠের গভীর একটা দাগ রয়েছে, ফেটে গেছে দাগের কিনারা

'কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড ইতস্তত করল বুতেরা, তারপর বলল, 'কে জানে! ওকে আমি বরফের নিচে শুইয়ে দিয়ে এসেছি।' রানার চোখের ওপর স্থির হয়ে থাকল তার দৃষ্টি। সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল। 'একটা পুরুষের মত পুরুষ ছিল—আমাদের ওই নিতাই!'

কর্কশ শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'লেটস মুভ!'

ডুতে চড়ছে রানা, ফিসফিস করে জানতে চাইল নাতাশা, 'কি…কি হয়েছে?'

'নিতাই মারা গেছে,' বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে সীটে বসে নাতাশার দিকে তাকাল। 'আমি ওকে খুন করেছি।'

'না,' শান্ত সুরে বলল নাতাশা। 'ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট! আপনি ক্লান্ত ছিলেন। খুন যদি কেউ করে থাকে তো সে আমি। আপনি শুধু শুধু নিজেকে অপরাধী ভাববেন না।'

একটু পরই আবার রওনা হলো ওরা। মিলটন আর ডাক্তারের ডু-র মাঝখানে টান টান হয়ে উঠল রশি, মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে সামনে এগোল মিলটন। তার মনের অবস্থা কল্পনা করতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। এক ঘন্টায় বিশ মাইল এগিয়েছে ওরা, এরই মধ্যে মারা গেছে একজন। দলের সবচেয়ে শক্তিশালী লোক ছিল নিতাই। এখনও প্রায় সত্তর মাইল পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে। তিন ভাগের এক ভাগ দূরত্বও কি পেরোতে পারবে মিলটন? ঠাণ্ডায় জমে মারা যেতে পারে ও। হোঁচট খেয়ে পড়ে ঘাড় ভেঙে যেতে পারে। ডু চাপা পড়ে মারা যেতে পারে। তিনশো মাইলের কিছু বেশি পেরিয়ে আসতে তিনটে ডু হারিয়েছে ওরা। একটা আসার পথে, দুটো ফেরার পথে দেড়শো মাইলের মধ্যে। হিসেবে বলে, ফেরার পথে ঘন ঘন বিপদে পড়ছে ওরা।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। সাড়ে সাতটা। তিন ঘণ্টারও কিছু কম সময়ের মধ্যে টোয়াইলাইট দেখা দেবে, অথচ পেরোতে হবে সত্তর মাইল। তার মানে কোন রকম বিপদ বা বাধার জন্যে মার্জিন না রেখেই ঘণ্টায় গড়ে পঁচিশ মাইল করে এগোতে হবে। অথচ, মনে মনে জানে রানা, ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে রাশিয়ান সার্চ পার্টি। নোভাইয়া জেমলাইয়ায় ওরা যাদেরকে রেখে এসেছে তারা ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন ধরনের একটা সিগন্যাল পাঠিয়ে দিয়েছে। এই

মুহূর্তে ওরা আন্তর্জাতিক জলসীমার ভেতর রয়েছে বটে, কিন্তু ওদের ওপর চড়াও হবার জন্যে শুধু রাশানদের কেন, কারও কাছেই সেটা কোন বাধা নয়। আলো একটু পরিষ্কার হতে শুরু করলেই সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে ওদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাবে তারা। এদিকের ল্যাটিচ্যুডে আবার সবচেয়ে দ্রুত ছড়ায় টোয়াইলাইটের আলো।

কিন্তু ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে রাশিয়ানরা কিভাবে সার্চ শুরু করবে ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলল রানা। কল্পনা করার চেষ্টা করল, ঠিক এই মুহূর্তে কি ঘটছে নোভাইয়া জেমলাইয়ায়? কিভাবে নিজেদেরকে অর্গানাইজ করছে সার্চ পার্টি? বাতাসের সাথে প্রায় সব দিকেই ছুটছে তুষার, ওদের ফেলে আসা পথ তুষারে ঢাকা পড়তে খুব বেশি সময় নেবে না। কিন্তু পথটা যদি কোন কারণে ঢাকা না পড়ে, এবং প্লেন থেকে দেখতে পাওয়া যায়, সেটা ধরে এগোলেই ওদেরকে দেখতে পাবে পাইলট। একেবারে মন্থর গতি একটা প্লেনেরও ওদের কাছে পৌছতে আধ ঘন্টার বেশি লাগবে না। তাছাড়া, কংকর যে সিগন্যালটা অনবরত পাঠাচ্ছে, সেটা রাশিয়ান রেডিও অপারেটর সহজেই পিক করতে পারবে। প্রথমে সিগন্যালটা স্রেফ নোট করবে তারা, তারপর কৌতূহল বোধ করবে, এরপর তারা ডি/এফ বিয়ারিং নিয়ে কিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং সবশেষে অ্যাকশনে নামবে।

মুহূর্তের জন্যেও মিলটনের ওপর থেকে চোখ সরাল না রানা। বিশ গজ সামনে লম্বা একটা মূর্তি, ওর দিকে পিছন ফিরে রশি ধরে আছে, ছুটে চলেছে আর্কটিক ঠাণ্ডা আর অন্ধকার ভেদ করে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো মূর্তিটা বড় হতে হতে ওর দৃষ্টি পথকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দিল। কিন্তু ওর মন জুড়ে আছে নিতাই। কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পেল ও, কিসের সাথে যেন হোঁচট খেয়ে বরফের ওপর ছিটকে পড়ল নিতাই। হাত থেকে বারটা আগেই ছুটে গেছে। মুখ তুলে যখন তাকাল, দেখল, তাকে ফেলেই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ডুগুলো। এরপরই সচেতন হয়ে উঠল নিতাই—ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে তার প্রাণশক্তি। হয়তো উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। স্কিতে চড়ে পিছু নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিসের সাথে যেন লেগে স্কির সোলে গভীর আর লম্বা একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, সেটা আর ঠিকমত স্লাইড করল না।

আচমকা মাথার পিছনের চুল খাড়া হয়ে গেল রানার। গভীর দাগটা! মনে পড়ল বুতেরা পিঠ থেকে নামিয়ে ওর সামনে ধরল নিতাইয়ের স্কি, চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল শক্ত টিম্বারের গায়ে গভীর গর্তটা।

জোর করে অন্য খাতে নিয়ে এল রানা চিন্তাটাকে। নোভাইয়া জেমলাইয়া ত্যাগ করার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব স্মরণ করার চেষ্টা করল ও। বিস্ফোরণ। নিতাই তার ডু হারাল। ডাক্তার তার ডু হারাল। র‍্যাক থেকে কিভাবে পড়ল আইস-অ্যাক্সটা? শুধু যে পড়ল তাই নয়, পায়ের ধাক্কায় সেটা আবার রোলার মেকানিজমে গিয়ে ঢুকল। এরপর নিতাইয়ের দুঃখজনক পতন। ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শেষ হয়নি রানার, এই সময় ছোট কনভয়ের গতি মন্থর হতে শুরু করল। সবার সাথে রানাও থামাল ডু। দরজা খুলে নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি। পায়ে হেঁটে সামনে এগোবার সময় মনে হলো, যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কোন ফাটল বা

প্রাচীর নেই। কিন্তু লাইনের মাথার দিকে যতই এগোল ও, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা ফাটলের কিনারা। আরও একটা লেক। সরু, কিন্তু অনেক লম্বা। চার ফুটি একটা নালার মত।

কংকরের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ইতোমধ্যে বাকি সবাইও জড়ো হয়েছে এখানে। ডানে বাঁয়ে যেদিকেই তাকাল ওরা, সরলরেখার মত ততদূর দেখা গেল নালাটাকে। দশ ফিট নিচে কালো পানি আবছা চাঁদের আলোয় পারদের মত টলমল করছে।

চেহারায় হতাশা আর ক্ষোভ নিয়ে ফাটলটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর ফিরল কংকরের দিকে। 'লাফিয়ে, না ঘুরে?'

'নির্ভর করে কিসের ওপর ঝুঁকি নেব আমরা?' শান্ত গলায় বলল কংকর। 'সময়, নাকি ডু? লাফ দিলে ডু হারাতে হতে পারে। ঘুর পথে যেতে চাইলে প্রচুর সময় বেরিয়ে যাবে।'

'তোমার পরামর্শ?' জানতে চাইল রানা।

'ডুর ওপর ঝুঁকি নেবার পক্ষপাতী নই আমি,' বলল কংকর। 'তারচেয়ে ঘুর পথে যাওয়া ভাল—সময় যতই অপব্যয় হোক।'

খানিক চিন্তা-ভাবনা করল রানা। তারপর বলল, 'লাফ দেবার জন্যে তৈরি হও।'

সাথে সাথে কাজে হাত লাগাল সবাই। প্রস্তুতি চলছে, এই ফাঁকে পিছিয়ে এসে কংকরের ডু-র পাশে থামল রানা। ভেতরে বসে রয়েছে বুতেরা। দরজা খুলতেই চোখেমুখে তার ঠাণ্ডা দৃষ্টি অনুভব করল রানা।

'নিতাইয়ের স্কি,' অস্ফুটে বলল ও।

একচুল নড়ল না বুতেরা। যেমন তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়ে থাকল। রানা অনুভব করল, ওর অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে সে।

'সোলে ওই যে গর্তটা দেখলাম, কি দিয়ে হতে পারে ওটা?'

রানার চোখ থেকে একটুও সরল না বুতেরার দৃষ্টি। ধরা যায় কি যায় না, ক্ষীণ একটু এদিক ওদিক নড়ল মাথাটা।

'শুধু বরফ কি ওই রকম একটা গর্ত করতে পারে?' জরুরী তাগাদার সুরে জানতে চাইল রানা।

আবার ক্ষীণ একটু মাথা নাড়ল বুতেরা। তারপর ক্যাঙ্গারুর মত ঝুপ করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ডু থেকে। নিঃশব্দ ইঙ্গিতে রানাকে অনুসরণ করতে বলে চলে এল ডু-র পিছনে, যেখানে র‍্যাক ভর্তি টুলস রয়েছে। সেগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। আইস-অ্যাক্সটা রয়েছে। রয়েছে হাতুড়িটাও। কিন্তু ওরা রওনা হবার সময় এই র‍্যাকে কিছু পিটন ছিল, আরও ছিল দুটো গ্র্যাপলিং হুক। র‍্যাকে পিটনগুলোও রয়েছে, নেই শুধু গ্র্যাপলিং হুক দুটো।

'মাই গড!' অস্ফুটে বলল রানা।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল বুতেরা।

'না, এখনই কাউকে কিছু বলার দরকার নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু চোখ খোলা রাখো।'

ওদের কাছে এসে দাঁড়াল কংকর। পথ থেকে অন্যান্য ডু সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কারও দিকে না তাকিয়ে নিজের ডুতে চড়ল সে। দ্রুত পঞ্চাশ গজের মত পিছিয়ে নিয়ে গেল সেটা। ফাটলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল রানা, হাত তুলে সিগন্যাল দিল কংকরকে। ফাটলের দিকে ছুটে আসতে শুরু করল ডু।

কিনারার যেখান থেকে লাফ দেবে ডুটা তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সবার মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে তাদের মনের অবস্থা অনুমান করার চেষ্টা করল ডাক্তার। গম্ভীর, কিন্তু কাউকেই উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো না। অথচ ওর নিজের হৃৎপিণ্ড যেন গলায় এসে আটকে গেছে। ডুটা ছুটে এল, কিন্তু ঝড়ের গতিতে নয়। ডাক্তারের সন্দেহ হলো, কংকর বোধ হয় পারবে না। দেখল, কিনারা থেকে ঠিক লাফ দিল না ডু, যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটেই পেরিয়ে গেল ফাটলটা। ওপারে পৌঁছেও একটু ঝাঁকি খেল না বা কাত হলো না।

এগিয়ে এসে ফাটলের কিনারায় রানার পাশে দাঁড়াল ডাক্তার। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, ওপারে ডু দাঁড় করিয়েছে কংকর। দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল সে। হন হন করে হেঁটে ফিরে আসছে ওদের দিকে। ওপারের কিনারায় থামল সে। মুহূর্তের জন্যে থেমে উঁকি দিয়ে তাকাল নিচের লেকে। তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানা। মাত্র চার ফিট চওড়া, লাফ দিয়ে পেরিয়ে আসা সুস্থ কারও জন্যে কোন সমস্যা নয়। রানার হাতটা ধরল কংকর। লাফ দিতে যাবে বা এরই মধ্যে দিয়ে ফেলেছে, এই সময় হঠাৎ আবার ফাটলের নিচে তাকাল সে।

সাথে সাথে বুঝে ফেলল ডাক্তার, কংকর পারবে না। ঠিক কি ঘটল, বলতে পারবে না সে। হয়তো কংকরের পা পিছলে গিয়েছিল। হয়তো লাফ দেবার আইডিয়াটা পছন্দ হয়নি বলে মানসিক দিক থেকে তৈরি হতে পারেনি। হয়তো শেষ মুহূর্তে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। লাফ দিল, পরমুহূর্তে পড়ে গেল ফাটলের ভেতর। শুধু রানার একটা হাতের সাথে ঝুলছে সে।

শক্ত বরফের ওপর হাঁটু গাড়ল রানা। কংকরকে টেনে ধরে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল ও, নাক-মুখ দিয়ে ভারী নিঃশ্বাসের সাথে গোঙানির মত আওয়াজ বেরিয়ে এল। ডাইভ দিল ডাক্তার, ধপাস করে পড়ল রানার পাশে। কংকরের মাথার ওপর উন্মত্তের মত নাচছে তার একটা হাত। কিনারা দিয়ে নিজের একটা হাত নামিয়ে দিয়ে সেটা ধরতে গেল ডাক্তার। মুখ তুলে ওপর দিকে, ডাক্তারের চোখে তাকিয়ে আছে কংকর। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে চেহারা হয়েছে তার, জানে, ভাগ্য খারাপ হলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মারা যাবে সে। ডাক্তারের নামিয়ে দেয়া হাতটা ধরার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাল, কিন্তু প্রথমবার ছুঁতেই পারল না। আর বোধহয় একবার সুযোগ পাবে সে, তারপরই রানার হাত থেকে ছুটে যাবে তার হাত। ভাগ্যই বলতে হবে, দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ডাক্তারের হাতের নাগাল পেল কংকর। নাগাল পেল, কিন্তু দস্তানার ভেতর আঙুলগুলো স্পর্শ করল শুধু। শেষ মুহূর্তে ডাক্তারের দস্তানাটা খামচে ধরল সে। আর্কটিক পোশাকের সাথে জোড়া লাগানো দস্তানা, ঘাড়ের পাশে প্রচণ্ড একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল ডাক্তার, মনে হলো দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে সে।

ইতোমধ্যে বরফের ওপর শুয়ে পড়েছে রানাও। শরীরের প্রায় অর্ধেকটা

কিনারার ওদিকে ঝুলে আছে। ওর হাত থেকে একচুল একচুল করে পিছলে যাচ্ছে কংকরের মুঠো। অপর হাত নামিয়ে দিয়ে সেটাকে ধরার চেষ্টা করল ও। কিন্তু পারল না। নিঃশ্বাসের সাথে চাপা আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'পারছি না! পিছলে যাচ্ছে হাত!'

কংকরের মুঠোর ভেতর থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল রানার হাত। ব্যথায় নাকি আতঙ্কে ঠিক বোঝা গেল না, তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল কংকরের গলার ভেতর থেকে। রানার হাত ছেড়ে দেয়ায় এখন শুধু ডাক্তারের দস্তানা ধরে ঝুলে আছে সে। তার সম্পূর্ণ ভার দস্তানার ওপর পড়ায় প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল ডাক্তার, স্যাঁৎ করে সরে গেল শরীরটা কিনারা থেকে আরও খানিকটা নিচে। দস্তানার স্ট্র্যাপ ঘাড় আর গলার পাশে এঁটে বসল, গলার ভেতর নিঃশ্বাস আটকে এল ডাক্তারের। পিচ্ছিল বরফ, ধীরে ধীরে শরীরটা নামতে শুরু করল নিচের দিকে।

নিচে থেকে মুখ তুলে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে আছে কংকর। জুতোর আগা বরফে গাঁথার চেষ্টা করল ডাক্তার, কিন্তু গর্ত করার আগেই প্রতিবার পিছলে গেল জুতো। কিনারা থেকে শরীরের বাকি অর্ধেকটা নিচের দিকে নামছে তো নামছেই। কোনভাবেই নেমে যাওয়াটা রোধ করতে পারল না ডাক্তার। আর এক কি দু'সেকেন্ড, তারপরই পড়ে যাবে সে।

এই সময় ডাক্তারের পায়ের ওপর ভারী কি যেন পড়ল। জয়েন্টের ওপর চাপ পড়ায় হাঁটু আর পায়ের গোছে তীব্র ব্যথা অনুভব করল সে। কিন্তু সেই সাথে পিছলে যাওয়াটা বন্ধ হলো।

এই অবস্থায় যেন কয়েক যুগ ধরে স্থির হয়ে থেমে থাকল ঘটনাটা। দম আটকে যাওয়ায় চোখে অন্ধকার দেখল ডাক্তার, বুঝল, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে সে। ইতোমধ্যে ঝাপসা হয়ে এসেছে চোখের দৃষ্টি। পরিষ্কার চিনতে পারল না কংকরকে। শুধু দেখল, নিচে তার দস্তানার সাথে একটা মূর্তি এদিক ওদিক দুলছে। এখনও ঝুলে থাকতে পারছে কংকর, কিন্তু আর কতক্ষণ পারবে বলা মুশকিল। এই সময় লক্ষ করল ডাক্তার, কংকরের মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে আসছে তার দস্তানা।

বোধহয় আট সেকেন্ডও হয়নি ঘটনাটা ঘটতে শুরু করেছে। আর বড় জোর দু'সেকেন্ড, তারপরই কংকরের মুঠো থেকে ছুটে যাবে ডাক্তারের দস্তানা। পানিতে পড়া মানে সাথে সাথে মৃত্যু। নিমেষের মধ্যে একশো ডিগ্রী টেম্পারেচার নেমে গেলে মানুষের শরীর সেটা সহ্য করে নিতে পারে না।

আওয়াজ শুনে বুঝল ডাক্তার, কি যেন পড়ল তার পাশে। পরমুহূর্তে নিজের হাতের পাশে আর এক জোড়া হাত দেখতে পেল ও, কংকরের কব্জি ধরার জন্যে সাপের মত কিলবিল করছে দুটো হাত। বুতেরা। কিন্তু কংকরের নাগাল পেল না সে। আরও অনেকটা নিচে রয়েছে কংকর।

ফাটলের নিচে পড়ার দরকার হবে না, শ্বাস টানার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ভাবল ডাক্তার, তার আগে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে সে। বুঝল, চিৎকার করছে বুতেরা, কিন্তু আওয়াজটা অস্পষ্ট লাগল কানে।

'কেউ আমার গোড়ালি ধরো! খোদার দোহাই লাগে, জলদি!'

পরমুহূর্তে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ ছেড়ে ফাটলের কিনারা থেকে নিচের দিকে নেমে গেল বুতেরা। প্রথমে কোমর, তারপর উরুর আধাআধি। হাত দুটো কংকরের নাগাল পাবার জন্যে বাতাস খাবলাচ্ছে। আরও, আরও নিচে নেমে গেল বুতেরার হাত। ধরে ফেলল কংকরকে।

নাতাশার গলা পেল ডাক্তার। 'হেলপ!' ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'জলদি! ওকে আমি ধরে রাখতে পারছি না!'

কর্কশ একটা আওয়াজ শুনল ডাক্তার। বরফের সাথে শক্ত কিছু ঘষা খেল বোধ হয়। কটাশ করে একটা শব্দ হলো সেই সাথে অসহ্য ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল বুতেরা।

হঠাৎ করেই ডাক্তারের ঘাড় আর গলার পাশ থেকে চাপটা কমে গেল। গোড়ালি ধরে কেউ একজন টানল ওকে, ফাটলের নিচ থেকে উঠে এল শরীরটা। বুকের হাড়ে শক্ত বরফের স্পর্শ পেয়েই টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে।

বরফের ওপর বুতেরার শুধু পা দুটো রয়েছে, শরীরের বাকি অংশ কিনারা থেকে ঝুলছে নিচের দিকে। দু'জনের জন্যে পানিতে পড়ছে না সে। একজন নাতাশা। বুতেরার গোড়ালি দুটো বরফ থেকে খানিকটা তুলে ধরে আছে সে। অপরজন মিলটন। বুতেরার দু'হাঁটুর নিচে এবং উল্টোদিকে স্কি তুলে দিয়েছে সে, তার শরীরের সমস্ত ভার পড়েছে ওই স্কি জোড়ার ওপর।

ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা, বুতেরার পারকা ধরে টানতে শুরু করল। দুই সেকেন্ড পর ওকে সাহায্য করল ডাক্তার। কিনারার নিচ থেকে উঠে আসতে শুরু করল বুতেরা, তার সাথে কংকরও। খানিক পর রানা আর ডাক্তার হাত নামিয়ে দিয়ে নাগাল পেল কংকরের। এবার তার হাত ধরে টানতে শুরু করল ওরা। সেই সাথে কংকরের হাত দুটো ছেড়ে দিল বুতেরা, এবং পরমুহূর্তে বিকট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ওর হাত ধরে এখনও নিচের দিকে ঝুলছে কংকর। দেখল, বুতেরার পায়ের গোড়ালি ধরে এখনও টানছে নাতাশা। কিনারা থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে সে।

'টেনো না,' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'ধরে রাখো শুধু।' মিলটনের দিকে তাকাল ও। 'সরো, সরে যাও!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্কি নিয়ে বুতেরার পায়ের ওপর থেকে নেমে পড়ল মিলটন।

এক মিনিট পর। বরফের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা পাঁচজন। ক্লান্ত, হাঁপাচ্ছে। বাকি একজন, বুতেরা, ওদের সাথে দাঁড়িয়ে নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বরফের ওপর। কারও দৃষ্টি এড়াল না, তার পা দুটো কেমন অদ্ভুত ভাবে বেঁকে আছে।

'সময় ছিল না,' ম্লান গলায় বলল মিলটন। 'কিনারা দিয়ে নেমে যাচ্ছিল ও। লাফ দিয়ে ওর পায়ের ওপর চড়তে হলো আমাকে।'

রানার ইঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল ডাক্তার, হাঁটু গেড়ে বসল বুতেরার পায়ের পাশে। দস্তানা খুলে পা দুটো ছুঁলো সে। ধীরে ধীরে পরীক্ষা করল।

'কি অবস্থা?' থমথমে গলায় জানতে চাইল রানা।

'ভেঙে গেছে।' উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। 'হাঁটুর নিচ থেকে। দুটোই।'

দশ

কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল কংকর, হন হন করে এগোল ডাক্তারের ডু-র দিকে। একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে উঠে পড়ল সে। দরজা বন্ধ করল। পঞ্চাশ গজ পিছিয়ে নিয়ে গেল ডুটা। তারপর ছুটল ফাটলের দিকে। নির্বিঘ্নে ফাটল পেরিয়ে ওপারে থামল সে। দরজা খুলে নেমে পড়ল। হন হন করে এগিয়ে এল ওদের দিকে। ফাটলের কিনারায় এসে থামল। তারপর বলল, 'কি হলো? হাতটা কেউ ধরবে না?'

এগিয়ে গিয়ে এপারের কিনারায় দাঁড়াল রানা। ওর বাড়ানো হাতটা ধরল কংকর। এবার কোন দুর্ঘটনা ঘটল না, সহজেই এপারে চলে এল সে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হন হন করে এগোল সে রানার ডু-র দিকে।

'দাঁড়াও,' পিছু ডাকল রানা।

থামল কংকর। ঘুরে দাঁড়াল।

ইশারায় বুতেরাকে দেখাল রানা। 'অন্য কোন ভাবে পার করানো যাবে না। তোমার সাথে ডুতে নিতে হবে ওকে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গলে কংকরের চেহারা। 'ওহ্ গড। অসম্ভব...' রানার চেহারা কঠোর হয়ে উঠল দেখে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে।'

ইতোমধ্যে স্কি থেকে নেমে পড়েছে মিলটন। ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে অবশিষ্ট ডুতে বুতেরাকে তুলে দিল সে। ব্যাগ খুলে খুদে টেলিস্কোপিক স্প্লিন্টস বের করল ডাক্তার, সেগুলো বেঁধে দিল বুতেরার পায়ে। পা ভেঙেছে, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত বেরোয়নি। চামড়া ফুঁড়ে কোথাও হাড়ও বেরিয়ে আসেনি। ভাঙার আগে যেমন ছিল সোজা আর টান টান, ঠিক তেমনিই আছে। ফ্র্যাকচারটা কি রকম হতে পারে অনুমান করতে গিয়ে শিউরে উঠল ডাক্তার।

মরফিয়া বের করে বুতেরাকে ইঞ্জেকশন দিল সে। হেভী ডোজই দিল, একটা হাতীকে অসাড় করার জন্যে যথেষ্ট। জ্ঞান ফিরে পেলে ব্যথায় পাগল হয়ে যাবার অবস্থা হবে বুতেরার, তখন কাজে লাগবে এই মরফিয়া।

বুতেরাকে পিছনের সীটে নিয়ে নিরাপদেই ফাটল পেরোল শেষ ডুটা। রিস্টওয়াচ দেখল রানা, সোয়া ন'টা। প্রথমে সবার কোমরে রশি বেঁধে নেয়া হলো, তারপর একজন একজন করে ফাটলটা পেরোল ওরা। রশি খুলে ডাক্তারের ডু-র পাশে চলে এল রানা। সেসলভকে পরীক্ষা করবে।

পিছনের সীটে এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছেন বৃদ্ধ। পালস, শ্বাস-প্রশ্বাস চেক করল রানা। ঠিক আছে সব। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল তাঁর ঘুম ভাঙছে না। ব্যাপারটা কি? প্রফেসর, প্রফেসর করে ডাকল কয়েকবার। কোন সাড়া নেই।

পিছন থেকে ডাক্তারের গলা শোনা গেল, 'ওষুধের প্রভাব কাটেনি এখনও।'

'হুঁ।'

'আমরা দিক ভুল করিনি তো, মি. রানা?'

ডু থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তারকে পথ ছেড়ে দিল রানা। 'দিক ভুল করে থাকলে একজনও বাঁচব না। নিন, উঠে পড়ুন। টোয়াইলাইট শুরু হতে আর এক ঘণ্টাও বাকি নেই।'

ডুতে উঠে পড়ল ডাক্তার। নিজের ডুতে ফিরে এল রানা। পিছনের সীট থেকে কি যেন বলল বা জিজ্ঞেস করল নাতাশা, ভাল শুনতে পেল না রানা। মনে মনে একটা হিসেব করছে। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে, ঘণ্টায় গড়ে পঁচিশ মাইল এগোতে পারলেও টোয়াইলাইটের মধ্যে থাকতে হবে ঘণ্টাখানেক বা তার চেয়েও বেশি। দেখল, পিছনের সীটে বুতেরাকে নিয়ে সামনে বাড়তে শুরু করল কংকরের ডু। পিছু নিল ডাক্তার। স্কি-তে নিচু হয়ে বসে আছে মিলটন, এই সময় তার টো লাইন টান টান হয়ে উঠল। টান পড়তেই দাঁড়িয়ে উঠে ঝাঁকিটা সামলাল সে। এক মুহূর্ত পর তাকে অনুসরণ করল রানার ডু।

মিশনের অবস্থা মোটেও সুবিধের নয় এখন। নিতাই নেই। অকেজো হয়ে গেছে বুতেরা। ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে কংকর। রানার উরুর ক্ষতটা দপ দপ করতে শুরু করেছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। মিলটনও ক্লান্ত, তার ওপর প্রতি মুহূর্ত প্রাণ হারাবার ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হচ্ছে তাকে। ডাক্তার আর নাতাশা মোটামুটি সুস্থই আছে, কিন্তু একজন অনভিজ্ঞ আর অপরজন মেয়ে, বিপদের সময় খুব একটা সাহায্য ওদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

তবে ফাটল পেরিয়ে আসার পর ভালই এগোল ওরা। সমস্ত ঝুঁকি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ওদের জন্যে সামনে এগোনোটা সহজ করে তুলল কংকর। যদিও, তাকে শুধু অনুসরণ করে যাওয়াও সহজ নয়। সম্পূর্ণ মনোযোগ আর সচেতনতা ছাড়া সম্ভব নয় কাজটা। কংকরের তৈরি পথে থাকার জন্যে অনবরত দিক বদল করতে হলো ওদেরকে। বেশ কয়েক ঘণ্টা হলো ওদেরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ছোটখাট যুগোস্লাভিয়ান। ঢাল, মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বরফের স্তূপ, ফাটল, গর্ত ইত্যাদি পাশ কাটাবার জন্যে সারাক্ষণ দিক বদলে চলেছে সে। তার বিবেচনা, দক্ষতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে ওদের সবার নিরাপত্তা।

শেষ অন্ধকারটুকু চমৎকার সদ্ব্যবহার করল ওরা। পঁচিশ ছাড়িয়ে গেল গতি। ত্রিশও ছাড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে দু'একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। মনে হলো, ঘুমিয়ে পড়েছে নাতাশা। বুতেরার পা ভাঙার পর থেকে আর কোন কথা বলেনি সে।

সাড়ে দশটার দিকে বরফের ওপর আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আলোর প্রথম আভাসটা ক্ষীণ লাগল চোখে, কিন্তু তারপরই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আরও ম্লান হয়ে গেল চাঁদের আলো, তার জায়গায় ফুটল খবরের কাগজ পড়তে পারার মত টোয়াইলাইট।

সামনেটা এখন অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেল কংকর, কাজেই স্পীড বাড়িয়ে দিল সে। দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। নিষেধ করবে কিনা ভাবল একবার। টো লাইনের মাথায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে রয়েছে মিলটন। একটানা স্কি-রানিঙের অভ্যেস থাকলেও, আর্কটিক ঠাণ্ডায় নিশ্চয়ই ওর শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তারপর ভাবল

রানা, অসুবিধে হলে নিজেই বলবে মিলটন। এখন আর বাধা দিয়ে কনভয়ের গতি কমাবার কোন মানে হয় না। আর হয়তো পঁয়ত্রিশ মিনিট পরই পৌঁছে যাবে ওরা। আরও কম লাগতে পারে সময়।

মাঝে মধ্যে মিলটনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সামনের দিগন্তরেখার ওপর দৃষ্টি বুলাল রানা। স্কিপার ব্রেল ফাইজারের ক্রুরা হোয়াইট স্টার থেকে নামিয়ে সামনে কোথাও খাড়া করে তুলেছে একটা কুঁড়েঘর। কিন্তু বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার ঝুঁকিটা নিল না রানা। মিলটনের ওপর নজর রাখা দরকার। তা নাহলে যে-কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

দিগন্তরেখা পরিষ্কার দেখা গেল। কিন্তু ওরা যত এগোল, ততই পিছিয়ে গেল সেটা। বিশ মিনিট পনেরো মিনিটে এসে ঠেকল, পনেরো মিনিট দশ মিনিটে। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে দিগন্তরেখার ওপর কুঁড়েঘরটা দেখতে পাবার কথা। সেই ঘরের ভেতর ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে একটা প্লেন। নরম, আরামদায়ক সীট আছে তাতে। সেই সীটের সাথে নিজেদেরকে বেঁধে নিতে পারবে ওরা। তারপর ঘুমাতে পারবে। রানার মনে হলো, পুরো মাসটা ঘুমিয়ে কাটালেও ওর এই ক্লান্তি বুঝি দূর হবে না।

ঘরটা দেখতে পাবার সময় পেরিয়ে গেল, তবু থামল না ওরা। হিসেবে এক আধটু এদিক ওদিক হয়ে থাকতে পারে। হঠাৎ রানা দেখল, চল্লিশ গজ সামনে কংকরের ডু থামতে শুরু করেছে। ব্রেক করে নিজের ডু থামিয়ে নেমে পড়ল ও। কেন থামল কংকর, বুঝতে পারল না। ডাক্তার এবং কংকর এরই মধ্যে ওদের ডু থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওদের কাছাকাছি এসে ব্যাপারটা টের পেল রানা। সাথে সাথে নিরাশায় ছেয়ে গেল মন। দিগন্তরেখার কাছে, মাইল দুয়েক দূরে, আকাশের গায়ে দেখা গেল কুঁড়েঘরের ছাদের কিনারা। ভাল করে তাকাতে নিচের কাঠামোটাও পরিষ্কার চেনা গেল—বরফের ওপর সাদা একটা ঢিবির মত লাগছে দেখতে।

মাত্র দু'মাইল। কিন্তু দু'লক্ষ মাইল বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। মেইন আইস-প্যাকের ওপরই খাড়া করা হয়েছিল ঘরটাকে, কিন্তু মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে গেছে আইস-প্যাক। প্রকাণ্ড একটা বরফের দ্বীপের ওপর এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরটা, দ্বীপটা ভাসছে কালচে রঙের পানিতে।

মরিয়া একটা ভাব ফুটে উঠল কংকরের চেহারায়। 'উল্টো দিক থেকে পৌঁছুতে পারব ওখানে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কোন আশা নেই।' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। দিগন্তরেখার ওপর তীক্ষ্ণ চোখ বুলাল। কিছুই নড়ছে না। শুধু ডুগুলো থেকে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। নিজের ডু-র কাছে ফিরে এল রানা। ডাক্তার লক্ষ করল, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে লীডার। ক্লান্তিতে ঝুলে পড়েছে ওর কাঁধ। ডু-র ভেতর হাত ঢুকিয়ে রেডিও অন করল রানা।

'রানা টু ফাইজার। রানা টু ফাইজার।'

বিদঘুটে স্ট্যাটিক আওয়াজ পেল ওরা, কিন্তু কোন গলা শোনা গেল না। সেটটা অ্যাডজাস্ট করল রানা। 'রানা টু ফাইজার। রানা টু ফাইজার। ওভার।'

কেউ কারও দিকে তাকাল না, কিন্তু মনে মনে সবাই উত্তেজিত।

'রানা টু ফাইজার। রানা টু ফাইজার। ওভার।'

এক, দুই করে আরও অনেকগুলো সেকেন্ড বয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে পানিতে ভাসমান বিশাল বরফ-দ্বীপের দিকে তাকাল রানা। ঘড় ঘড় যান্ত্রিক শব্দ ঢুকল কানে।

'ফাইজার টু রানা।'

'রানা টু ফাইজার। বরফের দ্বীপের ওপর ভাসছে ওটা। এসে নিয়ে যাও আমাদের।'

'প্যাক থেকে দশ মাইল তফাতে রয়েছি আমি। ফুল স্পীডে এগোব। ওভার অ্যান্ড আউট।'

'বরফ ধরে যতটা পারি এগোচ্ছি আমরাও। আউট।' কংকরের দিকে ফিরল রানা, বলল, 'ফাইজার বারো নট গতিতে আসবে। তারমানে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

কংকর আর ডাক্তার ফিরে গেল। নাতাশার খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল রানা, তারপর দেখল, একটা ঢালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গিতে চোখ রাঙাল নাতাশা, 'জিজ্ঞেস করা উচিত নয়।'

'দুঃখিত,' বলে ডু থেকে ফ্লাস্ক বের করল রানা। 'কফি?'

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল নাতাশা। 'আপনি খান।'

ফ্লাস্কটা আবার রেখে দিল রানা। নাতাশার দিকে পিছন ফিরে এগোল ডাক্তারের ডু-র দিকে। ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নাতাশা।

'প্রফেসরের ঘুম ভাঙল?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল ডাক্তার। তাকে পাশ কাটিয়ে ডুতে চড়ল রানা। পালস দেখল প্রফেসরের। ঠিক আছে। মুখটা কাত হয়ে আছে তাঁর, হুডের আড়ালে দেখা গেল না। মুখটা নিজের দিকে ফেরাবার জন্যে হুড ধরে টানল রানা। কপালে হাত রাখল। টেম্পারেচারও স্বাভাবিক। আঙুল দিয়ে একটা চোখের পাতা খুলল। অসুস্থতার কোন লক্ষণ নেই। খাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ এখনও প্রফেসরের ঘুম ভাঙছে না কেন? তাঁর গালে হালকা ভাবে হাত চাপড়াল রানা। প্রফেসর, প্রফেসর করে ডাকল কয়েকবার। কোন সাড়া নেই। বোধহয় মৃদু চাপড়েই প্রফেসরের ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক হলো। মুখের ভেতর খয়েরী রঙের দাঁত দেখতে পেল রানা। দাঁতের ফাঁকে সাদা কয়েকটা বিন্দু দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। মুখের ভেতর একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বিন্দুগুলো স্পর্শ করল ও। আঙুলের ডগায় খরখরে একটু অনুভূতি হলো। মুখ থেকে বের করে আঙুলটা চোখের সামনে তুলল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। চিনির কয়েকটা দানা!

প্রফেসরের মুখের ভেতর চিনি ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। হয়তো দু'এক ফোঁটা পানির সাথে গলা দিয়ে নামিয়েও দিয়েছে খানিকটা। বিষম খেয়ে মারা যাননি প্রফেসর, সেটাই ভাগ্য। তাছাড়া, ডায়াবেটিসের রোগীকে চিনি দেয়া মানে তাকে মারাত্মক বিপদের দিকে ঠেলে দেয়া। ওষুধ খাওয়া ঘুম ডায়াবেটিক কোমায়

রূপান্তরিত হতে পারত। ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেল রানার চুল। প্রফেসরকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে! মুখে চিনি গুঁজে দেবার ফলে দু'ভাবে মারা যেতে পারতেন তিনি।

ডু থেকে বেরিয়ে ডাক্তারের সামনে দাঁড়াল রানা। 'প্রফেসরকে চিনি দিয়েছেন আপনি?'

'সে কি! কি বলছেন আপনি, মি. রানা?' হতভম্ব দেখাল ডাক্তারকে। 'আমি···'

'কেউ একজন দিয়েছে।' একমুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল রানা, তারপর আবার বলল, 'আইস অ্যাক্স, যেটা আপনার ডু নষ্ট করে···'

কৌতূহল আর বিস্ময়ের সাথে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ডাক্তার। 'হ্যাঁ, কি হয়েছে?'

'আমাদের মধ্যে শত্রু আছে,' চাপা গলায় বলল রানা। 'এক এক করে সবাইকে খুন করতে চাইছে সে। নিতাই। সেসলভ। বুতেরা।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার, দ্রুত এগোল বুতেরার ডু-র দিকে। পিছু নিল ডাক্তার। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা।

'বুতেরা? বুতেরা?'

চোখ দুটো খোলা রয়েছে বুতেরার, কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। এত বেশি মরফিন দিয়েছে ডাক্তার, সচেতন থাকার কথা নয় বুতেরার। কিন্তু হাল ছাড়ল না রানা। বুতেরার গালে চাপড় মারতে শুরু করল ও। বেশ জোরে জোরে। ঘোর ভাঙল না বুতেরার, কিন্তু ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ।

'নিতাইয়ের স্কি,' বলল রানা। 'ধাতব কিছুর সাথে ঘষা খেয়ে তৈরি হয়েছিল গর্তটা, তাই না?'

সাড়া দিল না বুতেরা।

আবার চড় মারল রানা। 'তাই না, বুতেরা?'

নড়েচড়ে উঠল বুতেরা। চোখ পিটপিট করল কয়েক বার। মনে হলো, স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে।

'বুতেরা!' চাপা উত্তেজিত শোনাল রানার গলা, 'নিতাইয়ের স্কি!'

নড়ে উঠল বুতেরার ঠোঁট জোড়া। বিড় বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা। এই সময়, হঠাৎ, একেবারে পরিষ্কার গলায়, স্পষ্ট সুরে কথা বলে উঠল বুতেরা।

'ঠেলো না! না! ধরে রাখো! ধাক্কা দিয়ো না!'

'ঠিক আছে, তুমি শান্ত হও,' শান্ত সুরে বলে ডু থেকে বেরিয়ে এল রানা।

একটু রাগের সাথেই জানতে চাইল ডাক্তার, 'আপনি ওকে মারলেন কেন?'

'নাতাশা,' বলল রানা। 'বুতেরাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল সে। আরও কি করেছে, খোদাই বলতে পারবে। আমাদের সবাইকে শেষ করার চেষ্টা করছে মেয়েলোকটা।'

রানার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ডাক্তার। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না সে। 'কি বলছেন আপনি? নাতাশা বুতেরার গোড়ালি ধরেছিল, দেখেননি আপনি? না ধরলে কি হত, বুঝতে পারছেন না? বুতেরা কিনারা দিয়ে

ফাটলে নেমে যাচ্ছিল। নাতাশা বরং বাঁচিয়েছে ওকে…!'

'বুতেরা কি বলল শুনতে পাননি? ঠেলো না! না! ধরে রাখো! ধাক্কা দিয়ো না!' ডাক্তার দ্বিধায় পড়ে গেল, লক্ষ করল রানা। আবার বলল ও, 'বুতেরাকে বাঁচিয়েছে মিলটন, নাতাশা নয়।'

'ঠিক বলেছেন, মি. রানা।' পিছন থেকে এল কণ্ঠস্বরটা।

রানা এবং ডাক্তার, দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ডু-র অপর দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাতাশা। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ। 'বুঝেছেন ঠিকই, কিন্তু একটু দেরিতে। এখন আর আপনাদের কিছু করার নেই।'

হাতের কারবাইনটা ওদের দিকে তাক করে ধরল নাতাশা।

এগারো

এক এক করে সবগুলো ডু-র পাশে গিয়ে দাঁড়াল নাতাশা, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল কারবাইনগুলো, ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। সন্দেহ নেই, ওদেরকে হারিয়ে দিয়েছে মেয়েটা! সবাই বুঝল, তার ওপর টেক্কা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই এখন, কারণ বুতেরা ছাড়া সবাই ওরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, কারও সামনে কোন আড়াল নেই। বুতেরা ডু-র আড়ালে থাকলেও, মরফিনের নেশায় ঘোরের মধ্যে আছে সে, তার কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য আশা করা বৃথা। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটাকে নিরস্ত্র করার চিন্তাটাও বাতিল করে দিল রানা। কারবাইন ধরে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, চালাবার ট্রেনিং নেয়া আছে মেয়েটার। অনায়াস ভঙ্গিতে ধরে আছে, একটুও কাঁপছে না হাত, একটুও অনিশ্চয়তা নেই।

'ডক্টর নোলটন বলেছিলেন,' ফোড়ন কাটল ডাক্তার, 'নিবেদিত প্রাণা অ্যাসিস্ট্যান্ট!'

ডাক্তারের দিকে ফিরল নাতাশা। 'তা বলতে পারেন। কিন্তু আপনি যার কথা বলতে চাইছেন,আমি সে নই। এই মুহূর্তে সম্ভবত মস্কোয় আছে সে।'

'তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'চুপ করে থাকুন!' কঠোর দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'সামনে আসুন, আপনারা সবাই। এক লাইনে দাঁড়ান, এখানে, আমার সামনে।'

কারবাইন নেড়ে সামনের একটা জায়গা দেখাল নাতাশা। তার সামনে লাইন করে দাঁড়াল ওরা।

'বসুন সবাই।'

বসল ওরা।

বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল ডাক্তারের। কঠিন সব বাধা বিঘ্ন টপকে সাফল্যের দোর-গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল মিশন, অথচ শেষ কালে একটা মেয়েমানুষের কাছে হেরে যেতে হলো ওদেরকে। এর চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কি হতে পারে!

'আমাদের নিয়ে যা খুশি করতে পারো তুমি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'কিন্তু প্রফেসর সেসলভকে বাঁচাতে হবে। তোমার অনুমতি পেলে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে আসতে পারেন।'

'পুরুষমানুষদের এই একটা দোষ,' তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলল নাতাশা, 'মেয়েদেরকে বোকা মনে করে। ডাক্তার, ভাল চান তো নড়বেন না!'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তোমার আদেশ অমান্য করবে না কেউ। কিন্তু আমাদেরকে অন্ধকারে রাখছ কেন? তোমার পরিচয়টা জানালে ক্ষতি কি?'

'কে.জি.বি,' ফিস ফিস করে বলল ডাক্তার।

রানার দিকে তাকাল নাতাশা। 'প্রথমে আমাকে বোকা ভাবলেন। এখন নিজেই বোকা সাজার ভান করছেন। আমি যে কে.জি.বি. আপনার মিশনের ডাক্তারও তা জানেন, অথচ আপনি জানেন না, এ-ও কি বিশ্বাস করার মত কথা?' সকৌতুকে হাসল সে। সম্পূর্ণ শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। অনিশ্চয়তার লেশমাত্র নেই চেহারায়।

'আমাদের সাথে এলে কেন তাহলে?'

'প্রফেসরের অ্যাসিস্ট্যান্ট করেই পাঠানো হয় আমাকে,' বলল নাতাশা। 'আসলে কে.জি.বি-র তরফ থেকে তাঁর ওপর চোখ রাখার দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। প্রফেসরকে আপনারা কব্জা করলেন দেখে আপনাদের সাথে আসতে হলো আমাকে।'

'কেন?'

'প্রফেসরকে খুন করার জন্যে—,' কোন রকম দ্বিধা না করে অবলীলায় বলল নাতাশা, '—যদি দেখি তাকে নিয়ে সত্যি পালাতে পারবেন আপনারা। আর যদি পারি, তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।'

'তোমার আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করতে হয়,' বিদ্রূপের সুরে বলল রানা। 'খুন হয়তো সম্ভব, কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে…'

'ভুল করলেন,' বলল নাতাশা। 'নিজের চেয়ে হেলিকপ্টারের ওপর বেশি বিশ্বাস রাখছি আমি।'

দ্রুত আকাশে চোখ বুলাল রানা। 'মানে?'

রানার বিমূঢ় চেহারা দেখে হেসে উঠল নাতাশা। 'ধৈর্য ধরুন। আসছে।'

'তারমানে…তুমি খবর পাঠিয়েছ?'

'হ্যাঁ। সেই যে তখন জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলে? উত্তরে বললাম, জিজ্ঞেস করা উচিত নয়? মনে পড়ে? তখন।'

'কিন্তু কিভাবে?'

'ছোট একটা রেডিও আছে আমার কাছে।'

'প্রফেসরকে চিনি দিলে কেন?'

খানিক ইতস্তত করে বলল নাতাশা, 'কারণ তখন আমার মনে হয়েছিল আপনারা জিতে যাবেন।' কি যেন ভাবল সে। তারপর বলল, 'মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। প্রফেসরকে এখন ইনসুলিন না দিলেই নয়। ডাক্তার,' ডাক্তারের বুকের দিকে তাক করল কারবাইন। 'দাঁড়ান।'

'না,' ডাক্তারকে বলল রানা। তাকাল নাতাশার দিকে। 'আবার তোমাদের হাতে পড়ার চেয়ে প্রফেসরের মরে যাওয়াই ভাল।'

'উঠুন,' রানার দিকে তাকালই না নাতাশা। 'আমি বলছি।'

বসে থাকল ডাক্তার। এক চুল নড়ল না।

কিছুই টের পেতে দিল না নাতাশা। কারবাইনটা তোলাই ছিল, ট্রিগার টেনে দেবার সময় শুধু আঙুলটাই নড়ল। পরিষ্কার দেখল রানা, গুলি করল নাতাশা, কিন্তু দেখেও বিশ্বাস করতে এক সেকেন্ড দেরি হলো ওর। প্রথমে মনে হলো, বুকে গুলি খেয়েছে ডাক্তার। আওয়াজের সাথে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল সে, বরফের সাথে ঠুকে গেল মাথা। একটা কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, ধীরে ধীরে গড়িয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল সে। তার পাশে সাদা বরফ লাল হয়ে উঠতে দেখল রানা।

উঠে বসে থর থর করে কাঁপতে শুরু করল ডাক্তার। বুকে নয়, হাতের আঙুলে লেগেছে বুলেট। ঝর ঝর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

'তিন পর্যন্ত গুণব,' রানার দিকে ফিরে বলল নাতাশা। 'তারপর আবার গুলি করব। আপনাকে। এক, দুই...'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'কি করতে হবে?'

শান্ত ভাবে হাসল নাতাশা। 'গুড।' কাঁধ থেকে নিজের মেডিকেল কিট খুলে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'টু কিউবিক সেন্টিমিটারস। প্রফেসরের পেটে খাবার না পড়া পর্যন্ত চিনির সাথে লড়ার জন্যে ওইটুকুই যথেষ্ট।'

ব্যাগটা খুলল রানা। ভেতরে ইনসুলিনের ছোট একটা বোতল রয়েছে। স্টেনলেস স্টীলের একটা কেস দেখল ও, ভেতরে হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। ব্যাগে আরও একটা বোতল রয়েছে, ব্রাউন রঙের লেবেল সাঁটা। ব্যাগ থেকে বের করে নাতাশাকে দেখাল ও। 'ফেনোল-বারবিটোন?'

'শত্রু বুদ্ধিমান হলে অনেক সুবিধে,' ঠোঁট কুজে একটু হাসল নাতাশা, তারপর আবার বলল, 'ওটার কারণেই যে প্রফেসরের ঘুম ভাঙছে না, সেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন।' ডাক্তারের দিকে তাকাল সে। 'আপনার আঘাত গুরুতর নয়। প্রফেসরকে ইনসুলিন দিতে পারবেন তো?'

পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজেই আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধছে ডাক্তার। মুখ তুলল সে। নাতাশার দিকে নয়, তাকাল রানার দিকে।

'প্রশ্নটা আমি করেছি,' কঠোর, তীক্ষ্ণ শোনাল নাতাশার গলা।

'না, পারব না,' বলল ডাক্তার।

'আপনি?' রানার দিকে তাকাল নাতাশা।

'হয়তো।'

'পারতেই হবে,' কারবাইন নেড়ে সামনে বাড়ার ইঙ্গিত দিল নাতাশা।

প্রফেসরের ডু-র দিকে এগোল রানা। ওর আগেই ঘুরতে শুরু করেছে নাতাশা, সবাইকে কাভার দেবার জন্যে রানার পিছনে চলে এল সে।

কাউকে ইশারায় কিছু বোঝাতে চাইলে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়, তাই কারও দিকে তাকালই না রানা, সোজা এগিয়ে গিয়ে উঠে পড়ল ডুতে। প্রফেসরকে

পরীক্ষা করল ও। আগের মতই আছেন তিনি। সিরিঞ্জে দুই সিসি ইনসুলিন ভরার সময় ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলল মাথার ভেতর। মেয়েটাকে কাবু করার উপায় নিশ্চয়ই আছে। তীরে প্রায় ভিড়িয়ে নিয়ে এসেছে তরী, এই অবস্থায় সেটাকে ডুবতে দেবে না ও। কিন্তু উপায়টা কি? ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। লাইন বেঁধে দাঁড়ানো ডুগুলোর কাছ থেকে পনেরো গজ দূরে রয়েছে নাতাশা। মিশনের বাকি সবাই ডু আর নাতাশার মাঝখানে। বিপদ দেখলে তাকে শুধু কারবাইনের ট্রিগার টেনে ধরতে হবে। হতাশায় ছেয়ে গেল মন।

কিন্তু হাল ছাড়ল না রানা। হাতের দস্তানা খুলতে শুরু করল ও। ডু-র ভেতরটা বেশ গরম। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল, ডু-র ভেতরটা গরম, কারণ ইঞ্জিন চালু রয়েছে। এবং ছোট হলেও, ডু-র সামনে ইঞ্জিন একটা নিরেট ধাতব আড়াল তৈরি করে রেখেছে। একটু যেন আশার আলো দেখতে পেল রানা।

আবার একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। ডাক্তার, মিলটন আর কংকর মাথার পিছনে হাত রেখে বসে আছে বরফের ওপর। নিস্তেজ, ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওদেরকে। কিন্তু রানা জানে, প্রয়োজনের সময় বিদ্যুৎ খেলে যাবে মিলটন আর কংকরের শরীরে। প্রশ্ন হলো, প্রফেসর আহত হতে পারে ভেবে গুলি করতে কতক্ষণ দেরি করবে নাতাশা? দুই সীট আর দেয়ালের মাঝখানে একটু ফাঁক রয়েছে, তার ভেতর যতটা সম্ভব শরীরটাকে গলিয়ে দিল রানা। তারপর হাত বাড়িয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে থ্রটল বাটনটা টিপে দিল।

আচমকা লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল ডু। বাঁ হাত দিয়ে হ্যান্ডেলবার ঘোরাল রানা। স্যাঁৎ করে ডান দিকে ঘুরে গেল ডু। প্রথমে নাতাশা আর ওদের তিনজনের মাঝখানে পৌঁছতে চায় রানা, তারপর বাঁক নিয়ে ছুটতে চায় নাতাশার দিকে। ওদের তিনজনকে আড়াল দেবার এটাই একমাত্র উপায়। মাথা তুলে উইন্ডস্ক্রীনে চোখ রাখল রানা। দেখল, ওদের তিনজনের দিকে কারবাইন তুলল নাতাশা। কিন্তু পরমুহূর্তে ডু-র দিকে ঘুরিয়ে নিল সেটা। মাথা নিচু করে নিল রানা। গুলি হচ্ছে কিনা বুঝতে পারল না। মাথা নামিয়ে রাখায় ইঞ্জিনের একেবারে কাছে রয়েছে ওর কান, ইঞ্জিনের গর্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। ওদের তিনজন আর নাতাশার মাঝখানে ডু পৌঁচেছে কিনা বোঝার কোন উপায় নেই, আন্দাজের ওপর এবার বাঁ দিকে হ্যান্ডেলবার ঘোরাল ও। মাথা তুলে তাকাল আবার। সাথে সাথে উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচে একটা ফুটো তৈরি হতে দেখল ও। মাথা নামিয়ে নিয়ে হ্যান্ডেলবারটা আরও একটু বাঁ দিকে ঘোরাল। তারপর তাকাল প্রফেসরের কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে। ক্রল করে দূরে সরে যাচ্ছে ডাক্তার, তাকে অনুসরণ করছে মিলটন আর কংকর। ওদের বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পেরে পরম স্বস্তি বোধ করল রানা। ঝুঁকি নিয়ে আবার উঁকি দিয়ে তাকাল সামনে। তীর বেগে ছুটছে ডু, সেটার দিকে কারবাইন তাক করে আছে নাতাশা, সেই সাথে দ্রুত পা ফেলে পিছিয়ে যাচ্ছে। কি ভাবছে সে, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ইচ্ছে করলেই এক ঝাঁক বুলেট ছুঁড়ে দিতে পারে সে, তাতে হয়তো রানার সাথে প্রফেসরও মারা পড়বেন। কিন্তু প্রফেসরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ঝুঁকিটা নিতে চাইছে না সে।

ডু আর উদ্যত কারবাইনের মাঝখানে আর যখন মাত্র এক গজের মত দূরত্ব, লাফ দিয়ে, দক্ষ বুলফাইটারের মত এক পাশে সরে গেল নাতাশা। স্যাঁৎ করে তাকে পাশ কাটাল ডু, ছুটে গেল আরও গজ দশেক। তারপর ব্রেক করল রানা, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ডু। কারবাইন তাক করে ছুটে আসছে নাতাশা। আবার সচল হলো ডু। কিন্তু বাঁক না ঘুরে, পিছু হটতে শুরু করল ধীরে ধীরে। প্রফেসরকে একটা আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে রানা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নাতাশা, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল। ইচ্ছে, পাশ থেকে গুলি করবে রানাকে।

কিন্তু রানা তাকে কোন সুযোগই দিল না। হ্যান্ডেলবার ঘোরাল ও। তারপর থ্রটলের বোতামটা চেপে ধরল। গর্জে উঠল ইঞ্জিন, লাফ দিয়ে ছুটল নাতাশার দিকে। হেরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করল নাতাশা। ডু-র মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল সবগুলো বুলেট। তারপর পিছু হটা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নাতাশা, ছুটল সামনের দিকে। কিন্তু ডু তাকে ছাড়ল না। পিছু ধাওয়া করল।

ছোটার মধ্যে কয়েকবার থামল নাতাশা, আধপাক ঘুরল চরকির মত, ঠা ঠা গুলি করল কারবাইন দিয়ে। তারপর আবার ছুটল সামনের দিকে। সংঘর্ষটা এড়াবার সময় পেল না রানা। প্রফেসরের জন্যে পিছনটা ভাল দেখতে পায়নি ও, নাতাশা সরে গেছে মনে করে ডু থামায়নি। ঝাঁকিটা তাই অপ্রত্যাশিত লাগল ওর কাছে। সীটের পাশ থেকে ওপর দিকে উঠে পড়ল শরীরটা। উইন্ডস্ক্রীনে দুম করে বাড়ি খেল মাথা। হঠাৎ আতঙ্কের একটা ঢেউ অনুভব করল রানা। উল্টে যাচ্ছে ডু। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

জ্ঞান ফিরল ত্রিশ সেকেন্ড পর। দেখল, বরফের ওপর শুয়ে আছে ও। ও-র ওপর ঝুঁকে আছে কংকর। সারা শরীরে ব্যথা অনুভব করল রানা, তবে কংকরের মুখে হাসি দেখে স্বস্তি বোধ করল।

জানতে চাইল, 'ঘটনাটা কি?'

'আপনি ভেবেছিলেন সরে গেছে নাতাশা, কিন্তু যায়নি,' বলল কংকর। 'ডু-র ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে, এখনও জ্ঞান ফেরেনি।'

উঠে বসল রানা। তারপর কারও সাহায্য না নিয়েই উঠে দাঁড়াল। পাঁচ গজ দূরে বরফের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে নাতাশা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। কাত্ হয়ে পড়ে রয়েছে ডুটা। ভেতর থেকে সাবধানে প্রফেসরকে বের করে নিয়ে আসছে ডাক্তার আর মিলটন। চোখ বুজে রয়েছেন প্রফেসর, কিন্তু গোঙাচ্ছেন। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করল ডাক্তার।

'মেয়েটার ওপর চোখ রাখো,' কংকরকে বলল রানা।

'প্রফেসর অক্ষত আছেন,' ঘোষণা করল ডাক্তার।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মিলটনের গলা থেকে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আকাশে তাকাল রানা। কালো একটা বিন্দু, ক্রমশ বড় হচ্ছে। লাফ দিয়ে ডাক্তারের পাশে চলে এল রানা। 'জলদি!' ধরাধরি করে একটা ডুতে তোলা হলো প্রফেসরকে। তারপর রানার পিছু পিছু ছুটল সবাই নাতাশার ফেলে দেয়া কারবাইনগুলো তুলে নেবার জন্যে। কিন্তু মিলটন নড়ল না। নিজের রাইফেলটা

এরই মধ্যে তার হাতে চলে এসেছে। কারবাইন নিয়ে ওরা ফিরে আসার আগেই লাফ দিয়ে উল্টে পড়া ডু-র পিছনে গা ঢাকা দিল সে।

আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে হেলিকপ্টার। তারপর ইঞ্জিনের আওয়াজ পেল ওরা। দেখল, কালো নয়, কমলা রঙের প্রকাণ্ড একটা যান্ত্রিক ফড়িং। আকারে বড় হলো, কিন্তু সোজা ওদের দিকে এল না। এখনও দেখতে পায়নি ওদেরকে—খুঁজছে। এঁকেবেঁকে আসছে খানিক দূর, তারপর সরল রেখা ধরে এগোচ্ছে—পরিচিত একটা সার্চিং প্যাটার্ন। দিক বদলের সাথে বারবার বদলে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। কিন্তু হঠাৎ করে সোজা ওদের দিকে এগোতে শুরু করল ওটা, ইঞ্জিনের আওয়াজ একঘেয়ে আর একই রকম শোনাল ওদের কানে। ধীরে ধীরে বাড়ছে।

ওদের কাছ থেকে প্রায় শ' খানেক গজ দূরে থামল ওটা। বরফ থেকে দেড়শো গজ ওপরে। পাইলটকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, নিজের সীটের ওপর বসে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

অলস ভঙ্গিতে রাইফেল তুলল মিলটন। এখনও বোধহয় ওদেরকে দেখতে পায়নি পাইলট, বোঝার চেষ্টা করছে, খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশে কেউ হাত নাড়ছে না কেন, বরফের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে একটা শরীরই বা পড়ে রয়েছে কেন।

বোঝা গেল, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে পাইলট। নিচে নেমে সরেজমিনে তদন্ত করবে। ফিউজিলাজের একটা দরজার কবাট সরে যেতেই দোর-গোড়ায় এক জোড়া সৈনিককে দেখা গেল, দু'জনের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র।

ঘাড় ফিরিয়ে মিলটনের দিকে তাকাল রানা। মৃদু গলায় বলল, 'ইয়েস।'

ট্রিগারে চাপ দিয়েই বোল্ট টানল মিলটন, ফায়ার করল আবার। কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর একটা ঝাঁকি খেল হেলিকপ্টার, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রোটর। এক হাত দিয়ে দরজার চৌকাঠ ধরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকল সৈনিক দু'জন, অপর হাত দিয়ে গুলি করতে শুরু করল। নিচে ওদের কয়েক গজ সামনে বরফের ওপর পড়ল বুলেট। হঠাৎ করে হেলিকপ্টারের নাক উঠতে শুরু করল ওপর দিকে, এক সময় প্রায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লেজের ওপর। পতনটা শুরু হলো এক মুহূর্ত পর। ভারী একটা পাথরের মত সবেগে নেমে এল নিচে। সংঘর্ষের ফলে অনেকটা ভূমিকম্পের মত কাঁপন উঠল বরফে।

বুম করে একটা আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো আগুন, সাথে সাথে ঘিরে ফেলল হেলিকপ্টারকে। ওদের চোখে-মুখে আঁচের গরম ধাক্কা লাগল। আগুন ঢাকা ধ্বংস স্তূপের মধ্যে থেকে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ বেরিয়ে এল। আরেকটা পেট্রল ট্যাংক বিস্ফোরিত হলো, নাকি বিস্ফোরক বা বোমা ফাটল বলতে পারবে না রানা, কিন্তু আগুনের দেয়ালের ভেতর হেলিকপ্টারের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল সব বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

খানিকটা আগুন ডুগুলোর দিকেও ছুটে গেল। তাই দেখে কাভার থেকে বেরিয়ে এল রানা, ওর পিছু নিল কংকর। মুখের সামনে হাত তুলে আঁচ ঠেকাবার চেষ্টা করল ওরা, ছুটল ডুগুলোর দিকে। লাফ দিয়ে সামনের ডুতে উঠে পড়ল রানা,

রিভার্স গিয়ার দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে নিয়ে এল সেটাকে। অপর ডুটা নিয়ে রানার পাশে পাশে থাকল কংকর।

পঞ্চাশ গজ পিছিয়ে এসে ডু থামিয়ে নেমে পড়ল ওরা। আগুনের ছুটোছুটি বন্ধ হয়েছে, নিভে যেতে শুরু করেছে দ্রুত। হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের পাশে এসে দাঁড়াল ডাক্তার। 'দেখুন!'

ডাক্তারের দৃষ্টি অনুসরণ করে সাগরের দিকে তাকাল ওরা চার কি পাঁচ মাইল দূরে দেখা গেল হোয়াইট স্টারকে, ফুল স্পীডে ছুটে আসছে ওদের দিকে। গাঢ় রঙের পানিতে ওটার বো-ওয়েভ টোয়াইলাইটের শেষ লগ্নের আলো লেগে ঝলমল করছে। খুশিতে নেচে উঠতে ইচ্ছে করল রানার।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের দিকে তাকাল রানা। তারপর উল্টে পড়া ডু-র দিকে। কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মিলটন, তার সামনে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল নাতাশা। হাত বুলাল পাঁজরে। তারপর এদিক ওদিক তাকাল সে। বিধ্বস্ত 'কপ্টারের দিকে সম্মোহিতের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানা আর কংকরের দিকে। পরাজয়ের গ্লানি বা হতাশা, কিছুই ফুটল না চেহারায়। ওদের দিকে এগোল সে। ভাব-ভঙ্গিতে কোন রকম জড়তা নেই।

'দেখো,' হোয়াইট স্টারের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল নাতাশা। তারপর আবার তাকাল রানার দিকে। আরও দু'পা এগিয়ে থামল সে। হতাশা নয়, চোখের দৃষ্টিতে বিজয়ের উল্লাস ফুটে উঠল। 'হেলিকপ্টারটা কোত্থেকে এসেছিল, জানেন?' নাটকীয় ভঙ্গিতে কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিল সে। তারপর আবার বলল, 'জারনোলস্কি থেকে। জারনোলস্কির নাম শোনেননি, এ হতেই পারে না। পারমাণবিক আইসব্রেকার।' হাত তুলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা দেখাল সে।

নাতাশার হাত অনুসরণ করে তাকাল ওরা। দিগন্তরেখার ওপর, ম্লান হয়ে আসা টোয়াইলাইটের আলোয় অস্পষ্টভাবে একটা জাহাজের কাঠামো দেখা গেল আকাশের গায়ে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, বেশ বড় একটা জাহাজ।

নাতাশার রিনিঝিনি হাসি শুনে সংবিৎ ফিরল ওদের। 'হ্যাঁ। ওটার কথাই বলছি। আর্কটিকের সবচেয়ে সেরা জাহাজ জারনোলস্কি। বিশ ফুট বরফ চিরে যেটা চার নট গতিতে এগোতে পারে। নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন। সৈনিক আর নাবিকের সংখ্যা হাজারের ওপর।'

চেহারায় বিজয়ের উল্লাস নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল নাতাশা। 'এখনও কি মনে করেন, জিতেছেন আপনারা? পারবেন পালাতে?'

বারো

অত দূর থেকেও ভীতিকর দেখাল জারনোলস্কিকে। প্রায় পনেরো মাইল দূরে

রয়েছে ওটা। রুপালী দিগন্তরেখায় ছেদ টেনে দাঁড়িয়ে আছে কালো রঙের চারকোণা একটা আকৃতি। শীতের শক্ত মুঠো থেকে রাশিয়ার আর্কটিক নর্থকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব পালন করে আসছে এই আইসব্রেকার অনেক দিন থেকেই। শোনা যায়, আইস-প্যাকের ওপর দিয়ে পোল পর্যন্ত একশো ফুট চওড়া চ্যানেল তৈরি করার ক্ষমতা রাখে সে।

আইসব্রেকার থেকে চোখ সরিয়ে হোয়াইট স্টারের দিকে তাকাল রানা। নিচু গলায় বলল, 'প্রশ্ন হলো, ওটা বরফে নাকি খোলা পানিতে রয়েছে?'

'কিছু এসে যায় কি?' জানতে চাইল ডাক্তার।

'বরফ ভেঙে চার নট গতিতে এগোতে পারে, শুনলেন না? কিন্তু পরিষ্কার পানিতে ওটার গতি পনেরো নট।'

জাহাজ দুটোর দিকে তাকিয়ে দূরত্ব আর গতি আন্দাজ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল ডাক্তার।

ডুতে ফিরে এসে রেডিও অন করল রানা। 'রানা টু ফাইজার। ডু ইউ রীড?'

'ফাইজার টু রানা। লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। দশ কি বারো মিনিটের মধ্যে কিনারায় পৌঁছে যাব বলে আশা করছি। ওভার।'

'বিপদ হতে যাচ্ছে,' বলল রানা।

'আরও?' বিস্মিত শোনাল ফাইজারের গলা। 'এই তো খানিক আগে দেখলাম গুলি করে একটা হেলিকপ্টার ফেলে দিলেন আপনারা!'

'জারনোলস্কি থেকে এসেছিল ওটা,' বলল রানা।

কয়েক সেকেন্ড থ হয়ে থাকল ফাইজার। তারপর উত্তেজিত গলায় বলল, 'সে কি!'

'আমাদের দিকে আসছে ওটা।'

এবার বিষম খেল ফাইজার। 'হোয়াট!' পরমুহূর্তে চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল, 'কোথায়?'

'তোমার পোর্টের দিকে। দক্ষিণে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর তিক্ত একটু হাসি। 'বিনকিউলার ছাড়াই দেখতে পেলাম, আশ্চর্য! অথচ এতক্ষণ টেরই পাইনি!'

'কেটে পড়ো,' নির্দেশের সুরে বলল রানা। 'অন্ধকারে ওটার চোখে ধুলো দিতে পারব আমরা।' সম্ভব নয়, জানে রানা। আর মাত্র দুটো ডু থাকায়, ঘুমন্ত প্রফেসর আর আহত বুতেরাকে নিয়ে গোটা মিশন এই জায়গা ছেড়ে সরে যেতে পারবে কিনা সেটাই সন্দেহের ব্যাপার। রানা ভাবল অন্য কথা, জারনোলস্কি যদি ওদের সাথে হোয়াইট স্টারকেও কোণঠাসা করে ফেলে, তাহলে ওদের বা হোয়াইট স্টারের কারুরই কোন আশা থাকবে না। বড়জোর একজন লোক, সাথে সেসলভকে নিয়ে, ডু-র ফুলস্পীড কাজে লাগিয়ে নিরাপদ অন্য কোথাও থেকে হোয়াইট স্টারে চড়তে চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু রানার নির্দেশ মানতে চাইল না ফাইজার, বলল, 'আমি আসছি। স্ট্যান্ড বাই।'

'কিন্তু সম্ভব নয়!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। 'তুমি বুঝতে পারছ না?'

'পারছি,' গম্ভীর, ভারী শোনাল ফাইজারের গলা। 'কিন্তু আর কোন উপায় নেই আমার।'

ঠিক কি বলতে চাইল ফাইজার, তখুনি বুঝতে পারল না রানা। বুঝল বেশ খানিক পরে।

রেডিও অফ করে ডু থেকে বেরিয়ে এল রানা, বিনকিউলার তুলে তাকাল হোয়াইট স্টারের দিকে। ঢেউয়ের ঝুঁটি মাড়িয়ে দ্রুত ছুটে আসছে ট্রলার। কিন্তু যত কাছে এগিয়ে আসছে, ততই ছোট হয়ে আসছে তার বো-ওয়েভ। বো-র দু'দিকে কর্কশ উলেন কাপড়ের মত একটা পর্দা দেখা গেল, বো-র সাথে ধাক্কা খেয়ে বরফের ছোট বড় চাঁই গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, গুঁড়োগুলো সেঁটে থাকছে জাহাজের নাকে। এগুলোর সাথে সংঘর্ষ ঘটলে জারনোলস্কির কিছুই এসে যাবে না, কিন্তু বড় একটা টুকরোর সাথে ধাক্কা লাগলে ডুবে যেতে পারে হোয়াইট স্টার।

'ওই দেখুন!' জারনোলস্কির দিকে একটা হাত তুলল মিলটন।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল ডাক্তার। 'আইসব্রেকার ঘুরছে।' খানিক আগে পর্যন্ত শুধু বো দেখা যাচ্ছিল, এখন তার একটা পাশ দেখা গেল। এই তৎপরতার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের। ফুল স্পীড কাজে লাগাবার জন্যে খোলা, পরিষ্কার পানিতে যেতে চাইছে আইসব্রেকার। ওরা তাকিয়ে আছে, এই সময় ছোট, লম্বাটে একটা আকৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যে চড়ল। আরেকটা হেলিকপ্টার।

কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল মিলটন। নিজেকে অভয় দানের একটা ভঙ্গি মাত্র, কারণ এখনও কয়েক মাইল দূরে রয়েছে হেলিকপ্টারটা।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'চলো, বরফের কিনারার দিকে এগোই।' সম্ভবত সিকি মাইল যেতে হবে ওদেরকে।

পিছনের সীটে প্রফেসর সেসলভকে নিয়ে একটা ডুতে চড়ল কংকর। অপরটায় বুত্তেরাকে নিয়ে ডাক্তার। টো লাইন তুলে নিতে নিতে নাতাশার দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মিলটন। 'ওর কি হবে?'

'আমি নিয়ে যাব।' ওরা রওনা হয়ে গেল, তারপর নাতাশার দিকে ফিরল রানা, বলল, 'হাঁটো।'

'না,' দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল নাতাশা। 'এখান থেকে নড়ছি না আমি।'

'হাঁটো,' আবার বলল রানা।

মাথা নাড়ল নাতাশা। 'কেউ আমাকে নড়াতে পারবে না। ইচ্ছে করলে গুলি করতে পারেন।'

নিতাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল রানার। প্রতিশোধ নেবার একটা ঝোঁক চেপে বসল মাথায়, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করল ও। তারপর কারবাইন তুলেই গুলি করল। নাতাশার পায়ের পাশে বরফে লাগল গুলি। 'এরপর পায়ে লাগবে।'

কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল নাতাশা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল, যেন সুযোগ পেলে দেখিয়ে দেবে বলে শাসাল ওকে। রাগের সাথে পা ঠুকে অনুসরণ করল ডুগুলোকে। তার ছয় ফিট পিছনে থাকল রানা। কারবাইনটা তার পা লক্ষ্য করে ধরে আছে।

এগোল বটে, কিন্তু একটু পরই হাঁটার গতি কমিয়ে ফেলল নাতাশা। প্রায়ই

থামছে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে হেলিকপ্টারের দিকে। দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা।

নাতাশাকে তাড়াতাড়ি হাঁটাবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো রানার। একটু পরপরই থামল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, এবং রানা তার কপাল লক্ষ্য করে কারবাইন না তুললে দাঁড়িয়েই থাকল।

'আর বেশি দেরি নেই,' রানাকে বলল সে। 'এই এসে পড়ল বলে।'

পিছন দিকে তাকাবার প্রয়োজন হলো না, রোটরের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। এরপর থেকে মাঝে মধ্যে মাথা সোজা করে সামনের পথটা দেখল নাতাশা, বাকি সময় মাথা ঘুরিয়ে রেখে চোখ রাখল 'কপ্টারের ওপর।

বরফের কিনারায় এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে ডাক্তার আর কংকর। রানার দৃষ্টি নাতাশাকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল, দেখল, ইঙ্গিতে হেলিকপ্টার দেখিয়ে ওকে তাড়াতাড়ি এগোতে বলছে ওরা অথচ ছুটে দূরত্বটুকু পার হয়ে যাবে রানা, তার কোন উপায় নেই। মেয়েটার পিছু পিছু এক পা এক পা করে হাঁটতে হলো ওকে। পিছনে বাড়ছে হেলিকপ্টারের গর্জন। পিছন ফিরে হাঁটছিল নাতাশা, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল বরফের ওপর। পড়ল, আর উঠল না। চেষ্টা করল, কিন্তু চোখে মুখে ব্যথার ভাব ফুটিয়ে তুলে বোঝাতে চাইল, পারছে না। পিছনে, এবং খানিকটা বাঁ দিকে তাকাল রানা। আর বড়জোর দুশো গজ দূরে রয়েছে 'কপ্টার। খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইফেল হাতে একজন সৈনিক।

স্যাৎ করে কারবাইন ঘুরিয়ে কোমরের কাছ থেকে এক ঝাঁক বুলেট ছুঁড়ল রানা। মোক্ষম কোন জায়গায় আঘাত করতে পারবে বলে আশা করল না ও, দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেই যথেষ্ট।

কিন্তু না! দ্রুত ছুটে এসে রানার একেবারে মাথার ওপর দাঁড়াল হেলিকপ্টার। কারবাইন তুলে ট্রিগার টিপতে যাবে রানা, এই সময় হিংস্র বাঘিনীর মত ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নাতাশা। ঠিক আগের মুহূর্তে চোখের কোণে দেখতে পেল রানা, বাঁ হাতের কনুই চালাল নাতাশার দিকে। পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ছিটকে পড়ল নাতাশা। ধাক্কা লাগায় হাতের কারবাইন নড়ে গেল রানার, বরফের ওপর এক ঝাঁক বুলেট গেঁথে গেল। মুখ তুলে ওপরে তাকাতেই দেখল, দোর-গোড়া থেকে ওর দিকে রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করছে একজন সৈনিক।

কারবাইন তুলতে শুরু করল রানা, কিন্তু তার আগেই ঠাস করে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ হলো। ঝট করে বাঁ দিকে তাকাল রানা দেখল, বরফের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আবার ফায়ার করছে মিলটন। প্রথম বুলেটটাই 'কপ্টারের গায়ে কোথাও লাগল, দ্রুত আড়াআড়িভাবে সরে যেতে শুরু করল পাইলট। দোর-গোড়ায় দাঁড়ানো সৈনিক গুলি করল বটে, কিন্তু রানার কাছ থেকে অনেকটা দূরে পড়ল বুলেট।

রাইফেল রেঞ্জের বাইরে সরে গেল 'কপ্টার, কিন্তু এক চক্কর ঘুরে আরেক দিক থেকে আবার রানার দিকে এগোল সেটা। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল রানার, অচেতন নাতাশাকে কাঁধে তুলে নিল ও, আশা করল মেয়েটাকে লাগবে ভেবে গুলি করবে না সৈনিক।

'কপ্টার বা মিলটন কারও দিকে না তাকিয়ে ছুটল রানা। 'কপ্টারের গর্জন

সমস্ত আওয়াজ চাপা দিয়ে রেখেছে বলে ডু-র আওয়াজ পায়নি ও। হঠাৎ দেখল, লীডারকে বাঁচাবার জন্যে অসম সাহসের সাথে ডু নিয়ে ছুটে আসছে ডাক্তার, পিছনে টো লাইনের শেষ মাথায় স্কির ওপর দেখা গেল মিলটনকে। পিছনের দিকে ঝুঁকে আছে মিলটন, হাঁটু দুটো ভাঁজ করা। টো লাইন জোড়া লাগানো হয়েছে তার বেল্টের সাথে, হাতে রয়েছে রাইফেল। দ্রুত এগিয়ে এল ডু, সেই সাথে 'কপ্টারকে লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি করল মিলটন। সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে রাগের সাথে একটা ঝাঁকি খেয়ে সরে যেতে শুরু করল 'কপ্টার। রানার পাশে থামল ডু। এই সুযোগে আবার একটা গুলি করল মিলটন। লাগল কিনা বুঝতে পারল না রানা, কিন্তু দেখল আরও খানিক দূরে সরে গেল পাইলট।

'গুড শূটিং!' ডু আর 'কপ্টারের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা।

মৃদু হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সবিনয় একটা ভঙ্গি করল মিলটন।

'জলদি!' ডু-র ভেতর থেকে মাথা বের করে তাগাদা দিল ডাক্তার। 'মেয়েটাকে তুলুন!'

ডু-র পিছনের সীটে তোলা হলো অচেতন নাতাশাকে। খোলা দরজার সামনে, ফুটবোর্ডে দাঁড়াল রানা। ডু ছেড়ে দিল ডাক্তার। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে বরফের কিনারায় পৌঁছে গেল ওরা। 'কপ্টারের দিকে চোখ রাখল সবাই, কিন্তু সেটা পিছু ধাওয়া করল না।

চরম সঙ্কটময় একটা পরিস্থিতি। ডু থেকে নেমেই ভয়াবহ সমস্যাটা চোখের সামনে দেখতে পেল রানা। বরফের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, নিচের দিকে পনেরো ফিট খাড়া নেমে গিয়ে সাগরে ডুবে গেছে পাঁচিলের গা। ভেতরে অটার প্লেন নিয়ে ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে বরফের দ্বীপের ওপর, নাক বরাবর দু'মাইল সামনে। বাঁ দিক থেকে হোয়াইট স্টার নিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে স্কিপার ফাইজার। রানার বাঁ এবং পিছনে আইস-প্যাক থেকে বেরিয়ে এসে পরিষ্কার পানি কেটে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে আইসব্রেকার জারনোলস্কি। মাথার ওপর, মিল্টনের রাইফেল রেঞ্জের বাইরে, অপেক্ষা করছে হেলিকপ্টার।

সন্দেহ নেই, ফাইজারই ওদের কাছে আগে পৌঁছবে। কিন্তু আহতদের নিয়ে হোয়াইট স্টারে চড়তে বেশ সময় লাগবে ওদের, সেই সুযোগে জারনোলস্কি খোলা সাগরের দিক থেকে এগিয়ে এসে ওদেরকে যদি কোণঠাসা করে ফেলে, তাহলেই সর্বনাশ! উন্মুক্ত সাগরে বেরোবার পথ বন্ধ হয়ে গেলে প্যাক আইসের কিনারায় বা কোণে আটকা পড়ে যাবে ওরা। এক হাজারের ওপর লোক আছে আইসব্রেকারে, ওদেরকে তারা মৌমাছির মত ছেঁকে ধরবে। ওদের জন্যে ক্ষীণ একটু আশার কথা, রাশিয়ানরা জানে না দু'মাইল দূরে ওই ঘরের ভেতর একটা প্লেন আছে।

যতই তাড়া অনুভব করুক, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই ওদের। হোয়াইট স্টার নিয়ে ছুটে আসছে ফাইজার, সেদিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। নিরীহ ফিশিং বোট হলে কি হবে, আগাগোড়া যুদ্ধ-জাহাজের মত দেখতে লাগে তাকে। মাত্র বারো নট গতিতে আসছে বটে, কিন্তু আসছে সগর্বে, লেজের ওপর বসে, বেশ একটু উঁচু হয়ে আছে বো।

এখনও এক মাইল দূরে। আধমাইল দূরে। প্রতি সেকেন্ডে কাছে চলে আসছে। চারশো গজ। আর মাত্র এক ক্যাবল দূরে। গতি কমাবার কোন লক্ষণ নেই। যেন বরফের পাঁচিলে ধাক্কা দেবার জন্যেই আসছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, ঘুরতে শুরু করল হোয়াইট স্টার। আধ পাক ঘুরে গেল সে, ধীর ভঙ্গিতে থামল পাঁচিলের গায়ে।

হুইল হাউস থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ফাইজার। ডেরিকের একটা ঝুলন্ত লূপে চড়ে রানাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল সে। একমুহূর্ত পর বরফের ওপর, রানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল তাকে। সবার মুখের দিকে একবার করে তাকাল সে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হোয়াইট স্টারের দিকে ফিরে মুখের সামনে হাত তুলে চোঙ তৈরি করল, চিৎকার করে বলল, 'এক জোড়া স্ট্রেচার!'

ডেরিকের সাহায্যে দুটো স্ট্রেচার পাঠানো হলো জাহাজ থেকে। একটায় প্রফেসর সেসলভকে তুলে দিল কংকর। অপরটায় বুতেরাকে তুলল রানা। একটা একটা করে দুটো স্ট্রেচার নামানো হলো হোয়াইট স্টারের ডেকে। আবার বরফে ফিরে এল ডেরিক, একজন একজন করে জাহাজে নিয়ে গেল ওদেরকে। ইতোমধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে নাতাশার, রানার পিঠে ঝুলে জাহাজে যাবার সময় হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সে।

ডেকের ওপর নাতাশাকে নামিয়ে দিয়ে খোলা সাগরের দিকে তাকাল রানা। অনেক কাছে চলে এসেছে জারনোলস্কি, পৌঁছতে খুব বেশি সময় নেবে না।

তেরো

বরফের কিনারা থেকে সাবলীল ভঙ্গিতে সরে এল হোয়াইট স্টার। ইঞ্জিন রূমের কাছ থেকে ফুল পাওয়ার চাইল ফাইজার। পেলও সাথে সাথে। একটু বাঁক নিয়ে আইস-প্যাকের আরও গভীরে ছুটিয়ে নিয়ে চলল হোয়াইট স্টারকে।

ছোট্ট হুইল হাউসের ভেতর ফাইজারের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার আর রানা।

'আমরা খোলা পানির দিকে যাচ্ছি না কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ডাক্তার।

ধীরে ধীরে ডাক্তারের দিকে ফিরল স্কিপার ফাইজার।

'ওদের স্পীড বেশি। ধরে ফেলবে। তাই একটু লুকোচুরি খেলব।'

বুঝতে না পেরে প্রথমে রানা, তারপর আবার ফাইজারের দিকে তাকাল ডাক্তার। 'অর্থ?'

'এছাড়া উপায় নেই,' মৃদু হাসল ফাইজার। 'টোয়াইলাইটের আলো নিভে যেতে শুরু করেছে, তাই না? অন্ধকারে খেলাটা জমবে ভাল।'

'খেলা জমবে?' বিস্ময় তবু কাটে না ডাক্তারের। 'নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, হেলিকপ্টার, রাডার ইত্যাদি রয়েছে ওদের?'

চোখ ইশারা করে ফাইজার বলল, 'আমাদের রাডারের দিকে তাকান।'

হুইল হাউস রিপিটার স্ক্রীনে জ্বলজ্বল করছে সবুজ আলো। আঙুল দিয়ে ওদেরকে ভাঙা বরফের আউটলাইন দেখাল ফাইজার।

'দেখছেন?' বলল সে। 'বড় অদ্ভুত ভাবে ভেঙেছে বরফ, তাই না?'

ডাক্তার এবং রানা, দু'জনেই দেখল। যে বিশাল বরফ দ্বীপের ওপর ঘরটা রয়েছে সেটার আকৃতি হুবহু ইংরেজী বর্ণমালার 'U'-এর মত। ওদিকে, বরফ প্রান্তরের গায়ে বিশাল যে ফাঁকটা সৃষ্টি হয়েছে সেটার আকৃতিও আরেকটা ইউ।

'জারনোলস্কি আমাদেরকে আইস-প্যাকের ইউয়ের ভেতর আটকে ফেলেছে, তাই না? এখন সে কি করবে, ধারণা করতে পারেন?'

মাথা নাড়ল ডাক্তার।

হেসে উঠল ফাইজার। 'আমরা যদি ইউয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই পৌঁছে যায় জারনোলস্কি, তাহলে শুধু মুখের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত বারবার পায়চারি করলেই উদ্দেশ্য হাসিল হবে তার। আমরা যদি বেরুতেই না পারি, পালাব কিভাবে?'

'তার মানে ওটা পৌঁছুবার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ফাইজার। 'শুধু বেরুলেই যে পালাতে পারব, তাও নয়। দেখছেন না, আমাদের বাঁ দিকে রয়েছে জারনোলস্কি, খোলা সাগরও ওদিকটাতেই। ইউ থেকে বেরুলেই বা কি, বাঁ দিকে যদি যেতে না পারি, আইস-প্যাকের দিকে কোণঠাসা হয়ে পড়ব আমরা। সন্দেহ নেই, ইউ থেকে আমাদের বেরুতে দেখলে বাঁ দিকে, সাগরে বেরুবার পথে কড়া পাহারা বসাবে ওরা।'

'তাহলে উপায়?'

আবার হাসল ফাইজার। 'বললাম তো, অন্ধকারে ওদের সাথে আমরা লুকোচুরি খেলব। ডাক্তার সাহবে, আলোর কি অবস্থা বলুন তো?'

'ফুরিয়ে যাচ্ছে,' বলল ডাক্তার। 'খুব তাড়াতাড়ি।'

'কাজেই আমরা এবার খেলা শুরু করতে পারি।'

পানির ওপর অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। সোজা নয়, সাপের মত এঁকেবেঁকে এগোল হোয়াইট স্টার। টোয়াইলাইটের আলো যেমন হঠাৎ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই বরফ আর পানির ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় ক্রমশ, দ্রুত ছোট হয়ে এল দিগন্তরেখা। একটা বোতামে চাপ দিয়ে নির্দেশ দিল ফাইজার, 'রাইডিং লাইট সহ সমস্ত আলো অফ করে দাও।'

অন্ধকার হয়ে গেল গোটা জাহাজ। মেইন প্যাকের গা ঘেঁষে, টুকরো-টাকরা ভাসমান বরফের মাঝখান দিয়ে এগোল সে। তারপর দিক বদল করল এক সময়, রওনা হলো বিচ্ছিন্ন ইউ লক্ষ্য করে।

'আইসব্রেকারের রাডারে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত লাগছে আমাদের আচরণ,' বলল ফাইজার। 'শিকারী বিড়ালের কাছ থেকে পালাবার জন্যে দিশেহারার মত ছুটোছুটি করছি। দেখুন, দেখুন!'

ইউ থেকে বেরিয়ে এসেছে হোয়াইট স্টার, সেটা দেখতে পেয়ে খোলা সাগর-

বুকে বেরোবার পথে ঘুরে গেছে জারনোলস্কি, ফেলে আসা পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে আবার। ফাইজারের কথাই ঠিক। পায়চারি শুরু করেছে আইসব্রেকার।

'তবে, কতক্ষণ পায়চারি করবে বলা কঠিন,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই সারারাত অপেক্ষা করবে না ওরা।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল ফাইজার। 'দু'তিন বার যাওয়া-আসা করবে, তারপর হয়তো কোণঠাসা করার জন্যে ঢুকে পড়বে ডান দিকে। কিন্তু ততক্ষণে আমরা পৌঁছে যাব…'

দক্ষিণ আকাশের গায়ে চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টারটা। সদ্য কালো হয়ে ওঠা আকাশে তার আলো ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে। যথাসম্ভব কম আওয়াজ করে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে হোয়াইট স্টার। অনেক কাছে চলে এসেছে ঘরটা, বরফের তৈরি বিশাল ইউটাকে আবছাভাবে একটা দ্বীপের মত লাগল দেখতে। ঠিক যেখানে বেঁকে যেতে শুরু করেছে তার কাছাকাছি খাড়া হয়ে রয়েছে ঘরটা। এখন মোটামুটি আশা করা যায়, নিরাপদেই দ্বীপে পৌঁছুতে পারবে ওরা। মনে আছে রানার, পাইলট ছাড়া অটারে আরও একজনের থাকার কথা। তারা দু'জন মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকলেই হয় এখন। ওদের জন্যে তারা সব রেডি করে না রাখলে, ওখানে পৌঁছেও লাভ হবে না। ঘরটা খাড়া করে তাদের দু'জনকে তাতে রেখে যাবার পর নিশ্চয়ই অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারা, প্যাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ঘটনাটার তো তুলনাই হয় না, তারপরও তারা যদি বহাল তবিয়তে থাকে, অবশ্যই বাহবা দিতে হবে।

রাতের আকাশে ঘুরে গিয়ে অলস ভঙ্গিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল হেলিকপ্টার। ওরা কি করছে না করছে চেক করতে চায় পাইলট। করার মত বিশেষ কিছু নেই ওদের, নিশ্চয়ই এই রকম একটা স্পষ্ট ধারণা পোষণ করছে সে। জানে, একমাত্র বাঁ দিক ছাড়া পালাবার পথ নেই। সেদিকে কড়া পাহারা দিচ্ছে আইসব্রেকার।

হোয়াইট স্টারকে ডান দিকে ঘুরিয়ে নিল ফাইজার। একটা বড়সড় বরফের টুকরোকে পাশ কাটাল সে। তারপর আবার দিক বদলে এগোল দ্বীপের দিকে।

'আর শ' দুয়েক গজ,' বলল রানা। 'তারপর আড়ালে চলে যাব, আইসব্রেকার থেকে ওরা আর দেখতে পাবে না আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল ফাইজার। 'তখনই ঘাবড়ে যাবে ব্যাটা। হয়তো সাথে সাথে নয়, মিনিট কয়েক পর। শিকার চোখের আড়াল হলে শিকারীর মনে নানা সন্দেহ জাগে।'

সেই থেকে আকাশে অবিরাম বৃত্ত রচনা করে চলেছে হেলিকপ্টার। কাছাকাছি আসার সাহস নেই, মিলটনকে ওদের ভারী ভয়। মেইন আইস-প্যাকের কাছাকাছি চলে এসেছে আইসব্রেকার জারনোলস্কি, বিশাল ইউ আকৃতির ফাঁকের কাছে তার লাল সবুজ আলো দেখা গেল। সাবলীল গতিতে দ্বীপের উঁচু গা ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে হোয়াইট স্টার।

অপেক্ষার মুহূর্ত শেষ হলো।

'ডেরিক দাও আমাকে,' বলল রানা। লুপে পা দিয়ে আট ফিট ওপরে উঠল ও,

রশির ওপর দিয়ে হেঁটে ডেক ছাড়িয়ে বরফ সারফেসের দিকে এগোল। বরফে পা দিয়ে চারদিকটা দেখে নিল ভাল করে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকাল। 'এখান থেকে বড়জোর দেড়শো গজ দূরে। সমতল সারফেস।' একটু থেমে আবার বলল, 'মিলটন।'

ডেরিকের সাহায্যে বরফের দ্বীপে উঠে এল মিলটন, সাথে সাথে ঝুঁকে পড়ে পায়ে স্কির স্ট্র্যাপ বাঁধতে শুরু করল সে।

নিচের হোয়াইট স্টার থেকে শুনতে পেল ডাক্তার, মিলটনকে নির্দেশ দিচ্ছে রানা, 'তাড়াতাড়ি যাও, বিপদের কথা বলো পাইলটকে। কিন্তু আমাদের বাকি সবাই বরফে পা না দেয়া পর্যন্ত কোন আলো বা ইগনিশন নয়। যখন দেখবে উঠতে আর কেউ বাকি নেই, পাইলটকে প্লেনের ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে বলবে, সোজা এদিকে চলে আসবে সে। প্রফেসর আর বুতেরাকে এখান থেকে প্লেনে তোলা সহজ হবে।'

'ঠিক আছে,' স্কি চড়ে রওনা হলো মিলটন, হোয়াইট স্টার থেকে তাকে আর দেখতে পেল না ডাক্তার।

বরফের কিনারা থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'প্রথমে প্রফেসর, তারপর বুতেরা।'

ডেরিকের সাথে স্ট্রেচারের হুক আটকানো হলো। চোখ বুজে আছেন প্রফেসর, কিন্তু বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন তিনি। শুনতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না ওরা। বরফের ওপর পৌঁছে গেল স্ট্রেচার। এরপর পাঠানো হলো বুতেরার স্ট্রেচার।

কংকর জানতে চাইল, 'ফাইজার ভায়া, মেয়েটাকে রাখতে চাও নাকি? আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, খুব ঝাঁঝ!'

হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল স্কিপার ফাইজার। 'মাফ চাই। আমার বউটাও কম না!'

ডেরিক থেকে বরফে নামল নাতাশা। ট্রলারের ডেক থেকে ডাক্তার ও কংকর, আর বরফ থেকে রানা কাভার দিল তাকে।

'এবার আপনি,' ডাক্তারের পিঠে হাত দিয়ে মৃদু ঠেলা দিল কংকর।

'ফাইজারের কি হবে?' জানতে চাইল ডাক্তার।

'আমার কাজ এখনও বাকি আছে,' বরফের কিনারায়, প্রফেসরের কাছে দাঁড়ানো রানার দিকে চট করে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল স্কিপার ফাইজার। 'তবে আমাদের জন্যে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। আমরা ঠিকই কেটে পড়তে পারব।'

দু'মিনিটের মধ্যে হোয়াইট স্টার থেকে বরফের দ্বীপে উঠে এল ওরা সবাই। কিনারার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে রইল সোজা দেড়শো গজ দূরে, ঘরটার দিকে। ঘরের ভেতর বা তার আশপাশের ছায়ায় কোনরকম নড়াচড়া লক্ষ করা গেল না। ওদের পিছনে এবং নিচে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে হোয়াইট স্টার। ইঞ্জিন চালু।

'কি ব্যাপার?' ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল রানা।

'ডিউটি শেষ হয়নি,' ডেক থেকে বলল ফাইজার। 'দেখে যেতে চাই, আপনারা নিরাপদে রওনা হয়ে গেছেন। অর্ডার!'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার ব্যাপারটা কেমন যেন বিদঘুটে লাগল। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়!

একমুহূর্ত পর একটা গর্জন ভেসে এল। ঘরের সামনের দেয়াল ধসে পড়ল হঠাৎ, ভেতর থেকে অলস ভঙ্গিতে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল অটার প্লেন। প্লেনের এক পাশে দেখা গেল মিলটনকে, হাত-ইশারায় দিক নির্দেশ দিচ্ছে পাইলটকে। স্কির ওপর খানিকটা ঘুরে গেল প্লেন, তারপর এগোতে শুরু করল ওদের দিকে।

ওদের কয়েক গজের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল প্লেন। পেটের দরজা খুলে গেল, সাথে সাথে নামিয়ে দেয়া হলো একটা সিঁড়ি।

সিঁড়ির মাথায় একজন লোককে দেখা গেল, পরনে আর্কটিক পোশাক, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। সোজাসুজি রানার বুক লক্ষ্য করে ধরে আছে সেটা। গুরু গুরু মেঘের ডাকের মত গম্ভীর গলায় বলল, 'বী কেয়ারফুল!' দোর-গোড়ায় দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে, তার পায়ের ফাঁক গলে সিঁড়ির নিচের ধাপে বেরিয়ে এল এক, দুই করে আরও চারজন লোক। সবার পরনে আর্কটিক পোশাক, হাতে রাইফেল।

তাদের মধ্যে একজন ঠাণ্ডা সুরে সাবধান করে দিল, 'দয়া করে নড়বেন না কেউ!' সিঁড়ির নিচে দাঁড়ানো দলটার দিকে রাইফেল তাক করে সন্তর্পণে নামতে শুরু করল তারা।

পাশে দাঁড়ানো কংকরের সাথে চোখাচোখি হলো রানার। তারপর সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল ও। 'এসবের মানে?'

'ইউ.এস. আর্মি ইন্টেলিজেন্স,' সিঁড়ির মাথা থেকে আবার গম গম করে উঠল সেই ভারী কণ্ঠস্বর। 'অনেক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মি. রানা। সাহায্য করার জন্যে মার্কিন সরকার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, আপনাদেরকে আর কষ্ট করতে হবে না। প্রফেসর সেসলভের দায়িত্ব এখন থেকে আমরাই নিচ্ছি।'

কিছুই দুর্বোধ্য লাগল না, সবই পরিষ্কার বুঝল রানা। কোন মার্কিন নাগরিক বা সরকারী কর্মচারী আর্কটিক রাশিয়ার বর্ডার টপকালে রাশিয়া সেটাকে অনুপ্রবেশ, বৈরী আচরণ ইত্যাদি অভিযোগ তুলে মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে, তাই প্রফেসর সেসলভকে উদ্ধারের জন্যে যে মিশন পাঠানো হয়েছিল তাতে কোন আমেরিকানকে রাখা হয়নি। কিন্তু বিদেশী লোকজন দিয়ে গড়া মিশনটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি মার্কিন প্রশাসন। তাদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করছিল। সহস্র মৌমাছির কামড় খেয়ে মিশনটা যেই মধু নিয়ে পৌঁছল, অমনি সেই মধু নিজেদের বোতলে ভরতে চাইছে তারা। ফাইজারের বিদঘুটে আচরণের কারণও পরিষ্কার হয়ে গেল। প্লেনে সব লোকের জায়গা হবে না, ওদেরকে নিরস্ত্র করার পর ইউ.এস. আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কিছু লোককে সরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পড়েছে তার কাঁধে, সেজন্যেই বিপদের

মধ্যেও তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার চেষ্টা করেনি সে। আরেকটা সম্ভাবনার কথা ভাবল রানা। ফাইজার ব্রিটেনের নাগরিক, তা সত্ত্বেও তাকে অনেকটা বিশ্বাস করছে মার্কিন প্রশাসন, মিশনের ভেতরেও তার মত কেউ নেই তো। যে আগাগোড়া সব জানে? মিশনের ভেতরে থেকে দলের আর সবার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে আসছে? একটু চিন্তিত দেখাল রানাকে। একটু যেন দুঃখও পেল ওকে অবিশ্বাস করা হয়েছে বলে। সি.আই.এ. হঠাৎ তার সাথে এ রকম ব্যবহার করে বসবে—এতটা যেন সে আশা করেনি।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল ও, 'বললেন, মার্কিন সরকার আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। স্বীকার করতেই হবে, কৃতজ্ঞতার এমন অভিনব নমুনা বড় একটা দেখা যায় না। যাই হোক, যা ঘটছে আমি তার প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম। আপনারা কথার বরখেলাপ করলেন। তা, এখন কি করতে হবে আমাদের?'

রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি লোকটা, সহকারীদের উদ্দেশে বলল, 'কাজ শুরু করো তোমরা।'

'বরফের ওপর যে-যার পিস্তল আর কারবাইন ফেলে দিন,' সিঁড়ি থেকে নিচে নেমে এল চারজন, তাদের মধ্যে থেকেই কথা বলল একজন। 'দয়া করে কেউ নিজের কাছে কোন অস্ত্র রাখবেন না। যদি রাখেন, কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে আমরা দায়ী থাকব না।'

সাথে সাথে প্রতিবাদ করল রানা। 'কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না, বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা? এই অবস্থায় হাতে আর্মস না থাকলে সবাই মারা পড়ব!'

সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হলো রানার প্রতিবাদ। যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রত্যেককে সার্চ করা হলো। প্রফেশনাল লোক এরা, এক সেকেন্ডের কাজ আধ সেকেন্ডের মধ্যে সারল। কিন্তু কাজে কোন খুঁত রাখল না। মিশনের হাতে বন্দী হলেও, নাতাশাকেও সার্চ করতে ছাড়ল না তারা। সবার কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে গোণা হলো। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো রানাকে, 'আরও আর্মস থাকার কথা, কোথায় সেগুলো?'

অস্ত্র ও নেতৃত্ব কেড়ে নেয়ায় কেমন যেন ন্যাংটো আর বোকা বোকা দেখাচ্ছে রানাকে। তাই দেখে কেন যেন ডাক্তারের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

নাতাশাকে দেখাল রানা, বলল, 'আমাদের সবাইকে হ্যান্ডস আপ করিয়েছিল ও। সব আর্মস ডু থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দূরে। সবগুলো উদ্ধার করতে পারিনি আমরা।'

এতক্ষণে স্কিতে চড়ে ওদের কাছে পৌঁছল মিল্টন। সবাই দেখল তার হাতে রাইফেল রয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তুলল না। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল ডাক্তারের। পরিষ্কার বুঝল, ঠকানো হয়েছে লীডারকে, সেই প্রথম থেকেই।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মারা পড়ব আমরা,' বলল রানা। 'আমি জানতে চাই, কি অন্যায় করেছি আমরা যে আত্মরক্ষারও সুযোগ পাব না?'

সিঁড়ির মাথা থেকে লোকটা বলল, 'আমি ছাড়া আমার দলের আর সবাই

হোয়াইট স্টারে চড়বে। আপনারা সবাই এখন নিরস্ত্র, কাজেই আহত আর অসুস্থদের নিয়ে উঠতে পারেন প্লেনে। আশা করি কেউ কোন রকম চালাকি করতে গিয়ে নিজের বিপদ্ ডেকে আনবেন না। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমার চারজন লোক চলে গেলেও প্লেনে আমি একা হয়ে যাব না।' তার কথা শেষ হবার আগেই সশস্ত্র চারজন লোক বরফের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল হোয়াইট স্টারের দিকে।

কথা না বলে কংকরের দিকে তাকাল রানা। দু'জন এক সাথে ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল প্রফেসরের স্ট্রেচার। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেল ওরা। ছোট কেবিনে স্ট্রেচার নামিয়ে রেখে দ্রুত নেমে এল আবার। এরপর বুতেরাকে কেবিনে রেখে এল ওরা। পা থেকে স্কি খুলে ফেলেছে মিলটন। অটারের কাছে থেকে পাঁচ ছয় গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে; ফায়ার করার জন্যে তৈরি রেখেছে হাতের রাইফেল। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রানা দেখল, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। পরমুহূর্তে ঝট করে রানার দিকে ফিরল, বলল, 'জলদি, মি. রানা! আইসব্রেকার থেকে ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে!'

আকাশে তাকাল রানা। অটারের আওয়াজে চাপা পড়ে গেছে হেলিকপ্টারের শব্দ, কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক কাছে চলে এসেছে সেটা, ওপর থেকে নেমে আসছে আইস সারফেসের দিকে।

'উঠে পড়ো সবাই!' দ্রুত বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বরফের কিনারা থেকে সরে যেতে শুরু করেছে হোয়াইট স্টার।

'মেয়েটার কি হবে?' জানতে চাইল ডাক্তার।

সিঁড়ির মাথা থেকে ইউ.এস. আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোকটা বলল, 'আমাদের সাথে যাবে ও। ভবিষ্যতে আমাদের কারও বিনিময়ে ওকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি।'

পিছন থেকে নাতাশার পিঠে রাইফেল ধরল মিলটন। 'প্লেনে ওঠো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল নাতাশা। তার পিছনে থাকল কংকর। কংকরের পিছনে ডাক্তার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওরা। নিচে রয়ে গেল মিলটন।

চোখ তুলে হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, ওর পাশে এসে দাঁড়াল মিলটন। সে-ও তাকিয়ে আছে 'কপ্টারের দিকে। পাইলটের মতলব টের পেতে অসুবিধে হলো না ওদের। বরফ-দ্বীপের মাত্র কয়েক গজ ওপরে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কেবিনের পাশের দরজাটা খোলা। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বরফের ওপর বসে পড়বে ওটা। লাফ দিয়ে নামবে আর্কটিক পোশাক পরা সশস্ত্র লোকজন। গুলি করতে করতে ছুটে আসবে ওদের দিকে।

একটা হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো মিলটন, রাইফেল তুলল। 'পাইলট ভয় পায় কিনা দেখি,' মৃদু গলায় বলল সে। 'যত নিচেই থাক, বরফের ওপর আছাড় খেলে দু'একজনও বাঁচবে কিনা সন্দেহ।'

সাইটে চোখ রাখল সে। রানা দেখল, ধীরে ধীরে ট্রিগার টেনে ধরছে তার আঙুল। শেষ টানটা দেবার আগে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল সেটা। তারপরই শোনা গেল তীক্ষ্ণ একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ।

নাইট গ্লাসে চোখ রেখে দেখল রানা, 'কপ্টারের ককপিট গ্লাসে একশো একটা

চিড় ধরে গেছে। পাশ থেকে ক্লিক আওয়াজ পেল বোল্ট টানার, তারপর আরেকটা তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের শব্দ। গ্লাসের আরও একটা প্যানেলে মাকড়সার জালের মত চিড় ধরল। সম্পূর্ণ শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে পর পর পাঁচবার গুলি করল মিলটন। নার্ভাস হয়ে পড়ল পাইলট, হঠাৎ দ্রুত গতিতে হেলিকপ্টার তুলে নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে রেঞ্জের বাইরে সরে গেল সে।

'এসো!' বলল রানা।

স্লিঙে রাইফেল আটকাতে গিয়ে রানার দিকে ঘুরতে শুরু করল মিলটন, ঘোরাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই স্থির পাথর হয়ে গেল সে, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল মুখ। প্লেনের পেটের নিচে দিয়ে দ্বীপের শেষ মাথার দিকে তাকিয়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে তাকাল রানাও।

'মাই গড!' অস্ফুটে বলল মিলটন।

জারনোলস্কিকে দেখতে পেল রানা। নিওন সাইনের মত জ্বল জ্বল করছে রাইডিং লাইট। প্রকাণ্ড দেখাল আইসব্রেকারটাকে। এত কাছে কেন! প্রথমে বুঝলই না রানা। পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। পরিষ্কার বুঝল, বরফের দ্বীপটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হবে এখন।

চোদ্দ

চোখের কোণ দিয়ে কি যেন দেখতে পেয়ে এক মুহূর্ত দেরি করল না রানা, ডাইভ দিয়ে পড়ল প্লেনের তলায়। সেই সাথে চিৎকার করে সাবধান করে দিল মিলটনকে। বরফের ওপর দড়াম করে পড়ল ও, শুনতে পেল কারবাইন ফায়ারিঙের একটানা আওয়াজ। বরফের গায়ে এক লাইন সেলাই করল বুলেটগুলো। গুঙিয়ে ওঠার একটা শব্দ পেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মিলটনের দিকে।

মাথার ওপর দিয়ে আবার উড়ে যাবার জন্যে বাঁক ঘুরছে হেলিকপ্টার। প্লেনের তলা থেকে বেরিয়ে মিলটনের পাশে চলে এল রানা। 'কোথায় লেগেছে?'

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মিলটন। হাত তুলে কাঁধের কাছে পারকার গায়ে একটা ফুটো দেখাল সে। রক্তের ক্ষীণ ধারা বেরিয়ে আসছে। উরুর ওপর আরেকটা ফুটো দেখল রানা।

'আপনি চলে যান,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মিলটন। 'দেরি করবেন না, যান!'

কথাটা কানে তুলল না রানা। মিলটনের হাত দুটো ধরল ও। বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল তাকে। তার যন্ত্রণা কাতর চিৎকার গ্রাহ্য করল না। প্লেনের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে দেখল ওকে সাহায্য করার জন্যে কেবিন থেকে নেমে এসেছে কংকর।

দু'জন ধরাধরি করে মিলটনকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলছে ওরা, এই সময় আচমকা এক ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল তিনজনই। ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে উঠে দাঁড়াল কংকর, রাগের সাথে চেঁচিয়ে বলল, 'কি ঘটল বলুন তো?'

সিঁড়ির মাথায়-এতক্ষণ ছিল না ইউ.এস. আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোকটা, এখন তাকে আবার দেখা গেল। উত্তরটা তার কাছ থেকেই পেল ওরা। 'বজ্জাত মেয়েটা! পালিয়ে গেল!'

'যাক গে!' কোন্ দিকে গেল মেয়েটা, তাকিয়ে দেখার প্রয়োজনও বোধ করল না কংকর।

'তুমি কি করছিলে?' প্রশ্নটা করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। উঠে দাঁড়াল ও। আবার ধরাধরি করে তুলতে শুরু করল মিলটনকে।

'কি হয়েছে ওর?' উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল ইন্টেলিজেন্স।

জবাব দিল না কেউ। আবার সেই একই প্রশ্ন। ক্ষীণ গলায় বলল মিলটন, 'দেখতেই তো পাচ্ছ, গুলি খেয়েছি। আমাকে ফেলে প্লেনে চড়তে রাজি হলো না লীডার।'

কথাটা শুনেও না শোনার ভান করল আর্মি ইন্টেলিজেন্স।

কেবিনে নিয়ে আসা হলো মিলটনকে। তাকে ছেড়ে দিয়েই ককপিটের দিকে ছুটল রানা। প্লেনের দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল আর্মি ইন্টেলিজেন্স। রানাকে দেখেই দু'দিকে হাত লম্বা করে পথ রোধ করল। 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?'

'নিরস্ত্র লোককে এত ভয় কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'বিপদটা পাইলটকে বুঝিয়ে না দিলে সবাই মারা পড়ব। পথ ছাড়ুন।'

এক সেকেন্ড নড়ল না আর্মি ইন্টেলিজেন্স, তারপর ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো ঠোঁট দুটো। পথ ছেড়ে দিল সে। বলল, 'ঠিক আছে যান! কিন্তু...'

দড়াম করে দরজা খুলে ককপিটে ঢুকল রানা। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল পাইলট।

'এখনও বসে আছেন হাত-পা গুটিয়ে? আইসব্রেকার বরফের দ্বীপটা ভেঙে দেবার জন্যে আসছে, বুঝতে পারছেন না?'

রানা ককপিটে কেন, অথবা অন্য কোন প্রশ্ন তুলে সময় নষ্ট করল না পাইলট। ব্যস্ততার সাথে কাজে হাত দিল সে। সাথে সাথে বেড়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ, ঘুরতে শুরু করল অটার।

উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল রানা। ঠিক ওদের নাক বরাবর, শূন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেলিকপ্টার। অটারকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করল কেউ। প্লেনের সামনে গুঁড়ো বরফ ছিটকে পড়ল চারদিকে। হেলিকপ্টারের পিছনে জারনোলস্কির বিশাল কাঠামো দেখা গেল। দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে বরফ দ্বীপের কিনারা লক্ষ্য করে।

এই সংঘর্ষের কথা অনেক দিন মনে থাকবে রানার। বরফের দ্বীপে গুঁতো দিয়ে পিছিয়ে গেল না আইসব্রেকার, দ্বীপটাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার সাথে সাথে আরও খানিকটা এগিয়ে এল সে-ও। গোটা দ্বীপ প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল। প্লেনের ভেতর ছিটকে পড়ল সবাই। তাল সামলে আবার যখন উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল রানা, ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক। বরফে ফাটল দেখা দিয়েছে। মেঘের গায়ে বিজলীর মত এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে ফাটল। যেন প্রকাণ্ড এক কালো অজগর।

'ফর গডস সেক, কুইক।' কেঁপে গেল রানার গলা।

পিছিয়ে যেতে শুরু করল জারনোলস্কি। ফিরে আসবে এখুনি, আবার ধাক্কা

দেবে। প্রথম ধাক্কাতেই দ্বীপের একটা কোণ ভেঙে গেছে, আলাদা একটা টুকরো হয়ে পানিতে ভাসছে সেটা, মাঝখানে দশ ফুটি একটা কালো ফাঁক, ধীরে ধীরে আরও বড় হচ্ছে ফাঁকটা। ওই রকম মোক্ষম আরেকটা ধাক্কা লাগলেই সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হবে, টেক-অফ করার জায়গা পাবে না অটার।

পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আইসব্রেকার। আবার এগিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। হঠাৎ প্লেনের সামনে দেখা গেল মেয়েটাকে। আকাশের দিকে হাত তুলে ঘন ঘন নাড়ল সে। তাকে তুলে নেবার জন্যে নিচে নামতে শুরু করল হেলিকপ্টার। এক ছুটে ফিউজিলাজের দরজার সামনে চলে গেল সে, এক জোড়া হাত বেরিয়ে এল দরজার ভেতর থেকে। কেবিনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল নাতাশা। তারপরও বরফ থেকে কয়েক ফিট ওপরে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল 'কপ্টার। মনে হলো, উঠে যাবে ওপর দিকে। কিন্তু না! ওঠার বদলে বরফের ওপর, প্লেনের ঠিক সামনে নেমে পড়ল।

পাইলট বা মেয়েটার মতলব বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। 'কপ্টার নিয়ে ওখানে বসে থাকলে টেক-অফ করার জায়গা পাবে না অটার। ওদিক থেকে আরেকটা ধাক্কা দেবে আইসব্রেকার, দ্বীপের আরেক কোণ ভেঙে যাবে, টেক-অফ করার সাধ চিরকালের জন্যে মিটে যাবে অটারের। তারপর, ধীরে সুস্থে প্রফেসর সেসলভকে উদ্ধার করবে তারা। বাকি সবাইকে হয়তো এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারবে।

অটারের পাইলট ধীরে ধীরে ঘোরাতে শুরু করল প্লেন। ঘোরাবার জায়গা দখল করে বসে আছে 'কপ্টার, তবু চেষ্টা করে দেখতে চায় সে। পরবর্তী মুহূর্তটাকে একটা যুগ বলে মনে হলো রানার। সারাটা যুগ ধরে ভাবল, পারবে না পাইলট, 'কপ্টারের রোটরের সাথে ধাক্কা খাবে ডানার ডগা। আশ্চর্য ধীর গতিতে ঘুরল প্লেন। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। রোটরের সাথে ডানার ডগা এই লাগল এই লাগল অবস্থা। ঘুরে গেল প্লেন, ইঞ্চি কয়েকের জন্যে ধাক্কাটা লাগল না। সারা শরীরে স্বস্তির ঠাণ্ডা একটা পরশ অনুভব করল রানা।

এবার বিদ্যুৎ খেলে গেল পাইলটের শরীরে। হাত বাড়িয়ে থ্রটল লিভার ধরল সে, জোরে ঠেলে দিল সামনের দিকে। নতুন শক্তি পেয়ে প্রাট এবং হুইটনি ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ক্লিপ খুলে ব্রেক রিলিজ করে দিল পাইলট, সামনে এগোল প্লেন।

আইসব্রেকারের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারল না রানা। তিনটে প্রপেলারের সাহায্যে দ্রুত ঘুরে গেছে, ঝড়ের গতিতে আবার ছুটে আসছে সেটা, তার আর্মার্ড বো বরফের কিনারা থেকে আর মাত্র কয়েক গজ দূরে।

পাইলটকে নিয়ে মোট আটজন লোক রয়েছে ওরা প্লেনে। লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে বলে প্রচুর ফুয়েলও রয়েছে, কাজেই টেক-অফ করার জন্যে পুরো তিনশো গজ জায়গা লাগবে তার। এখন শুধু দ্বীপের একটা দিকেই অতটা লম্বা জায়গা পাওয়া যেতে পারে। সেদিকে, শেষ মাথার কাছে রয়েছে আইসব্রেকার।

স্টিক ধরা পাইলটের হাত একটু কাঁপল না। ধীরে ধীরে প্লেনের গতি বাড়ল, কিন্তু রানার মনে হলো, শামুকের চেয়েও আস্তে আস্তে এগোচ্ছে অটার। বরফে ধাক্কা দিতে এল আইসব্রেকার। আর পাঁচ গজ। এই দিল ধাক্কা! দিল!

সামনের আইস সারফেস দ্রুত গতিতে প্লেনের তলা দিয়ে পিছন দিকে ছুটছে। সেই সাথে ওপর দিকে উঠেছে এয়ারস্পীড ইন্ডিকেটরের কাঁটা। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে ইঞ্জিনের একটানা গর্জন।

আবার প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল দ্বীপটা। তৈরি ছিল রানা, তবু ছিটকে ধাক্কা খেল ককপিট দরজার গায়ে। তাল সামলে নিয়ে তাকাল ও। শব্দটা পেল এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময় পরে, তার আগেই দেখতে পেল ফাটলটা। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে প্রথম ফাটলের পাশাপাশি আরেকটা ফাটল এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। প্রথমটা মাঝপথ পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছিল, দ্বিতীয়টার মধ্যে থামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ইঞ্জিনের আওয়াজকেও ছাপিয়ে উঠল চড়-চড় চড়াৎ, চড়-চড় চড়াৎ। একটানা, অবিরাম। ফাটলটা এগিয়ে আসার সাথে সাথে শব্দটাও বাড়তে থাকল।

বরফের দ্বীপটাকে ঠেলে পিছিয়ে দিচ্ছে আইসব্রেকার। ফাটলটা যদি প্লেনের নাকের সামনে দিয়ে পথ করে নেয়, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে অটার, উল্টে যাবে চোখের পলকে। কিন্তু ভয়-ভীতির কোন ছাপ নেই পাইলটের চেহারায়। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ডায়ালের ওপর। দ্রুত এগিয়ে আসা ফাটলটার দিক থেকে কিভাবে যে চোখ সরিয়ে রাখল লোকটা, ভাবতে গিয়ে বিস্ময় বোধ করল রানা। দেখল, কলাম ধরা হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল তার, কিন্তু নড়ল না। ফাটলটা যেদিকে এগিয়ে আসছে সেদিকেই ছুটল প্লেন। নির্দিষ্ট একটা বিন্দুতে মিলিত হতে যাচ্ছে ওরা। আর বোধহয় দু'এক সেকেন্ড, তারপরই প্লেনের নিচের বরফে পৌঁছে যাবে জ্যান্ত, সচল ফাটলটা।

এই সময় নড়ে উঠল পাইলটের হাত। আলতোভাবে, অথচ দৃঢ়তার সাথে। নখের নিচে সাদা হয়ে গেল মাংস। রানা অনুভব করল, একটু যেন উঁচু হলো অটারের নাক। অনুভব করল, প্লেনের ডানার নিচে কাজ করছে লিফট। ওদের সামনে পৌঁছে গেছে ফাটল, সাপের মত একটু এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। তারপর হঠাৎ বাঁক নিল সেটা, সোজা এগিয়ে আসতে শুরু করল ওদের দিকে। অসহায় বোধ করল রানা। প্লেনের স্কি ছুঁতে যাচ্ছে ফাটলটা।

অসম্ভব ধীর গতিতে গড়াতে শুরু করল আরেকটা সেকেন্ড। সেকেন্ডটা পুরো হতে কয়েকটা যুগ কেটে গেল যেন। শেষের দিকে ঝাঁকি খেল ওরা। লাফ দিয়ে বরফ থেকে উঠে পড়ল প্লেন।

ফাটলটা থেকে চোখ সরাতে পারল না রানা। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ও, উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচে ঠুকে গেল কপাল। নিচের দ্বীপে তাকাল ও। আইস ফরমেশনে নিশ্চয়ই কোন প্রেশার ফল্ট ছিল, অন্তত ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা চাক্ষুষ করার সময় তাই ধারণা করল ও। দ্বীপের দুই তৃতীয়াংশ দূরত্ব পেরোবার পর ফাটলটা হঠাৎ যে শুধু বেঁকে গেল তাই নয়, মূল ফাটলটা থেকে আট দশটা শাখা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সেই আট-দশটা থেকে কয়েকশো উপশাখা বের হলো। সবই চোখের পলকে, বিদ্যুৎগতিতে ঘটে যাচ্ছে। প্রতিটি উপশাখা থেকে সাপের মত এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এল আরও ফাটল। অদ্ভুত একটা জালের মত নকশা তৈরি হলো বরফের গায়ে, নকশাটা দ্রুত এগোল বরফে বসে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে। ফাটলগুলো

'কপ্টারের তলা দিয়ে ঢুকে বেরোল আরেক দিক দিয়ে। একটা বা দুটো নয়, ডজন ডজন। এক সেকেন্ড পর দেখা গেল, মাকড়সার একটা জালের ওপর বসে আছে 'কপ্টার।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সব স্থির হয়ে আছে। তারপর হঠাৎ চারদিকে এলোপাতাড়ি নড়তে শুরু করল বরফ। একবার মনে হলো, পানির নিচ থেকে হাজার হাজার লাঠি দিয়ে কেউ খোঁচা দিচ্ছে। তারপর মনে হলো, প্রতিটি বরফের টুকরো জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, কে কাকে আগে টপকাতে পারে তার প্রতিযোগিতা করছে ওরা। ধীরে ধীরে ডেবে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। তারপর ভুস করে নেমে গেল পানির নিচে। বড়সড় একটা বরফের টুকরো বন বন করে ঘুরতে শুরু করল। এক সেকেন্ড আগে ওখানেই যে একটা প্রকাণ্ড হেলিকপ্টার ছিল, এখন তা আর বোঝার কোন উপায় নেই।

আকাশে উঠে এসেছে অটার। ককপিটের জানালা দিয়ে জারনোলস্কিকে দেখতে পেল রানা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হেরে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে যেন। ছুটন্ত হোয়াইট স্টারকেও দেখতে পেল রানা। সদ্য ওঠা চাঁদের আলো লেগে সাদা দেখাল ওর তোলা ঢেউয়ের ঝুঁটিগুলো। হোয়াইট স্টারের দিকে ছুটে যাচ্ছে এক ডজন বোট। মুচকি একটু হাসল রানা। গোটা একটা মাছ ধরার ফ্লিটকে বাধা দেবার বা আটক করার কথা ভাবতেও পারবে না জারনোলস্কির স্কিপার। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জলসীমায়।

পাইলটের পিঠ চাপড়ে দিয়ে কেবিনে ফিরে এল রানা। দেখল, হাতে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে কেবিনের পিছনের দেয়ালে টয়লেট লেখা দরজার পাশে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর্মি ইন্টেলিজেন্স। সবার ওপর চোখ রেখেছে সে। রানাকে দেখে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার।

ডাক্তার আর কংকরের দিকে তাকাল রানা। মিলটনের ক্ষত ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে ডাক্তার, তাকে সাহায্য করছে কংকর। কপাল জোরে বেঁচে গেছে মিলটন। দুটো বুলেটই শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। কাঁধের বুলেটটা একটুর জন্যে ছুঁতে পারেনি ফুসফুস। ডাক্তার তাকে মরফিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

একটা খালি সীটে ধপ করে বসে পড়ল রানা। ক্লান্তিতে বুজে এল চোখ দুটো।

পনেরো মিনিট হলো আকাশে উঠেছে অটার। নিচে এখন আবার জমাট বরফের প্রান্তর।

কেবিনের ভেতরটা হাসপাতালের মত হয়েছে দেখতে। মেঝের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে মিলটন, অঘোর ঘুমে অচেতন। নিজের সীটে বসে এতক্ষণ ঝিমোচ্ছিল রানা, এই মাত্র চোখ মেলে নড়ে চড়ে বসল। উরুর ক্ষতটা আবার দপ দপ করতে শুরু করেছে। আজ রাতে থিউলে পৌঁছে ডাক্তারকে দিয়ে ভাল করে দেখাতে হবে ক্ষতটা।

কেবিনের মেঝেতে, স্ট্রেচারের ওপর শুয়ে এখনও ঘুমাচ্ছেন প্রফেসর সেসলভ। এই মাত্র তাঁকে পরীক্ষা করেছে ডাক্তার আর কংকর। সামনের দ্বিতীয় স্ট্রেচারে রয়েছে বুতেরা। ডাক্তার আর কংকর তার পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

টয়লেট দরজার পাশে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্মি ইন্টেলিজেন্স। সতর্ক চোখে লক্ষ করছে সবাইকে।

বুতেরার পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হয়নি, এই সময় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কংকর। আর্মি ইন্টেলিজেন্সের দিকে এগোল সে।

'কি চাই?' কংকরকে এগোতে দেখে এক পা সামনে বাড়ল ইন্টেলিজেন্স।

'টয়লেটে যাব,' বলে লোকটাকে পাশ কাটাল কংকর। দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

কংকরের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে ডাক্তার।

দু'মিনিট পর টয়লেটের দরজা খুলে গেল। দরজার সামনে দেখা গেল কংকরকে। হাতের কালো পিস্তলটা দরজার পাশে দাঁড়ানো লোকটার পাঁজরে চেপে ধরল সে। তার আচরণে কোন রকম উত্তেজনা বা অস্থিরতা নেই। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'রাইফেল ছেড়ে দাও।'

'হোয়াট···' কথাটা শেষ করতে পারল না আর্মি ইন্টেলিজেন্স, কংকরের বাঁ হাতি পাঞ্চের ধাক্কায় দাঁতের সাথে লেগে ঠোঁট কেটে গেল তার। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে, ছেড়ে দিল রাইফেলটা।

'পেছন ফেরো।'

এবার আর মুখ খোলার চেষ্টা করল না লোকটা। পিছন ফিরল।

নিজের সীটের ওপর ঘুরে বসে গোটা দৃশ্যটা দেখল রানা। রাজ্যের অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ডাক্তারও। ফিসফিস করে বলল সে, 'ব্যাপার কি?' উঠে দাঁড়াল। অনুমান করল, পিস্তলটা কংকর বুতেরার পকেট থেকে পেয়েছে। আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা প্রফেসর আর বুতেরাকে সার্চ করেনি।

'বসুন,' শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে নির্দেশ দিল কংকর। 'কেউ নড়বেন না! আমাকে বাধা দিলে গুলি করতে দ্বিধা করব না।'

'কিন্তু···' বিস্ময়ে ডাক্তারের মুখ হাঁ হয়ে আছে।

পকেট থেকে কয়েক টুকরো নাইলনের কর্ড বের করল কংকর। তার একটা গুঁজে দিল আর্মি ইন্টেলিজেন্সের হাতে। বলল, 'প্রথমে মি. রানার হাত বাঁধো। তারপর ডাক্তারের।'

ডাক্তার বা রানা, কেউ কোন বাধা দিল না। ওদের হাত বাঁধা শেষ হতে পিছমোড়া করে লোকটার হাত বাঁধল কংকর। তারপর হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিল ওর পিছনে। 'হাঁটো। সোজা ককপিটে ঢুকব আমরা।'

'কেন? ওখানে কি···?'

'এখনও বুঝতে পারছ না ওখানে কি? পাইলটকে তুমি নির্দেশ দেবে আমার ইচ্ছে মত জায়গায় প্লেন নামাতে হবে তাকে।' রিস্টওয়াচ দেখল কংকর। 'বেশি দূর না, এই মাইল দশেক পুবে নেমে যাব আমরা।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ,' বলল কংকর। 'আমি আর প্রফেসর সেসলভ।'

'তার মানে হাইজ্যাক করে···'

'হাসালে!' বলে সত্যি সত্যি মৃদু একটু হাসল কংকর। 'প্রফেসরকে তো

তোমরাই হাইজ্যাক করছ। কিন্তু আমি তা হতে দেব না। দেশের ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমি।'

'দেশের ছেলে?'

'প্রফেসর সেসলভের বয়স হলেও, দেশের কাছে এখনও তিনি ছেলেই,' গভীর শ্রদ্ধার সাথে বলল কংকর। 'অত কথায় দরকার কি, হাটো!'

'তুমি···তুমি কে?'

'যুগোস্লাভ ইন্টেলিজেন্স!' গম্ভীর কংকর। 'এবার আগে বাড়ো।'

'আমি যদি পাইলটকে নির্দেশ না দিই?'

উত্তর না দিয়ে লোকটার মাথার পিছনে পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘা বসিয়ে দিল কংকর। কোন শব্দ না করে জ্ঞান হারাল আর্মি ইন্টেলিজেন্স। পড়ে যাবার আগেই তার অচেতন শরীরটা ধরে ফেলল কংকর। ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল কেবিনের মেঝেতে। তারপর সেটাকে টপকে ককপিটের দিকে এগোল সে।

এক মিনিট পর রানা অনুভব করল, প্লেনের কোর্স বদল করছে পাইলট। শুধু হাতই নয়, ডাক্তার আর রানাকে সীটের সাথেও বেঁধেছে আর্মি ইন্টেলিজেন্স। কিছু করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

পাঁচ মিনিট পর বরফের ওপর ল্যান্ড করল অটার। বেশ কয়েকটা ঝাঁকি খেল প্লেন, কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই থামল সেটা। জানালা দিয়ে দেখতে পেল রানা, পঞ্চাশ গজ সামনে বরফের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মাঝারি আকারের প্লেন। এরই মধ্যে লোকজন নেমেছে সেটা থেকে, সবার পরনে আর্কটিক পোশাক, সবার হাতে অটোমেটিক রাইফেল। অটারের দিকে ছুটে এল তারা।

অটারের পাইলটকে দিয়ে সিঁড়ি নামাল কংকর। হুড় মুড় করে কেবিনে উঠে এল সশস্ত্র লোকগুলো।

হাঁ হয়ে গেছে ডাক্তারের মুখ।

ওকে সবচেয়ে বেশি অবাক করলেন প্রফেসর সেসলভ। কংকর একবার মাত্র দেশী ভাষায় ডাকতেই স্ট্রেচার থেকে সটান উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চোখেমুখে ঘুম বা অসুস্থতার চিহ্নমাত্র নেই। কংকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলো।' তারপর পিছন ফিরে রানার দিকে তাকালেন একবার। হাসলেন। ইংরেজীতে বললেন, 'ধন্যবাদ। ওদেরকে বোলো, যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে নিজের দেশে কাজ করতে আমার বেশি ভাল লাগবে। সবার জন্যে রইল আমার শুভেচ্ছা।'

সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়াল কয়েকজন, কিন্তু সবগুলো হাত সরিয়ে দিয়ে কেবিন থেকে একাই বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। তাঁকে অনুসরণ করল সশস্ত্র লোকগুলো, সবার পিছনে কংকর।

দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল সে। রানার চোখে চোখ পড়তেই মৃদু হেসে একটা চোখ টিপল। প্রত্যুত্তরে রানাও চোখ টিপল, নাকি হাসল, নাকি ভ্রূকুটি করল—দেখতে পেল না ডাক্তার।

কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল কংকর।

তিন মিনিট পর জানালা দিয়ে ডাক্তার দেখল, যুগোস্লাভ প্লেনটা দৌড় দিল আকাশে ওঠার জন্যে। একটু পরেই মিলিয়ে গেল ইঞ্জিনের গুঞ্জন। গোঙানির

আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। জ্ঞান ফিরে আসছে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের। চট্ করে রানার মুখের দিকে চাইল ডাক্তার। বলল, 'আপনি জানতেন, তাই না? আগে থেকেই জানতেন কি ঘটবে!'

বুক ভরে শ্বাস টেনে চোখ বুজল রানা। চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বললেন, ডাক্তার?'

'না, কিছু না!'

পায়ের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল সবার বাঁধন খুলে দেয়ার জন্যে এগিয়ে আসছে পাইলট।

● ● ●